স্মৃতির অতলে

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

উৎসর্গ পত্র

মা জননী রত্নাবলী আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে বিমোহিত করে দিতেন আগমনী গীতির সুরোচ্ছ্বাস দিয়ে; কখন বা আমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে দিতেন কানের মধ্যে মহাজন-পদাবলীর অমৃতবিন্দু ঢেলে দিয়ে। অতলের স্মরণীয় সর্বপ্রথম কথা-সুর ও ছন্দ আজও উছলে ওঠে মায়ের স্নেহমধুর কণ্ঠ থেকে। তাঁর নামে এই "স্মৃতির অতলে" উৎসর্গ করি আমি।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

অতলের ভূমিকা

বিস্মৃতির সাগরের তলে স্মৃতির অনন্ত অতল, সুষুপ্তির মতো প্রশান্ত নীলিমা দিয়ে ঘেরা। অতীতের সন্ধানী ডুবুরী মন এখানে পৌঁছিয়ে দেখে এক আশ্চর্য অতল উজ্জ্বল হয়ে আছে আশার অনলুপ্ত স্বপ্ন দিয়ে। ছোট ছোট সুপ্ত মায়াপুরী তখন টলমল করতে থাকে আপন গর্ব আর গরিমার ভারে; ঝলমল করে ওঠে অতীত সুখ-দুঃখের আলো-ছায়া গায়ে মেখে। হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞান আর অনুভবের রহস্যগুলি মায়া-মরীচিকার মতো ঝক-মক করে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। অপূর্ব একরকমের আলোয় প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে অতীতের সুপরিচিত চিত্র-চলন্তিকার দল; এক একটি করে সার বেঁধে তারা চলে যায় মানসনেত্রের সম্মুখ দিয়ে। তৃষ্ণার তুলি আর মায়ার মশলা দিয়ে অতলের পটভূমিকায় নিজেরাই রচনা করেছিলাম,—আর কতো সহজেই না রচনা করেছিলাম সে সব মনোমরীচিকার ছায়াছবি! অনুভব দিয়ে নির্মাণ করা ছায়ামূর্তি কতো সব! তাদের সংখ্যা হয় না। অতলের সংকেত-ধ্বনি করতে করতে এরা দেখা দেয়, চলে যায়, আবার ফিরে আসে। আর বলতে থাকে, "তোমার আমার প্রথম পরিচয় ব্যর্থ হয়নি। এই মুহূর্তের সার্থকতাই তার প্রমাণ।" অন্তরাত্মা প্রতিধ্বনি ক'রে বলে, "বিস্মৃতির ব্যবধান বিরহকে তীব্র করেছে বলেই আজ অতলের মিলন হয়েছে মধুরতর, নবীনতর।"

এ রকমের স্মরণের সার্থকতা তখনই বুঝি, যখন অতলে ডুব দিয়ে সে সব গর্ব-গরিমা, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান আর অনুভবের সঞ্চয়নিকা নূতন ক'রে উদ্ধার করি, নূতন করে আবিষ্কার করি, নূতনের সাজে ফিরে পাই পুরাতনকে। এরা মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে অতলের প্রাণভূমির মধ্যে, যেমন রস মিলে মিশে থাকে মাটির মধ্যে, মাটির সঙ্গে। অতলের মাটি এতই সরস, এতই নরম যে, এখানে যা কিছু হর্ষের উচ্ছ্বাস, যা কিছু দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে বর্তমানের বুদ্‌বুদের রূপে, তা সমস্তই মধুর সবাষ্প শীকরস্নিগ্ধ।

অতলের ভূমির সহজ স্বভাবের কথা ব'লে রাখছি এ কারণে যে, অতলের মাটিতে আগন্তুক ইতিহাসের ছোট-বড় নানারকমের শিল-নুড়ি খুঁজে

পাওয়া গেলেও এমনতর নরম মাটিতে আর চিরন্তনের ভিজে মশলা দিয়ে প্রামাণিক ইতিহাসের পাথুরে ইমারত গ'ড়ে তোলা যায় না। ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য নয় আমার। ইতিহাসের অপরিচিত পথের অন্বেষণে এই শিল-নুড়িগুলিকে কেউ যদি নিশানা বা মাইল-ষ্টোনের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন, তাতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। অতলের দলিলের মধ্যে এরা আপনা থেকেই এলোমেলো হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি এদের সাজাতে পারি নি; কিন্তু ঠেলে সরিয়েও দেইনি।

বাস্তবিক স্মৃতির অতলে রচনাগুলি লিখে গিয়েছি ব্যক্তিগত দলিলেরই মতো। প্রতিটি অক্ষর যেন সাক্ষীর স্বাক্ষর; সরকারী শীল-মোহরের প্রয়োজন বোধ করিনি। ভিতরকার কথা খুলে বলতে হয়। কিছুদিন যাবৎ মন আমাকে ব'লে আসছিল, সে নাকি অন্তরের মধ্যে,—খাস করে' স্মৃতির অতলে ছোট ছোট দেবোত্তর সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে। খোদ্ মালেক নাবালগ্ অর্থাৎ চির-কিশোর; তাই হবে বুঝি; কারণ, দেবতারা ত চির-কিশোর! অলক্ষ্যে রয়েছেন সেই দেবতা, যেন কূট সাক্ষী হয়ে; আর আমাকে রেখেছেন বেনামদার করে। মন ইচ্ছামত খাজনা প্রভৃতি এনে দেয় আমার কাছে, আর সম্পত্তিগুলির তত্ত্বাবধান করতে থাকে, যদিও আসল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়নি এ পর্যান্ত। মন ক্রমশঃ বুড়ো হয়ে পড়ছে; বলে—"আমি আর কতদিনই বা থাকব। সময় থাকতে থাকতে এসব গোলমেলে সম্পত্তির সম্বন্ধে দলিল লিখে ফেল, যেমন বলে যাই আমি।" তার কথামত দলিল লিখে যাই। খাজনা ওগায়রহ্ যখন আমিই ভোগ করছি, তখন দলিলে সই করতে হচ্ছে আমাকেই। যাঁর হয়ে বেনামদার আমি, তাঁর কাছে হিসাব দাখিল করতেই হবে একদিন। বিশেষ করে, ভয়ের খবরও কিছু পাচ্ছি। আমি ত আলস্য-বিলাসী। মনের মতো কর্মকুশল আর সন্ধানচতুর নায়েবেরও অজ্ঞাতসারে নানারকমের অতীতের ভূতেরা নাকি ফল-ফুলের বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে, হুটোপুটি ক'রে; সম্পত্তির সীমানাগুলিও নাকি ভেঙ্গে ফেলেছে লুট-পাট করে। অতএব আর দেরি নয়। মনের কথা যে রকম শুনে যাচ্ছি, তাতে বোধ হচ্ছে, মৌজুদ্দিন আদি করে নামগুলি অতলের খাস-দখলি সম্পত্তির এলোমেলো ভাঙ্গা-জোড়া চৌহদ্দির নাম-নিশানা বই আর কিছু নয়।

এমনতর বৈষয়িক কথা সকলের কানে ভাল নাও লাগতে পারে; কারণ, এর মধ্যে ব্যক্তিগত সুর এসে পড়েছে। সে কারণে সুর বদলে দিয়ে বলি, সঙ্গীতের স্মৃতিতে যাঁরা আমার হৃদয়ে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিয়ৎ কিঞ্চিৎ মৌখিক আলোচনা করে এসেছি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। গুণীরা আমাদের অন্তরের সুন্দরকে প্রবুদ্ধ করেন। তাঁদের প্রসঙ্গ আমাদের হৃদয়ের চিরভিখারী অনুভবকে সজাগ করে রাখে, আকুল করে তোলে অনুক্ষণ। এঁদের অনুগ্রহের ঋণ থেকে মুক্ত হ'তে পারিনি; মুক্ত হ'তেও ত চাইনে। কারণ, চক্রবৃদ্ধির হিসাবে ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে ঋণটা হয়ে পড়েছে সম্পদ্! যে কখনও ধার স্বীকার করে না, তাকে আমি কী বলে বুঝাব এমন ঋণের মহিমা, এমন দেনার আনন্দ! যাঁদের নাম করে দলিল রচনা করেছি, তাঁরা এখন অতলে কীর্তি-কুহেলিকা দিয়ে আচ্ছন্ন ছায়াশরীর মাত্র। দাবী-দেনার হিসেব দিয়েছি নির্ভয়ে। খতিয়ে দেখেছি দলিলের প্রায় সবটাই নিকাস অর্থাৎ লাভের দিকে জমে চলেছে। যাঁরা ইতিহাসঘটিত জরীপ জমাবন্দী করে অতীতের দাম কষেন, তাঁরা এরকমের দলিল দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন, হয় ত! কিন্তু নাচার আমি। আপাততঃ যা সম্ভব আমার পক্ষে, তারই চেষ্টা করেছি। বিদেশী গুণীদের লক্ষ্য করে স্মৃতির পুষ্পচন্দন নিবেদন করতে গিয়ে ইতিবৃত্ত অংশ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রূপ রস শব্দ প্রভৃতির অনুবাসনা এসে পড়ার কারণে ইতিহাসের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে সম্ভবত। তবুও এ সব স্বয়মাগত নৈবেদ্যকে "ন স্যাৎ"এর বিধিলিং দিয়ে ঝুড়ি-চাপা দিতে পারিনি, দলিলের অধিকার থেকে সরিয়ে দিতে পারিনি।

এমনও সন্দেহ হ'তে পারে যে, দলিলের ছলে সাহিত্য রচনা করাই হ'ল আমার চাতুরী বা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়; নইলে দলিলের মধ্যে এত লতা-পাতার বাহার, এত বিশেষ্য-বিশেষণের সুবাস আসে কোথা হ'তে, আর কেনই বা আসতে দেওয়া হ'ল। এরকম সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে বলি—ছল চাতুরী বা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় নিয়ে আমি অতলের দলিল লিখতে বসিনি। সাহিত্য আমার লক্ষ্য নয়, সাধ্য নয়; সাহিত্য আমার কাজের পক্ষে হয়েছে সহায়, কখনও বা হয়েছে সাধনযন্ত্র মাত্র। সঙ্গীতের বিষয় আর গুণীদের প্রসঙ্গ, এ দু'টি ব্যাপার যে আপনা থেকেই সরস আর সুন্দর! তা ছাড়া স্মৃতির অতলের স্বভাবকৃত স্নিগ্ধ রমণীয়তার কথা ত বলেইছি। ফলে, দলিল

লিখতে গিয়ে এই ত্রিবেণীসঙ্গমের গোপন মাধুর্যরচনাভূমির কোন কোনও অংশকে হয় ত সরস করে ফেলেছে। লতা-পাতা, ফুল সুবাসের কথাই বলি। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। কখন্ যে অজানতে চন্দনের গাছে কোপ মেরেছিল, বুঝতে পারেনি সে। ঘরে ফেরার পথে নিজের কুড়ুলের ফলা থেকে চন্দনের সুগন্ধ বার হয়ে আসে, কাঠুরেকে মোহিত করে। কাঠুরে ভাবে, এটা দৈবকৃত সুনিমিত্ত। আমি ভাবি, যদি অজ্ঞাতসারেই এমন মনোরম ব্যাপার ঘটে যায়, তা হ'লে জ্ঞাতসারে কী না হ'তে পারে। আমি সঙ্গীতকে জেনেছি, অনুভব করেছি; সঙ্গীতস্রষ্টাদের সংস্পর্শে এসেছি বিলক্ষণ ভাবে। এ সত্ত্বেও যদি কিছু বিশিষ্ট প্রভাব আমার দলিলের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়, তা হ'লে আমি নিজেকে দুভাগা মনে করব। আমি ত ভাগ্যহীন নই। দলিল রচনার যন্ত্র, অর্থাৎ যাকে সাহিত্য বলে সন্দেহ করা হয়েছে, সেই যন্ত্রটি মধুর বিষয় আর মনোহর প্রসঙ্গের সংস্পর্শে এসেছে বলেই রচনার স্থানে স্থানে হয় ত সরসতা দেখা দিয়েছে। যে মূল্যটা ভাগ্যকৃত সংস্পর্শের প্রাপ্য, সে মূল্যকে যন্ত্রের উপর আরোপ করা উচিত নয়, আমার মতে।

আমি নিরহঙ্কার নিরভিমান নই। অনর্থক বিনয় দিয়ে সেই অহঙ্কার আর অভিমানের সুর নষ্ট করব না। অহঙ্কার আর অভিমান আছে বলেই দলিল লিখে যেতে পেরেছি। সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা আর অনুভব আমাকে অনুপ্রেরিত করেছে শিল্পীর সন্ধানে শিল্পের গুণকীর্তনে। সৌভাগ্যের অবস্থায় সঙ্গীতের রথ চলে তিন চাকায়; কথা, সুর ও ছন্দের ত্রিচক্র। তখন সারথী হন কবি বা গুণী গায়ক। মানুষের হৃদয়কে নন্দিত করে নাট্য, গান্ধর্ব ও সঙ্গীতের বিজয় অভিযান চলে এসেছে আবহমান কাল থেকে; এ কথা কে না জানে! তবুও—মূল রথ ঐ তিনটি চাকা মাত্র দিয়েই চলে। দুরদৃষ্টের ফলে সুর ও ছন্দের চাকা দু'টি অচল হয়ে গেলে থেকে যায় শুধু কথার চক্র। আমার মত নাছোড়বান্দা তখন হয় একচাকার ঠেলা গাড়ীর গাড়োয়ান। যেখানে রথ চলে না, দু চাকার গাড়ীও চলে না, সেখানে একচাকার ঠেলা গাড়ী চলে টাল সামলাতে সামলাতে; কখন শাস্ত্রের রূপ ধরে', কখনও ইতিহাসের রূপ ধরে', কখনও বা দলিলের রূপ ধরে'! আমি বুঝি, এসব হ'ল বিপর্যয়ের অবস্থা, আপদ্‌ধর্মের ব্যবস্থা! তবুও ভিন্নরকমের বুদ্ধিতে অন্য রকমের লোক বলতে থাকে, "এগুলি সাহিত্যেরই

পর্যায়ভেদ, আসলে। এদের মধ্যে তোমার দলিলকে সাধারণভাবে রাখি কথা-সাহিত্যের মধ্যে। আর ঐ দেখ, কথা ও ছন্দের সুন্দর সুন্দর দোচাকা কবিতার রথ ছুটেছে ভারি মাল বোঝাই করে নাচতে নাচতে।" ঠেলা গাড়ীর গাড়োয়ান আমি, উৎকর্ষ-অপকর্ষের কচ্‌কচি শুনে দীনতার লজ্জায় ঘাড় হেঁট করি! ঠেলা গাড়ীটা ঠেলেই ফেলে দিতাম—যদি আমার একটা অহংকার, একটা অভিমান না থাকত। ঠেলা গাড়ীর হাল ছাড়িনে আমি। এতে বোঝাই দিয়েছি ত্রিচক্র সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক মাল-মশলা, যদিও ভাঙ্গা হাটের ফেরত বেসাতি সেগুলি। গাড়ী চালাবার সময় সঙ্গীতের বিচিত্র মেলার কথা ভাবি, আর হৃদয় ভরে' ওঠে স্মৃতির সুখ দুঃখ গর্ব গরিমা জ্ঞান-অনুভবের আনন্দে। তখন না বলে' থাকতে পারিনে—"তিন চাকার গাড়ীর কাছে আর সব গাড়ীকে হার মানতে হয়েছে রে ভাই! ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা! গানাৎ পরতরং নহি!" আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অহঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে এই ঠেলাগাড়ীর ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের মধ্যে। আমার গোপন অভিমান হ'ল সেই অলক্ষ্য দেবতার বিরুদ্ধে। সমস্ত জেনে শুনেও যখন তিনি আমাকে একচাকার ঠেলা গাড়ীর কাজে লাগিয়েছেন, তখন আমিও গাড়ী ঠেলে চলি ; দেখি কত দূর যায়, শেষ পর্যন্ত কী হয়!

আপাততঃ একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত মনে করি। আর এই অবসরে কিছু প্রীতিবিমিশ্র কর্তব্য ও সেরে ফেলি।

মৌজুদ্দিন-সংক্রান্ত দলিলখানি শেষ হওয়ার আগেই সোদরোপম সুসাহিত্যিক শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য রচনার নাম করে দিয়েছিলেন "স্মৃতির অতলে"। তখুনি বুঝলাম, তিনি ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে ফেলেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই সর্বান্তঃকরণে ; কারণ, অন্য কোনও নামকরণ নির্ধারিত হয়ে গেলে ভূমিকাতে আন্তরিক বিপর্যয় দেখা দিত।

"স্মৃতির অতলে মৌজুদ্দিন" প্রকাশিত হয়েছিল দু'বৎসর পূর্বের "যুগান্তর" পূজা-সংখ্যায়। যুগান্তরের প্রকাশকবর্গকে আমার ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি আনন্দোচ্ছল পত্র এসে উপস্থিত হ'ল। পত্রের লেখক সঙ্গীতৈকপ্রাণ শ্রীদামোদর খান্না (লালাবাবু) মহোদয় মৌজুদ্দিনের গান শুনেছিলেন মনপ্রাণ ভরে। বুঝলাম, মৌজুদ্দিন তাঁর কলেবর ত্যাগ করলেও, কাল তাঁর কীর্তিকে গ্রাস করতে পারেনি।

এর পরে সম্প্রতি "দেশ" সাপ্তাহিক সংখ্যায় পর পর "স্মৃতির অতলে—ফৈয়াজ্ খাঁ" ও "স্মৃতির অতলে—কালে খাঁ" রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। "দেশ" পত্রিকার প্রকাশকবর্গ ও বিশেষ করে শ্রীসাগরময় ঘোষ মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আপাতদৃষ্টির দোষ-ত্রুটি সমেত ঐ তিনটি রচনাকে একত্র করে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করার ভার নিয়েছেন "মিত্রালয় প্রকাশনে"র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, যিনি ইতিপূর্বেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকরূপে বাংলার পাঠকের নিকট সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর সাহসকে বলিহারি দিয়ে তাঁর সৌমিত্র ও সহৃদয়তার ধন্যবাদ করি।

কৃষ্ণনগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড
জেলা নদীয়া
দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৯ সাল

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

স্মৃতির অতলে

স্মৃতির অতলে মৌজুদ্দিন

সঙ্গীত স্মৃতির মধ্যে খণ্ড খণ্ড আনন্দের অভিজ্ঞতাগুলি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে এদের উদ্ধার করতে গিয়ে পাই আবিষ্কারের অভিনব আস্বাদ। মন তখন সহজে, নিমেষের মধ্যে রসোত্তীর্ণ শিল্পীদের সন্ধান করে ফেলে। বাস্তব অতীতে সন্ধানের কাজে অনেক সময় লেগেছিল। আজ যে সকল জ্যোতিষ্মান স্মৃতি-বিগ্রহ নিজে এসে ধরা দিচ্ছেন, স্মরণের দাবী নিয়ে, অতীতে তাঁদের সন্ধানে অনেক ছুটাছুটি করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক বুদ্ধি উদাস সুরে বলে—"যারা চলে গিয়েছে, তাদের মাত্র শ্রেণীবদ্ধ করে মনের যাতুঘরে সাজিয়ে রাখাই ভাল। অতীত সুখের আলোচনার অর্থই যখন বর্তমানের অনুশোচনা, তখন এ দুটি বর্জন করাই ত বুদ্ধিমানের কার্য।" কিন্তু রসপিপাসু মনের মূলশিকড়টি অতীতের অমৃত বস্তুর সন্ধানেই ফেরে; মৃতের পুরান পঞ্জিকায় সালতামামীর সন্ধানে নয়। এটা সহজ মনেরই ধর্ম। একবার উত্তেজিত হ'লে ঐতিহাসিক মোহমুদ্গর উপেক্ষা করেই সে ডুব দিতে থাকে স্মৃতির অতলে, সন্ধান করে ফেরে সুখ-স্মৃতির মণিমাণিক্য। বাস্তব ইতিহাসের ময়লা-মাটি গায়ে মেখে উঠে এলেও তার মুঠোর মধ্যে থাকে সুখ-স্মৃতির টুকরাগুলি। এগুলিকে নিয়ে খেলা করে, আদর করে কত বার যে সে বিস্মৃতির জলে ফেলে দিয়েছে, তার ঠিক নেই। বিস্মৃতির তলেই ত স্মৃতির অতল। তবুও সেই সুখ-কৌতুকের স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধার করতেই হবে; কারণ, মনের প্রবলতম আসক্তি রয়েছে অতীতের মধ্যে, যেখানে মনেরও অগোচরে মৃত ও অমৃতের বাছাই হয়ে যাচ্ছে।

গীতশিল্পী মৌজুদ্দিন ও অন্যদের কথা স্মরণে এসেছে বলেই একটা কৈফিয়ৎ পেশ করে রাখছি। আমার স্মৃতি একচক্ষু হরিণ নয়। এর দু'টি চোখ; একটিতে লোকধর্মী ইতিহাসের সামান্য আলো, অন্যটিতে লোকোত্তর অনুভবের স্নেহাঞ্জন। অতীতের আলো আর ছায়ার মধ্যে তাদের দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে সন্ধান করে চলে গুণীর জীবনরহস্য, বর্তমানের দিকে মাঝে মাঝে ফিরে-আসে কিছু আস্বাদ সংগ্রহ করে। এই আস্বাদকেই আমি বড় মনে করেছি।

অনেকের কথাই মনে পড়ছে মাত্র মৌজুদ্দিনের অনুষঙ্গে। অবশ্য যখন

ধ্রুপদ-খেয়াল প্রভৃতি শ্রেণীর প্রসঙ্গ হয়, তখন মাত্র শ্রেণীর খাতিরে অনেকের নাম-রূপ জেগে ওঠে। কিন্তু মৌজুদ্দিনের এবং আরও অনেক গুণীদের কথা মনে পড়েছে তাঁদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে। স্মরণ করা এক ব্যাপার ও পুরানো পাঁজি নিয়ে জন্ম তারিখ অনুসন্ধান করা অথবা অলৌকিক জীবনকে লৌকিক ইতিহাসের যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা অন্য ব্যাপার।

নিভৃতে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে ওঠে গানের প্রসঙ্গ। গানের প্রসঙ্গে "সুপ্ নেমে আয়ে" "অব্ তো রুত মানে," "লঙ্গর কা করিয়ে," "পিয়া বিন নাহি," "নাহক্ লায়ে গমন্," "বাজুবন্দ খুল্ খুল্ যায়," "নাহি মানে জিয়রা" প্রভৃতি খেয়াল-ঠুমরী-কাজরীর গীত-রূপ স্মৃতিতে জেগে উঠলে মৌজুদ্দিনকে মনে পড়ে এবং মৌজুদ্দিনকেই মনে পড়ে; ঠিক যে রকম "তুম বিন ঘোম ঘোম" ধুরিয়া মল্লারের ধ্রুপদটি মনে পড়লে তৎক্ষণাৎ ভূতনাথবাবুর কথা মনে পড়ে, যদিও অন্য ধ্রুপদীয়াদের মুখে এ গানটি শুনেছি। "ভ্রমরারে ফুলি" বসন্তের ধামার রূপটি মনে পড়লেই বিশ্বনাথজীর কথা মনে আসে। "ফগুয়া ব্রিজ দেখনকো" গীতরূপটির প্রসঙ্গে সকলের চেয়ে প্রধান হয়ে মনে পড়ে গহরজান্ বাঈজী ও আব্দুল করিম খাঁ সাহেবকে। জয়জয়ন্তী রাগের স্বরূপ মনে করতে গিয়ে একসঙ্গে মনে পড়ে চন্দন চোবেজী ও ফিদা হুসেন খাঁ সরোদীয়াকে। "পগ্ লাগন দে" মালকোশের আস্থায়িটির প্রসঙ্গে একমাত্র কালে খাঁ সাহেব খেয়ালীকেই মনে পড়ছে। দরবারীকানড়ার কোমল গান্ধারের স্বাদ মনে করতে গেলেই সুরবাহার হাতে ইমদাদ্ খাঁ ও রাধিকা গোস্বামীকে মনে পড়ছে। তিন মিনিটের রেকর্ডে রাগের আলাপ হয় না। তবুও জৌনপুরী তোড়ীর অপূর্ব ছাঁদ ও মোহন পরিচয় ধরা দিয়েছে তিন মিনিটের পরিবেশনে, ইমদাদ্ খাঁর পরিকল্পনার জালে। অদ্ভুত রকমের উদাত্ত ও সুন্দর মূর্তি নিয়ে ধরা দিয়েছে বাগেশ্রী রাগ ঐ তিন মিনিটের উদ্বেলতায়; মনে পড়ে একমাত্র আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে।

স্মরণের এরকম পক্ষপাতিত্ব কে না অনুভব করেছে? এর কারণ রয়েছে বস্তুর প্রাণবন্ত পরিচয় ও অমৃতের ক্ষণিক আস্বাদের মধ্যে। শিল্পীর কৃতিত্ব এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলেই আমরা আস্বাদের স্মৃতিতে কীর্তিমানের স্মরণ করি। পক্ষপাতের অন্তরেই রয়েছে আমাদের কৃতজ্ঞতা, অমৃতলুব্ধ স্মৃতির মধ্যেই থাকেন কীর্তিমান্ অমর হয়ে।

* * *

মৌজুদ্দিনের গান প্রথম শুনেছিলাম গয়াধামে আজ থেকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে। গয়ার খ্যাতিমান ধনী ও গুণগ্রাহক গোবিন্দলাল সিজুয়ার একদিন নিজে এসে বাবাকে নিমন্ত্রণ করলেন, "আজ মৌজুদ্দিনের মাইফেল আছে আমার গরীবখানায়; বেনারস থেকে আসছে, এমন গান আপনি আর শুন্‌বেন না; অবশ্য আসবেন, পাঁচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে" ইত্যাদি। আমার ডাক-নাম ছিল পাঁচু। তরুণ বয়সে আমার একটি সৌভাগ্য দেখা দিয়েছিল, যা তখনকার দিনে অন্তত বিরল। সঙ্গীতপ্রিয় প্রৌঢ় পিতৃদেব (দীননাথ সান্যাল) রাত্রিকালে ন'টার মধ্যে আহারাদি সমাপন করে তরুণ পুত্র, অর্থাৎ পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'তেন খেয়াল-ঠুমরী সেতার-সরোদের মাইফেলে।

বাবা ছিলেন সরকারী ডাক্তার, সুসাহিত্যিক ও পরিপূর্ণ গীতরসিক। সবরকমের গান ভাল লাগলেও তাঁর প্রাণ পড়েছিল বাংলা খেয়াল, টপ্‌খেয়াল ও টপ্‌পার মধ্যে। রাগ-আলাপের মাধুর্যে আকৃষ্ট হলেও তিনি বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। আমাদের বাসায় প্রায় প্রতি পূর্ণিমাতেই গান বাজনার আসর হ'ত। বাংলা টপ্‌খেয়াল তখনও অন্তর্ধান করেনি। গয়াবাসী দু'চারজন বাঙ্গালী গীতপটু আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে গান করে নিজেরা আনন্দিত হ'তেন, আমাদেরও পরিতৃপ্ত করতেন। তা'হলেও বাড়ীর আসরের মধ্যমণি ছিলেন ভেলুবাবু অর্থাৎ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। ইনিও একজন চিকিৎসক ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় এস্‌রাজের উপর অনন্যসাধারণ দখল এবং উঁচু দরের শিক্ষিত-পটুত্ব। ইনি এবং সমসাময়িক বুলাকিলাল ছিলেন সঙ্গীতধুরন্ধর কান্‌হইয়ালাল ঢেড়ীর যোগ্যতম শিষ্য। বিশেষ করে ভেলুবাবুর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে রাগ-সংস্কারটি মার্জিত হয়ে উঠেছিল, এ কথা চিরদিনই মনে থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে সে সময়ে উপেন্দ্রবাবুর সুন্দর, সুসজ্জিত বৈঠকখানা, যেখানে গীতবাদ্যের বিখ্যাত শিল্পীরা সমবেত হতেন। সেই ঘরটি যেন তম্বুরা, এস্‌রাজ ও হারমোনিয়মের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে এখনও স্মৃতিতে আভাস দেয়। সেখানে আসতেন বৃদ্ধ, কিন্তু সদানন্দ ওস্তাদ হনুমানদাসজী, কাশেম আলী খাঁর ঘরের শিষ্য সরোদীয়া বিশ্বনাথ ভট্ট, ভেলুবাবু, বুলাকি-

লাল, হারমোনিয়মের যাদুকর সোহনীজী ও তাঁর শিষ্য বিহারীলাল এবং প্রশান্তচেতা লয়প্রবীণ দরশন্ সিংজী। এঁরা ছিলেন নৈমিত্তিক সভাসদ্। অন্য যাযাবর শিল্পীদের মধ্যে মনে পড়ে হারমোনিয়মের ঐন্দ্রজালিক বশীর খাঁ; খর্বাকৃতি পিঙ্গলনেত্র ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি বিগ্রহ, যাঁর আঙ্গুলের আগায় খেলা করত বিদ্যুদ্গতি তানের ঝলক।

পালটা আখড়া ছিল অন্দরগয়ায় গোবিন্দলাল ও রাজাবাবুর প্রাচীন ঢংএর কেল্লার অনুরূপ বাড়ীতে। সেখানে হ'ত খেয়াল-ঠুমরী হোরি-দাদরার রংদার মাইফেল এবং বাঈজীদের গানই ছিল বড় খবর। গুণী ব্যক্তিরা সকলেই সমাগত হ'তেন; অভ্যর্থনা হ'ত সেকালের কায়দায় আতর-এলাইচ ও গোলাপ-জলের ছড়া দিয়ে এবং সোনা-রূপার তবকে মোড়া পান দিয়ে। বাদাম-পেস্তা দেওয়া সিদ্ধির পানীয় পরিবেশনই ছিল প্রথা, একালে যেমন চা। হর্‌রা-গর্‌রার ভাগটা একটু প্রবল ছিল; নানারকমের দিল্লগীর মুখবন্ধের পর হ'ত সুরেলা গান। এ সকল কারণে, অথবা বাঈজীদের ভাব-ভঙ্গির প্রাচুর্যের কারণে, বাবা এ ধরণের মাইফেলগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধও এড়াতে পারতেন না, বিশেষ করে ভেলু-বাবুর। যাই হ'ক, গোবিন্দলাল ও রাজাবাবু ধনী ও ব্যসনী হ'লেও সঙ্গীতের যথার্থ অনুরাগী ছিলেন। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম এঁদের বাড়ীতে অজস্র ও উৎকৃষ্ট রকমের রেকর্ড সঙ্গীতের সংগ্রহের মধ্যে। এখন মনে করে আশ্চর্য হই, এঁরা প্রত্যেকটি রেকর্ড আলাদা করে তুলার-সেলাই করা খাপের মধ্যে রাখতেন এবং এক একটি সেট থাকত সুন্দর ক্যাবিনেটের মধ্যে। অন্য নানারকম কারণে বাবা ও আমি যখনি উপস্থিত হ'তাম, তখনই অভ্যর্থনা হ'ত আমাদের রুচি অনুযায়ী রেকর্ডগুলিকে সযত্নে আবরণমুক্ত করে যন্ত্রে চাপিয়ে দিয়ে। আমার পক্ষে এ রকম আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল সারেঙ্গীর শ্রবণমনোহারী সুর ও সঙ্গতের মধ্যে। উপেন্দ্রবাবুর আসরে এর অভাব অনুভব করেছিলাম।

পুরাদস্তুর শ্রোতার সংস্কার নিয়েই আমরা ঐ সকল মাইফেলে উপস্থিত হ'তাম। পশ্চিমা ঢংএর গান-বাজনার প্রতি বিশিষ্ট রকমের প্রীতিকর সম্মোহ গড়ে উঠেছিল আমার মনে। সে সব দিনের কথা স্মরণ করে বলতে পারি, ঐরকম অভিজ্ঞতা বিফলে যায়নি আমার পক্ষে। অন্ততঃ হালকা রকমের

তামাশা বা পাঁচমেশালি সরস্বতী নর্তনের মোহ নিয়ে কালক্ষেপ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে নি।

রাত্রি সাড়ে ন'টা আন্দাজ গোবিন্দলালজীর আসরে পৌছে গেলাম। পরিচিত কলাবিৎ ও সঙ্গীতামোদী সকলে এদিক্ ওদিক্ বসে গেলেন। তম্বুরা, হারমোনিয়ম, তবলা-ডুগি ও সারেঙ্গীর সমারোহে পূবরাগের জল্পনা আরম্ভ হয়ে গেল; অর্থাৎ সকলের মুখে মুখে চলছিল মৌজুদ্দিনের নাম। রাজাবাবু স্বয়ং অসাধারণ সমঝদার; তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একজন সুশ্রী গৌরবর্ণ পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষকে। 'মৌজুদ্দিন' নামে একটা গুঞ্জন উঠল। এর মাথায় ছিল একটা সবুজ রংএর পাগড়া এবং পরিধানে আদ্দির ঢিলা পাঞ্জাবী ও যোধপুরী ঢংএর পায়জামা। রাজাবাবু এঁকে পরিচিত করিয়ে দিলেন বাবার সঙ্গে, যথা—ইনি ডাক্তার, কিন্তু মস্ত বড় সমঝদার, আর ইনিই হ'লেন গণপতরাও ভাইয়া সাহেবের শাগির্দ্ স্বনামধন্য মৌজুদ্দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা রকমের অভিবাদন ও আদব-কায়দার মধ্যে ঐ নামটিই বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তারই অবসরে দেখি মৌজুদ্দিন হাত জোড় করে হাটু গেড়ে প্রবীণ হনুমানদাসজীকে প্রণতি জ্ঞাপন করছেন। আর হনুমানদাসজী আনন্দাশ্রু বর্জন করতে করতে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর মৃদু মধুর গদ্গদ বচনে ছিল আনন্দ ও আশিষের অস্ফুট বাণী। দক্ষিণায়নে অস্তাচলের সূর্য যেন শরতের পূর্ণচন্দ্রকে ভার দিয়ে গেলেন শিশিরসিক্ত রজনীতে কিছুদিনের জন্য জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করতে।

আল্‌গা পাঞ্জাবী ও ঈষৎ বাঁয়ে হেলান পেঁচদার পাগড়ীর মধ্যে দিয়ে মৌজুদ্দিনের মুখে ফুটে উঠেছিল বিনয় ও সরলতার ছবি। পরবর্তী কালের উদ্দাম জীবনলীলার আবর্তে পড়েও সেই বিনয় ও সরলতা অন্তর্হিত হয়নি। তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল অল্প স্বল্প বসন্তের দাগ; তাতে মুখশ্রীর ক্ষতি হয়নি। চোখের চাহনি স্বাভাবিক হলেও চঞ্চল সপ্রতিভ কটাক্ষে মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। চোখের দুই প্রান্তে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সুরমার লাবণ্যরেখা। সুর্মা ও পাগড়ী সম্বন্ধে মৌজুদ্দিনের বাতিক ছিল, পরে জেনেছিলাম; কিন্তু সে কথা পরেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে ভেলুবাবু প্রস্তাব করলেন, "এখন আপনারা মৌজুদ্দিনকে

একটু রেহাই দেন, সে তৈরি হয়ে আসুক।” তৈরি হওয়ার ব্যাপার পরম্পরায় জানলাম। মৌজুদ্দিন প্রথমে দু-দশটা ডন্ বৈঠক সেরে গোসল্ করবেন; তার পরে কিছু পুরী হালুয়া সেবন করে বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মতে কণ্ঠশুদ্ধি করবেন। তখন বুঝতে হবে মৌজুদ্দিন তৈয়ার হয়েছেন। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মৌজুদ্দিন ও কালে খাঁ সাহেব মাত্র এই দু'জনকেই দেখেছি গান করার আগে বেশ কিছু আহার করে নিতে। মৌজুদ্দিন ছিলেন মিতাহারী; কালে খাঁ ছিলেন অমিতাহারী। কিন্তু দু'জনই ছিলেন পুরী-হালুয়া-রাবড়ী-মিঠাইয়ের ভক্ত।

সাড়ে দশটা আন্দাজ মৌজুদ্দিন এসে বসলেন আসরে। তম্বুরা, সারেঙ্গী ও তবলা বেশ চড়া সুরে বাঁধা হয়ে গেল। মৌজুদ্দিনের একদিকে বসলেন সোহনীজী, তাঁর দর্শনধারী বপু নিয়ে, অন্য দিকে বসলেন নিরতিশয় সৌখীন বিহারীলাল; প্রত্যেকের সামনে একটি করে সুন্দর স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়ম্। মৌজুদ্দিনের পিছনে ডান দিকে বসলেন একজন প্রৌঢ় সারেঙ্গী বাদক। বাঁদিকে থাকলেন একটি ছিম্‌ছাম্ চেহারা যুবা বয়স্ক তবল্‌চি। ইনি লক্ষ্ণৌ থেকে এসে মৌজুদ্দিনের সঙ্গ নিয়েছেন। এঁর মাথায় লক্ষ্ণৌ টুপি; পরিধানে পাতলা পাঞ্জাবীর মধ্যে দিয়ে তাঁর গলায় একটি কণ্ঠি ও হাতে চৌকোন তাবিজ দেখা যাচ্ছিল। তবল্‌চি ও পালোয়ানদের বড় ভয়, জিন্ বা পরীর নজর লেগে যেতে পারে। মৌজুদ্দিনের ঠিক পিছনেই একজন গীতনবীশ তম্বুরা কোলে করে সুর ছাড়তে লাগলেন। তম্বুরার মধুর গুঞ্জনের ফাঁকে ফাঁকে সুরদিগন্তের নীলিমায় ভরা গান্ধারের অনুধ্বনি ভেসে আসছিল। বাবা ছিলেন ইমন-কল্যাণের ভক্ত; আমাকে চুপে চুপে বললেন, বোধ হয় ইমন-কল্যাণ সুরু হবে।

কিন্তু দেখি মৌজুদ্দিন আড়চোখে সারেঙ্গী বাদকের দিকে কটাক্ষ করেই গান ধরে দিলেন। কোনও রকম গুন্‌গুন্ বা গৌরচন্দ্রিকা না করে এত সংসিদ্ধ সুরে ও অসন্দিগ্ধ মেজাজে অবলীলাক্রমে গান ধরতে আমি এর পূর্বে কোনও ওস্তাদকে দেখিনি; পরেও দেখিনি। অবশ্য বাঈজীরা প্রকাশ্যে তোম-তায়নোম করেন না। তবুও গান ধরার পূর্বে তাঁরা সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে একটু আধটু গুন্‌গুন্ করেন। সে দিন এবং পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গানের পর গানের মধ্যে দিয়ে মৌজুদ্দিনের কণ্ঠস্বরের

অবিকৃত স্ফূর্তি ও সুরের সপ্রতিভ লীলা। তাঁর আরম্ভিক প্রগল্ভতার মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি; তাঁকে কখনও সুর খুঁজতে দেখিনি।

বীণাধ্বনির মত মধুর অথচ শঙ্খধ্বনির মত বলশালী সেই অতুলনীয় কণ্ঠস্বর এখনও কাণে লেগে রয়েছে। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা স্মরণ করে মাত্র অন্য একজন গুণীর কথা মনে পড়েছে; মথুরানিবাসী বিখ্যাত ধ্রুপদী চন্দন চোবেজী। মধুর ও বলশালী হলেও এঁর কণ্ঠে মৌজুদ্দিনের মত কাশ্মিরী ছাঁচের কারুকার্য্য ছিল না। অবশ্য প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কারণ, ধ্রুপদ ধামারের প্রৌঢ় পরিপাটী ও ঈষৎ-প্রমত্ত মন্থর গতিভঙ্গি নিয়ে রাগের যে সংযত প্রশান্ত রূপ ফুটে ওঠে এবং জলধরধ্বনির মতো মধুর গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি দিয়ে যে রূপটি আদ্যোপান্ত পুষ্ট হতে থাকে, তার অঙ্গে চিকন চঞ্চল সুর-বিভূতি শোভা পায় না। এ কালের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়, একমাত্র জ্ঞান গোস্বামীর কণ্ঠেই বীর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব মিলন দেখা গিয়েছিল। ভাগ্যদেবী জ্ঞান গোস্বামীকে ও-রকম কণ্ঠস্বরের অধিকার করেও তাঁর জীবনসূত্রটি অকালে কর্তিত করলেন, এটা বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট। মৌজুদ্দিনের সম্বন্ধে তুলনামূলক প্রসঙ্গে পিতৃদেব তাঁর কণ্ঠস্বরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলতেন, অঘোরবাবুর গলাও ঐ রকমের ছিল, কিন্তু তাতে অত সুন্দর সূক্ষ্ম গিটকিরী হত না। পরে আমার গুরুদেব শ্যামলালজী ও বদল খাঁ সাহেবের মুখে অঘোরবাবুর সম্বন্ধে ঐরকমের মন্তব্য শুনেছি। কণ্ঠের দীপ্তি বা ওজোগুণের প্রসঙ্গে বাবা আর একজন সৌখীন গুণীর নাম করতেন; তিনি লালচাঁদ বড়াল। গয়াতে থাকার সময়ে মৌজুদ্দিনের ও লালচাঁদের রেকর্ড-গীত কয়েকখানি তুলনা করার সময়ে মনে হত, মৌজুদ্দিনের কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে জোছনার মত; লালচাঁদের কণ্ঠ যেন সূর্যের আলোর মত ছেয়ে পড়েছে। বেশ বুঝতাম, মৌজুদ্দিনের গানের মধ্যে ছিল গায়কীর সূক্ষ্ম নিতুই-নব মর্ম্মস্পর্শী আবেদন এবং লালচাঁদের গানে দেখা দিয়েছে সুরের স্থির অকৃপণ দাক্ষিণ্য ও তেজোময় আহ্বান।

পিতৃদেব ইমন-কল্যাণের আশা করেছিলেন, কিন্তু মৌজুদ্দিন ধরে দিলেন পুরিয়া রাগের প্রসিদ্ধ গান "সুপ্‌নেমে আয়ে পিয়া"। এর পরে গেয়েছিলেন "ফুলবা বিনত ডার ডার" পরজ বসন্তের গান জলদ একতালার ছন্দে।

মনে পড়েছে স্থরের রচনাকৌশল, গানের ভাবভঙ্গি, গীতের রূপ-মাহাত্ম্য। খুঁটিয়ে বিচার করার যোগ্যতা ছিল না; কিন্তু অনুভবে মাধুর্য ও চমৎকৃতি আস্বাদ করার অধিকার এসে গিয়েছিল। পরে, কলিকাতায় মৌজুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্থযোগে এ-সব গান ও অন্য অনেক গান ভাল করে আলোচনা করার স্থবিধা পেয়েছিলাম। প্রথম পরিচয় পক্ষে মাত্র মনে পড়ে "স্থপ্ নেমে" গানটি গাওয়া হয়েছিল ঢিমাঠেকার সঙ্গে; এর সম্ এসে পড়ছিল খাদের কড়ি মধ্যমে এবং সমের ঠিক পরেই খাদের গান্ধার থেকে মুদারার কোমল রেখব পর্যন্ত একটি মীড়ের অপূর্ব জ্যোতিরেখা আমার মনকে বিহ্বল করে তুলেছিল। অকস্মাৎ এসে উদয় হচ্ছে পরবর্তী কালের দু'একটি স্মৃতি, যাকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না। মনে পড়ছে রাধিকা গোস্বামীর কণ্ঠে দরবারী কানাড়ার ধৈবত-গান্ধারের অপূর্ব মিলনমূর্ছনা এবং চন্দন চোবেজীর কণ্ঠে পঞ্চম রেখবের সংবাদ-মাধুরী। কিন্তু এঁদের কাছে আজ বিদায় নিতেই হবে।

বিচিত্র মর্মস্পর্শী মূর্ছনা, ছোট ছোট ফিরৎ ও মুর্কি এবং শ্রবণমধুর তানের তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে পুরিয়ার গানটি অনুভবের মধ্যে যে উন্মেষের রূপে দেখা দিয়েছিল, তাকে ভাষায় লিখি কি দিয়ে, কেমন করে? এর পরে মনে পড়ছে অনুভবের মধ্যে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ।

পরজ-বসন্তের গানটির মাঝামাঝি অবস্থায় অনুভবের শিকল ছিঁড়ে গেল, একতালার ছন্দে সূক্ষ্ম দ্রুত ও তীক্ষ্ণধার স্বরবর্ষণের কারণে। কি করে স্থর থেকে স্থরে এই বিদ্যুদ্‌গতি সম্ভব হয়, এই চিন্তাই মনে উদিত হচ্ছিল। বাবাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "গলার মধ্যে প্রত্যেক স্থরের কি আলাদা পর্দা আছে?" তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। গান শেষ হলে বাবা মৌজুদ্দিনকে বল্লেন, "আমার ছেলে জিজ্ঞাসা করছে—আপনার গলার মধ্যে কি কোনও যন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন? না হলে ও-রকম স্থরের দানা বার হয় কি করে?" প্রশ্ন শুনেই মৌজুদ্দিন সস্মিত অথচ সলজ্জ হয়ে বার বার সেলাম জানাতে থাকেন; অর্থাৎ জিজ্ঞাসার ছলেই যেন প্রশংসা করা হয়ে গেল। ভেলুবাবু, সোহনীজী প্রভৃতি সকলেই তারিফের উপর তারিফ, সমর্থনের উপর অনুমোদন বর্ষণ করতে লাগলেন। যথা "হদ্দ কিয়া ভাই মৌজুদ্দিন!" "মৌজুদ্দিন কমাল কিয়া", "রাম জানে, ভগবান্ উনকে

গলেমে ক্যায়সা রস ভর দিহিন", "তো পরমেশ্বরকা হি লীলা হ্যায়, বস্ ওর ক্যা!" প্রবীণ হনুমানদাসজী রায় দিলেন—যার মর্ম এই, মৌজুদ্দিনের নৈপুণ্য কুদ্‌রতি অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত সন্দেহ নেই এবং এসব ব্যাপারের হিসাব ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার সরল প্রশ্নের ও-রকম সরলতর মীমাংসা হ'তে দেখে ভাবলাম, তাই ত! আমি কি বোকা! এত সহজ কথাটা আগে বুঝতে পারিনি!

মৌজুদ্দিন সে আসরে পর পর আরও তিনখানি গান গেয়েছিলেন। বিচার করে বাহবা দেওয়ার মত চৈতন্য বা অবকাশ কারও ছিল না; সকলে অভিভূত হয়েছিল সুরের মাদকতায়। তারিফ হচ্ছিল ভাবের আবেগে। ভাসা ভাসা মাত্র মনে পড়েছে একটি চরণ—"ডগমগ হালে মোরি নইয়া কনহইয়া বিন্" এবং ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছে—এর মধ্যে কোমল ধৈবতের অনিন্দ্যসুন্দর বিলাস-বিভ্রম!

রাত্রি একটায় যখন বাড়ী ফিরছি, তখন গাড়ীতে বাবা বললেন, খেয়াল গান এত মধুর হতে পারে, এ তিনি কখনও ভাবেননি। বরোদার প্রসিদ্ধ খেয়ালী মৌলাবক্সও এফ্ স্কেলে গান করতেন, তবে এমন সরস গান তাঁর মুখে শোনেননি। রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের বাড়ীর আসরে তখনকার বড় বড় খেয়ালীরা আসতেন, তাঁদের গানও শুনেছি এবং তাঁদের কারীগরিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এত চিকন কাজও ছিল না, এত রসও ছিল না। আর ঠুমরী বলতে ছিল তয়ফাওলীদের অত্যন্ত হালকা গান এবং লক্ষ্ণৌর নবাবের রচিত "যব ছোড় চলি লখ্‌নউ নগরী" গানের অনুকরণে "কত কাল পরে বল ভারত রে" সুরে কয়েকটি গান। কিন্তু পুরুষ মানুষ আসরে বসে ঠুমরী গায়, ঠুমরী গানও আবার মধ্যমান-আড়ার মত ঢিমা তালে গাইতে হয় এবং সেই গান শুনে মোহিত হয়ে বসে থাকতে হয়, এটা তাঁর পক্ষে একেবারেই নূতন অভিজ্ঞতা। যাঁরা এ রকম ঠুমরী গান জীবনে শোনেননি, তাঁরা সম্ভবতঃ বই-পড়া অভিজ্ঞতা নিয়েই থেকে যাবেন।

পরদিন সকালের জন্য রাজাবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল ভৈরবীর মাইফেল উপলক্ষ্যে। ভৈরবীর মাইফেল অর্থ—পরিতোষ করে ভৈরবী গান এবং সে গান গাইবেন মৌজুদ্দিন। আমরা যাইনি; কারণ, পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল। জমিদার বা রইসদের ভৈরবীর আসর সাজাতে বেলা এগারটা এবং

শেষ হতে কমপক্ষে বেলা দুটো। লোক-পরম্পরায় খবর পেলাম, ভৈরবীর মাইফেলের পরে মৌজুদ্দিন কলিকাতায় রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন।

জ্যোতিষ্কের ক্ষণিক পরিচয় পেয়েছিলাম গয়াতে। কিছুকাল পরে কলিকাতায় অভিনব পরিবেশের মধ্যে হয়েছিল শ্রদ্ধা ও বিস্ময় দিয়ে পূর্ণতর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়।

ইংরাজী ১৯১২ সাল থেকে আরম্ভ হল কলিকাতার সঙ্গীত-স্মৃতির নূতন দিগন্ত। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সুখ-স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে কয়েকটি বড় বড় নক্ষত্রব্যূহ ও তাদের আশে-পাশের তারকাবীথিগুলি। স্বয়মাগত স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট ও প্রধান হয়ে দেখা দেয় মহারাজ নাটোরের ভবনে গুণী সমাগম, আমার সঙ্গীতগুরু শ্যামলাল বাবুজীর সঙ্গীত-তীর্থ, উত্তর কলিকাতার "সঙ্গীত-সমাজ," মুরারি সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনগুলি, শেঠ দুলীচাঁদের দমদমার বাগানবাড়ীর সঙ্গীতের মাইফেলগুলি এবং শঙ্কর উৎসবের বার্ষিক মেলনগুলি। ছোট ছোট নক্ষত্র-বীথি ও নিহারিকাপুঞ্জও স্মরণের দাবী নিয়ে উদিত হয়; বিশেষ করে শ্যামলালজীর আত্মীয়-বন্ধুবর্গের বাড়ীর আনুষ্ঠানিক জলসাগুলি। যথা, চুনিলাল বর্মন্ এবং শ্রীদামোদর খান্না মহাশয়ের ভবনে, গণেশ চন্দ্র চন্দ্রের ভবনে এবং সিমলায় ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের বাসায়। দিব্য আনন্দময় স্মৃতি-বিগ্রহ ধারণ করে উপস্থিত হচ্ছেন তখনকার সঙ্গীত-জ্যোতিষ্কেরা, গন্ধর্বলোকের দিব্য বাণী বহন করে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন মহাবিভাবকে মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, যথা—খলিফা বদল্ খাঁ সাহেব, লছমীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও, কালে খাঁ সাহেব, আল্লাদিয়া খাঁ, মৌজুদ্দিন, রাধিকামোহন গোস্বামী, চন্দন চোবেজী, ভূতনাথবাবু, মহিমবাবু, সরোদীয়া ফিদা হুসেন খাঁ সাহেব, ইন্দোরের বীণকার মজিদ খাঁ, জয়পুরের বীণকার হাফিজ খাঁ, সুরবাহারী ইমদাদ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ও তাঁর অগ্রজ আফতাবুদ্দিন সাধু, হাফেজ আলি খাঁ সাহেব, গণপত রাও ভাইয়া সাহেব, শ্যামলালজী, গহরজান, বীণকার মুনব্বর খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব, কুকভ খাঁ, সোহনীজী, বসির খাঁ, মৃদঙ্গবিশারদ দুর্লভবাবু, নগেনবাবু ও শম্ভু। টপ্পাশিল্পী রাম চাটুয্যে ও রাণাঘাটের নগেন্দ্র ভট্টাচার্য, খলিফা আবেদ হুসেন খাঁ সাহেব, দর্শনসিংজী, বীরু মিশ্র প্রভৃতি। এ ছাড়াও অভাসে দেখা দিচ্ছেন অনেক গুণী, গান্ধর্বিকা ও গুণগ্রাহক, যাঁদের পরিস্ফুট করতে হয় স্মৃতির দূরবীণ দিয়ে বিশিষ্ট প্রসঙ্গের পরিধির মধ্যে।

এঁদের প্রতি সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে নিবেদন করি, আজ আমি ছায়াপথের ওপারে পশ্চিম লোকালোক পর্বত-শিখরে অস্তগমনোন্মুখ ভাস্বর একটি তারকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি ; আজ তাঁকেই অনুসরণ করি।

গুরুদেব শ্যামলালজীকে কেন্দ্র করে গুণীদের জমায়েৎ হত ১০১নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীর দ্বিতল প্রকোষ্ঠে। কাঁচের কাজকরা মেঝের উপর সতরঞ্জি, তার উপর পরিষ্কার সাদা চাদর এবং গুটিকয়েক তাকিয়া ; দেয়ালের সংলগ্ন কয়েকটি আয়না-বসান আলমারী এবং মাথার উপর বিজলী-বাতি ও পাখা ;— এই নিরীহ সাদাসিধা আসরে সকালে ও সন্ধ্যায় জমে উঠত বিচিত্র রকমের গুণীসঙ্গম। প্রধানতঃ চর্চা হত গীত বাদ্য নৃত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয়গুলির ; প্রাসঙ্গিকভাবে ও কথোপকথনের ছলে উপভোগ হত কাব্যসাহিত্য ও কিম্বদন্তীর রূপগুলির। শ্যামলালজী ছিলেন জ্ঞানী, রসিক, সংযতবাক্ ও আজীবন ব্রহ্মচারী। উচ্ছল ও সানন্দ অভ্যর্থনা দিয়ে তিনি সকলকে আপনার করে নিতেন। কুশল প্রশ্ন ও বিদগ্ধ আলাপের মধ্যে দিয়ে আপ্যায়িত করতেন গুণীদের ; অনুগৃহীত করতেন তাঁদের যথাযোগ্য পরামর্শ দিয়ে ও যথাসাধ্য সাহায্য করে। বৈঠক থেকে ফিরে যেতেন সকলেই সেই শুদ্ধ শিষ্ট সত্তার প্রভাব নিয়ে। সেখানে ফিরে আসার কারণের অভাব ঘটত না।

আমার জীবনে ঠিক এ রকমের সমাগম আর দেখিনি। সেই সাদা ফরাসের উপরেই বিভিন্ন সময়ে আসন গ্রহণ করেছেন সঙ্গীতের মূর্তিমান্ বিগ্রহ গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব, খলিফা বদল্ খাঁ সাহেব, মৌজুদ্দিন, কালে খাঁ সাহেব, আল্লাদিয়া খাঁ, চন্দন চোবেজী, রাধিকামোহন গোস্বামী, মুস্তাক হোসেন খাঁ সাহেব, সজ্জাত হুসেন, জনাব মির্জা সাহেব, দিল্লীর মীর সাহেব, গহরজান বাঈজী, আগ্রাওয়ালী মাল্কাজান বাঈজী, চুল্বুল্লেওয়ালী মাল্কাজান বাঈজী, জদ্দন বাঈজী, তখনকার উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যপটীয়সী চৌধুরাণ বাঈজী, সরোদিয়া ফিদা হুসেন খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁ সাহেব, ইমদাদ খাঁ সাহেব, বীণকার মজিদ খাঁ ও হাফিজ খাঁ, হারমোনিয়মের সেরা শিল্পী বশীর ও জঙ্গী, শম্ভুপাখাওজী, ন্যাটা আব্বুল, বীরু মিশ্র ও আবেদ্ হুসেন খাঁ সাহেব প্রভৃতি বিচিত্রকর্মা কলাকুশলী। প্রসিদ্ধ গীতশিল্পী গিরিজাবাবু, যিনি প্রথমে রাধিকা গোস্বামীর ও পরে গণপত রাও সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখনও শ্যামলালজীর পক্ষপুটের আশ্রয়ে সাধনা করছেন। প্রায়

নিত্যকার সভাসদের মধ্যে বদল্ খাঁ সাহেব, হকিমজী, ঠুমরীর অদ্বিতীয় সমঝদার তন্নুলালজী এবং আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ গুণগ্রাহক সন্ধ্যার আসরে এসে জমতেন এবং রাত দশটা বা এগারোটায় ফিরতেন।

আমি তখন বদল খাঁ সাহেব ও শ্যামলালজীর নিকট খেয়াল-ঠুমরী শিক্ষা করছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা বশীর খাঁ তল্পিতল্পা সমেত এসে উপস্থিত ইন্দোর থেকে, বারাণসী ঘুরে; সুসমাচার বহন করে অর্থাৎ আগামী কাল মৌজুদ্দিন আসছেন। বশীরের কথা পূর্বে বলেছি। ইনি শ্যামলালজীর শিষ্য এবং প্রত্যক্ষ যা দেখেছি, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম, ইনিই একমাত্র হারমোনিয়ম শিল্পী, যিনি মৌজুদ্দিনের সঙ্গে সানুরাগে ও সসম্মানে সঙ্গত করতে পারতেন। শ্যামলালজী হারমোনিয়মে প্রায়ই অনাবিষ্কৃত পূর্ব দু'পাঁচটি তান তুলে মৌজুদ্দিনের ধ্যানের গোচর করতেন। কিন্তু মৌজুদ্দিন সেই তানগুলি কণ্ঠে প্রকাশ করতে থাকলেই বাবুজী অনুভবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাজ্না ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন। ঘরোয়া বৈঠকে তন্নুলালবাবু আদর করে বশীরের নাম দিয়েছিলেন "কোয়েল"। নামটি সার্থক মনে হত; অমন মিশমিশে কালো রং, ছোট ছোট চোখে হলদে আভা এবং ছোট দুটি পাতলা ঠোঁটের উপর তাম্বুলের রক্তরাগ, এমন সমাবেশ বড় একটা দেখা যায়নি; কিন্তু আসল কথা ছিল, বসন্তের বার্তা যেমন কোকিলের মুখেই সাজে, বশীর খাঁ তেমনি করে মৌজুদ্দিনের আগমনী বার্তা নিয়ে আসতেন। এঁর মত গুরুভক্ত খুব কমই দেখেছি এবং কি সুখে, কি দুঃখের সময়ে মৌজুদ্দিনের হিতসাধন এবং সেবা-শুশ্রূষা করতে বশীরের মত কেউ ছিল না।

তন্নুলালবাবু তাকিয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন; দুলীচাঁদবাবু, গহর ও মাল্কা বাঈদের ফোনে খবর দিতে। দুলীচাঁদ ছিলেন গণপত রাও সাহেবের শিষ্য; গহর ও আগ্রাওয়ালী মাল্কা, শ্যামলালজীর শিষ্য। উপস্থিত সকলে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। মৌজুদ্দিন অথবা মোজ্দিন কখন কোন গাড়ীতে আসছেন, তাঁর মেজাজ ও তবিয়ৎ ঠিক আছে কি না প্রভৃতি প্রশ্নের বাণে বশীর জর্জরিত হয়ে পড়লেন। একটু অবসর পেয়ে স্থির হলে পরে বশীরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম গয়াজীতে উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর আসরের কথা পেড়ে। বশীর আহ্লাদে ও বিস্ময়ে তাঁর দু'হাত দিয়ে এই তরুণ ভক্তের ডান হাতটি চেপে ধরল এবং বাবুজীর মুখের দিকে তাকাতেই বাবুজী সহর্ষে তাঁর পুরাণা ও

হালের শাগ্‌রেদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বশীর সেই দিন থেকেই আমার উপর ভারী খুশী। সতীর্থ বলতে আমার হৃদয়ে যা কিছু অভিমান আছে, তার মধ্যে বশীরই বারো আনা দখল করে রেখেছে।

পরের দিন বেলা তিনটার সময় উপস্থিত হলাম বৈঠকে, মৌজ্‌দিনকে নূতন করে দেখার আগ্রহে।

দেখি, ঘরের একদিকে আলমারীর নিকটে বসে সেই গয়ার মৌজ্‌দিন আয়নার দিকে আড়চোখে নজর রেখে পাগড়ীর পেঁচ কষছেন এবং বশীরের সঙ্গে মৃদুস্বরে ইষ্টগোষ্ঠীর খবরাখবর নিচ্ছেন। বশীর আমাকে দেখেই বলল, "আসুন আসুন পাঁচুবাবু, ইনিই স্বয়ং মৌজ্‌দিন খাঁ সাহেব।" আমি দুজনকে আদাব করেই মৌজ্‌দিনকে লক্ষ্য ক'র গয়ার মাইফেলের প্রসঙ্গ করলাম। মৌজ্‌দিন প্রতি নমস্কার করে বলতে লাগলেন, "হাঁ, হাঁ" "কেঁও নহি" "বেশক্‌ বেশক্‌" অর্থাৎ নিশ্চয়ই গয়াতে সেই জলসা হয়েছিল, তাতে সন্দেহ কি? বুঝলাম তাঁর মনে বিশেষ কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। বিস্মৃতির ছিদ্রগুলি আবরণ দিয়ে সুন্দর করার পক্ষে অমন মন্ত্র আর নেই "বেশক্‌" শব্দটির মত।

পাশের ঘরে বাবুজী কিছু পাঠ করছিলেন। পাঠ বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন বৈঠকে। তাঁর কপালে হোমস্নিগ্ধ ভস্মের তিলক, চোখে সোনার চশমা, গায়ে বৃন্দাবনের দামী নামাবলী। বাবুজী আমাকে দু'খানি নামাবলী দিয়েছিলেন; ব্যবহার না করে সে দুটিকে এখনও সযত্নে রেখেছি আমার ঘরে বীণাটির উপর পাট করে। নামাবলীর শুভ্র পটের উপর অদৃশ্য লিপিতে অঙ্কিত রয়েছে চরিতাবলীর সুখ-স্মৃতিগুলি। স্মরণের প্রদীপ জ্বলে উঠলেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে ওর মর্মকথা, রহস্যগুঞ্জন।

বাবুজী আমাদের ডেকে নিকটে এসে বসতে বললেন। মৌজ্‌দিনের দিকে তাকিয়ে হতাশার অভিনয় করে, কপালে করাঘাত করে বললেন, "অরে মৌজ্‌দিন! সেই কখন রাত্রি দশটায় হবে দুলীচাঁদের ওখানে জলসা, আর এখন থেকেই পাগড়ীর কসরৎ! ওসব রাখো। এদিকে এসো।" অর্ধবদ্ধ পাগড়ী হাতে মৌজ্‌দিন উঠে এসে বসল বাবুজীর সামনে। বাবুজী মৌজ্‌দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারই মধ্যে রসিকতা করে বললেন, "এহ্‌ পাঁচুবাবুকে দেখ্‌ছ, এর কান ভয়ানক তৈরী। এর সামনে হুঁশিয়ার হয়ে গাইবে, যেন বেসুরা না হয়!" আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম, যখন দেখি

মৌজ্‌দিন ঐ রসিকতা বুঝতে পারলেন না এবং আমার দিকে একটু অভিনিবেশ করে তাকিয়ে বললেন, "বাবুজী! খুবই খুশীর কথা, বড়ই আনন্দের কথা। কি বল ভাই বশীর।" বশীর এর উপর কথার পালিশ্‌ দিয়ে পরিষ্কার করে দিল, "নিশ্চয়ই ত, কেনই বা হবে না, কার আশ্রয়ে কোন্‌ বৈঠকে হাজির দেখছ না?"

পরেই বাবুজী আমাকে বললেন, রাত্রি ৯টার মধ্যে এখানে এসে হাজির হতে; এখান থেকে যাওয়া হবে দমদমায় দুলীচাঁদবাবুর বাড়ীতে। মৌজ্‌দিন খুব খুশী। কলিকাতায় এসেই জলসা এবং দুলীচাদ বাবুর বাড়ীতে জলসা মানে অন্ততঃ একটা ভাল পাগড়ী বা দু-পাট্টা এবং নগদ পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা লাভ।

বাবুজী বশীরকে বললেন, ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সারেঙ্গীয়াকে এবং তবলচি আলিকদরকে নিমন্ত্রণ করে আসতে, দুলীচাঁদবাবুর মাইফেলে সংগত করবার জন্য। বশীর তৎক্ষণাৎ উঠে কাপড় বদলাতে গেল। মৌজ্‌দিন একটু উস্‌খুস্‌ করছিলেন, বললেন, "বাবুজী বশীরকে একটা কথা বলে আসি।" বাবুজী বললেন, "হাঁ হা যাও, যাও। ওখানকার জন্য কিছু সলা-পরামর্শ করে নেওগে।" ব্যাপারটা এই, বাবুজীর বাড়ীতে বসে সে কিছুতেই উত্তেজক বস্তুর সেবা করবে না, মরে গেলেও নয়। কাজটা নিভৃতে সারতে হবে দুলীচাঁদের বাড়ীতে। বশীর হল একমাত্র উত্তর সাধক, তাকে আগে থাকতেই যোগাড় করে রাখতে হবে কিনা—বাবুজী ব্যাখ্যা করে বললেন।

একটু পরেই দু'জন ফিরে এসে বসলেন। বাবুজী ঘরের মধ্যে থেকে গুটিচারেক নিজের হাতে তৈরী পান নিয়ে এসে বশীরের হাতে দিলেন। নমস্কার করে বশীর বেরিয়ে গেল; 'কোয়েল' চলে গেল বসন্তের বার্তা প্রচার করতে। বাবুজী মৌজ্‌দিনকে বললেন, "পাগড়ীর বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওগে। ট্রেণের ঝকমারী নিয়ে এসেছ; আবার রাত জাগতে হবে না?" বলে একটু চোখ টিপে "বলত আজ রাতের মাইফেল বন্ধ করে দেই, কি বল?" মৌজ্‌দিন ছেলেমানুষের মত ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে বলে উঠল "না, বাবুজী না আমি এখনই ঘুমিয়ে নেই। নিশ্চয় রাত জাগব।" বলে তখনই উঠে গেল। বাবুজী আমাকে বললেন, "এখন পেলে ত তোমার গয়ার মৌজ্‌দিনকে। এর মামলা শুনো রাত্তিরে মাইফেলে।" আমি বাবুজীর অনুমতি নিয়ে তখনকার মত বিদায় হ'লাম।

পথে আসতে আসতে গয়ার মৌজ্‌দিনকে মনে পড়ল। সেই মৌজুদ্দিনই বটে; তবে তার ডিম্বাকৃতি মুখটি যেন পূর্বের থেকে রসাল ও গোলাকার হয়েছে। চোখের সুরমার অন্তরালে দেখা দিয়াছে একটি লালিমা। দশন-সুন্দর হলেও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে সেটা শুভসূচনা করে না। তবে কি মদিরাদেবী প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে? তখন মৌজ্‌দিনের বয়স মনে হল ত্রিশ কি বত্রিশ। আবার ভাবলাম, রাত জেগে ট্রেণে আসার কারণেও হতে পারে। অথবা বাবুজীর কাছে শুনেছিলাম ও রকম লালিমা তমাশ্‌বিন পুরুষের লক্ষণ। তমাশ্‌বিন অর্থাৎ বাৎস্যায়ন মুনির সংজ্ঞায় নাগরিক। ও রকম হলেই যে আয়ু কমে যাবে, এমন কথা নেই। চিন্তার সূত্রটি মিলিয়ে গেল।

ঢুলীচাঁদবাবুর বাড়ীর মাইফেল বলতে বিরাট হলঘর, অজস্র বন্ধু-সমাগম; তার উপর রবাহূত লোকও আছে। প্রধান লোকদের কথা মনে পড়ে, যথা বদল্ খাঁ, বাবুজী, বশীর খাঁ, গিরিজাবাবু, তন্নুলালবাবু, ঢুই মাল্‌কা, গহর প্রভৃতি। বিশিষ্ট বলেই মনে পড়ে ঢুলীচাঁদবাবুর স্ত্রী তারাবাঈ, যিনি আল্লাদিয়া খাঁ ও বদল্ খাঁ সাহেবের নিকট উৎকৃষ্ট খেয়াল শিখেছিলেন: কিন্তু কখনও বাইরে গান করতেন না।

মৌজ্‌দিনের সঙ্গত্ করার জন্য বসলেন বাবুজী ও বশীর হার্মোনিয়ম নিয়ে; গিরিজাবাবু নিলেন তম্বুরা; সারেঙ্গী বেঁধে নিলেন বেঁটে গোলগাল চেহারা ইমদাদ খাঁ সারেঙ্গীয়া, যিনি গণপতরাও সাহেবের ঘরের তান কর্তবে অভ্যস্ত, এমন কি সুপটুই ছিলেন এবং গহরের সঙ্গে সংগত করতেন; আবেদ্ হুসেন খাঁর ঘরের শিষ্য আলিকদর তবল্‌চি,—চুলবুল্লেওয়ালী মাল্‌কাজান্ বাঈজীর ভাই,—ইনি, ডুগী-তবলা ধরলেন।

যথারীতি গান আরম্ভ হ'ল। মৌজ্‌দিন আরম্ভ করলেন "এ অবতো রুত্‌মানে আয়ে" পুরিয়া-ধানশ্রীর ঢিমা আস্থায়ী। এর পরে ধরলেন "সাঁবরো তু মেরি" দিন্-কি-পুরিয়ার মধ্যলয়ের আস্থায়ী এবং খেয়াল অঙ্গ শেষ করলেন "ডাল ফুল ফল" পরজ-বাহারের বিচিত্র গান দিয়ে।

শেষের গানটির মধ্যে পরজ ও বাহার ছাড়াও অন্য অনেক রাগের এত বিচিত্র সংস্পর্শ ও অপ্রত্যাশিত ছায়ার সৃষ্টি হচ্ছিল যে, মৌজ্‌দিন, বাবুজী, বশীর ও ইমদাদ এঁরা কেউই পরিবেশন থেকে বিরত হতে পারছিলেন না। বাবুজী আগে নূতন রাগের ছায়া দেখান মাত্রই, মৌজ্‌দিন তাঁর অসামান্য

প্রতিভা দিয়ে রাগের অভিনব লতাবিতান রচনা করছিলেন এবং অদ্ভুত সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফিরে আসছিলেন পরজের উপক্রমণিকায়। বুঝলাম—'বাহার' বলতে 'বাহার' রাগ নয়; বাহার অর্থে বিচিত্র শোভা। ঠিক এ রকম গান আর শুনিনি। অথচ একে 'রাগমালা' বা 'সাগর'ও বলা যায় না।

যাই হ'ক—সুর ও রসের দিক দিয়ে অনবদ্য হয়েছিল পুরিয়া-ধানশ্রীর গানটি। এখানেও মর্মে মর্মে অনুভব করলাম—মৌজ্‌দিনের কণ্ঠমাধুর্য ও রচনা-চাতুরী; আরম্ভেই ছিল রেখব-ষড়জ-নিখাদের একটি কন্ (সুরের কণা); সপ্রেম অভিমানের একটিমাত্র কটাক্ষের মতো তীব্র সতক অথচ মধুর! আর এর পরেই ছিল সেই উদারার নিখাদ থেকে মুদারার কোমল ধৈবত পযন্ত একটি মীড়; অভিমানের অন্তে যেন হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য উছলে পড়েছে একটি মাত্র অশ্রুরেখার মধ্যে! মৌজুদ্দিনই এমনতর অনুভব আস্বাদ করিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা কানে আর মরমে বেজে ওঠে এখনও। সমস্ত গানটি মনে হচ্ছিল রসে আপ্লুত; মুহূর্তের জন্য মনকে অন্য কাজে লাগাতে পারিনি। গয়াতে যেমন, কলিকাতাতেও তাই; মোজ্‌দিন, মৌজ্‌দিনই আছে এবং তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয় গান থেকে আরম্ভ হ'ল তানকর্তবের উদ্দাম লীলা। খুব মন দিয়ে শুনেও তানের মধ্যে পুনরুক্তি পাই নি। মধুর অবিকৃত কণ্ঠস্বর, অনন্যসাধারণ কল্পনাবৈচিত্র্য এবং প্রতিভার ব্যক্তিগত স্বরূপ বলতে মৌজ্‌দিন বার বার যে পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, তাকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। মৌজ্‌দিন সেই পরিচয়টি সঙ্গে করেই চলে গিয়েছেন; উত্তরাধিকার রেখে যান নি। যা রেখে গিয়েছিলেন সেটাকে যৎসামান্য অনুকরণ চেষ্টা বলেই মনে করতে বাধ্য হয়েছি। তখনকার দিনে মৌজ্‌দিনকে যারা নকল করতে চেষ্টা করত, শ্যামলালজী ও তন্নুলালজী তাদের বলতেন "নক্কাল" অর্থাৎ "ক্যারিকেচারিষ্ট্।"

সে রাত্রির মত মাইফেল শেষ হ'ল। মৌজ্‌দিন ক্লান্তিবোধ করছিলেন বলে তাঁকে ঠুমরী গাইতে পীড়াপীড়ি করা হয়নি। সকলেই বল্লেন—ঠুমরীর মাইফেল ত আছেই, বাবুজী, দুলীচাঁদ আর মৌজ্‌দিন থাকতে ঠুমরী যাবে কোথা! আজ না হয় নাই হ'ল।

দুলীচাঁদবাবু শ্যামলালজীকে বললেন, "রাত্রির মত মৌজ্‌দিন এখানেই থাক;

বদল্ খাঁর কামরার পাশের ঘরে। বশীরও থাকবে, নইলে ওকে সামলাবে কে!" আমরা যখন বাড়ী ফিরি, তখন রাত দেড়টা বেজে গিয়েছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে গেলাম বাবুজীর ওখানে। তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আমাকে দেখেই বললেন, "বশীর মৌজ্দিন এখনও ফেরেনি। যাকৃগে, কাল গান কেমন শুনলে?" আমি নির্ভয়ে মন্তব্য করে গেলাম, যার শেষ কথা হচ্ছে, "অদ্ভুত ও তুলনা নেই, জবাব নেই।" পরেই জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাল ফুল ফল" গানটি খুব মজার; মৌজ্দিন ওটা কার কাছে শিখেছিলেন?" বাবুজী বললেন, "ওটা আলিয়াফত্তুর ঘরের গান। গহর ওটা শিখেছিল অনেক কষ্ট করে এবং গেয়ে নামও করেছিল। পরে মৌজ্দিন গহরের মুখে শুনে মেরে নিয়েছিল। মৌজ্দিনের কারিগরীর চোটে গহর আর ও গানটি গাইত না। মৌজ্দিন অনেককেই অনেক গান ছাড়িয়েছে, এটা ওর দোষ কি গুণ, বিচার করা শক্ত। তবে মৌজ্দিন ত মৌজ্দিন। ওর বিচারই হয় না। যাহ হ'ক—তুমি ওসব গান বদল্ খাঁর ঝুলিতে পাবে, ভয় নেই।" আমি বললাম, "বাবুজী! বদল্ খাঁর ঝুলি থেকে না হয় আমারই ঝুলিতে এল। কিন্তু লাভ কি? গান করা দূরে থাক, গান শিখতেও যে ইচ্ছা করে না মৌজ্দিনের গান শোনার পর।" বাবুজী হেসে বললেন, "খুব ঠিক কথা! তবে কি জানো, গান-বাজনার সমঝ্দারির রসটুকু পেতে হলে ও কাজের সুখ-দুঃখ বুঝে ভাল করেই শেখা দরকার। সকলেই কি আর মৌজ্দিন হয়, না হবে?"

এ সব কথা হচ্ছে, এমন সময় বশীর এসে হাজির। বললেন, "মৌজ্দিন এখনও ঘুমোচ্ছে। ফিরে গিয়ে সন্ধ্যার সময়ে ওকে নিয়ে আসব। কাল রাত্রিতে বড্ড জ্বালাতন করেছে বাবুজী।" শ্যামলালজী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বশীর যেন তাঁর বেদনা প্রতিধ্বনিত করে বললেন, "ওস্তাদ! আপনার মত পুণ্যাত্মা শরীফের স্পর্শ পেয়েও যে নিজেকে সামলাতে না পারে, তার নসিব খুবই মন্দ। কত বার আপনার পায়ে হাত দিয়ে কসম্ খেয়েছে, কেঁদেছে এবং পরেই দাওৎ রক্ষা করতে গিয়ে হারামী করেছে। ওস্তাদ! দোহাই আপনার! ওকে আপনি আর কাছছাড়া হতে দেবেন না। ও তা হ'লে মরে যাবে।" বলতে বলতে বশীরের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। আন্দাজ চার বৎসর পরে বারাণসীতে মৃত্যুশয্যায় মৌজ্দিনকে সেবা করতে ছুটেছিল বশীর, ইন্দোর থেকে। বাবুজী বা অন্য কেউই তাকে সংযত করতে

পারেন নি। ক্ষণপ্রভার দ্যুতির মতোই আবির্ভাব হয়েছিল মৌজ্‌দিনের। বিদায়ের ছলে অশনি পতনের বেদনাই যেন ভরে দিয়ে গিয়েছেন বিরহের স্মৃতির মধ্যে।

কথাপ্রসঙ্গে বাবুজীর ও চন্দন চোবেজীর মুখ থেকে মৌজ্‌দিনের পূর্ব-বৃত্তান্ত যা শুনেছিলাম, সংক্ষেপে বলব। এরকম বক্তব্যের মধ্যে সালতারিখের হিসাব থাকে না। তবে একটা আন্দাজ করেছিলাম—ঘটনাটি ইং ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যেই সম্ভব।

বাবুজী ও তাঁর গুরু গণপৎ রাও ভাইয়া সায়েব সে বার দ্বাদশ জ্যোতি-র্লিঙ্গব্রত উদ্‌যাপন ক'রে কাশীতে ভাইয়াসাহেবের গঙ্গামহল নিবাসে এসে উঠেছেন। সঙ্গে মথুরানিবাসী চন্দন চোবেজী, মাধোজী প্রভৃতিও ছিলেন। বাবুজীর গুরুভাই কামাখ্যাপ্রসাদ মৈমুরগঞ্জে তাঁর বাগানবাড়ীতে মাই-ফেলের আয়োজন করেছেন। ভাইয়াসাহেব, বাবুজী, চন্দন চোবেজী, কাশীর সঙ্গীত-বিশারদ পাঠকজী প্রভৃতি এবং রাজেশ্বরী ও হুস্‌নাবাঈ প্রভৃতি তথাকার সেরা গুণী ও রসিক ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন। চোবেজীর ধ্রুপদ-ধামার ও পাঠকজীর সঙ্গত্‌ হওয়ার পরে রাজেশ্বরী ও হুস্‌না খেয়াল গান শেষ করে ঠুমরী ধরবেন। আসর জগ্‌মগ্‌ করছে। বাবুজী ও বশীর হার্মোনিয়ম নিয়েছেন।

এমন সময়ে কামাখ্যাপ্রসাদের এক বন্ধু একটি ছোকরাকে ভাইয়া-সাহেবের সামনে নিয়ে এসে বললেন, "ওস্তাদ, এর নাম মৌজুদ্দিন; ভারি মিঠা গলা; অনুগ্রহ করে যদি এর গান একটু শুনেন, এ গাইতে চায়।" ভাইয়াসাহেব অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক। তিনি বললেন, "তাই হোক, মৌজুদ্দিন গান করুক।" একজন সারেঙ্গীয়া নূতন করে সুর বেঁধে নিল। বশীর ও বাবুজী মৌজুদ্দিনের সঙ্গে বাজাবেন, এতে মৌজুদ্দিনের আপত্তি নেই।

শ্যামলালজীর ভাষায়—মৌজ্‌দিন গান ধরতেই বুঝলাম, সে কতখানি বেপরোয়া ও সপ্রতিভ। রাজেশ্বরী বা হুস্‌না মনে নেই, ললিতের একটি আস্থায়ী 'হম্‌ সে অবধ্‌বদ' গানটি গেয়েছিল। মৌজ্‌দিন সেই গানটি নূতন করে আরম্ভ করল। ওস্তাদ কিছু বললেন না, ফলে আমরাও ঐ অশিষ্ট-তায় আপত্তি করতে সাহস করলাম না। শুধু কি তাই! সেই মিঠা গলায় সুর বিস্তার করতে করতে এমন একটু নিরালা ও চমৎকার তান

করে মুখে ফিরে এলো যে, আমাদের হাতের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। ওস্তাদ 'সাবাশ্ বেটা! সাবাশ্' বলে চীৎকার করে উঠলেন ও মৌজ্দিনকে বললেন, 'ফের ঐ তানটি করো।' মৌজ্দিন নূতন রকমের বিস্তার করতে করতে ফের যখন ঐ তানটি করে মুখে ফিরে এল, তখন ওস্তাদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারিফের হুল্লোড় লেগে গেল। চন্দন, রাজেশ্বরী, হুস্না বাঈদের সুরের রং জলে থাক্ হয়ে গিয়েছে। রাজেশ্বরী ও হুস্না হাঁ করে গালে হাত দিয়ে ব'সে শুধু ছোকরার দিকে তাকিয়ে।

আবার গান সুরু হল। এবার মৌজ্দিন আমার দিকে তাকিয়ে এমন কয়েকটি বিচিত্র ফিরৎ আরম্ভ করল যে, আমার মাথা গেল ঘুরে এবং মাইফেল শুদ্ধ লোক জেনে গেল—আমি অপ্রস্তুত হয়েছি। পরেই বশীরের দিকে নজর দিয়ে এমন তান-কর্তব জুড়ে দিল যে, বশীর নাকে চোখে ডোবে আর কি! তবুও বশীর হার্মোনিয়ম ছাড়েনি, বলিহারি তার জেদ। আমি বাজান' ছেড়ে দিলাম। সারেঙ্গীয়াও লবেদম হয়েছে, কিন্তু ওরা কখনও গানের মধ্যে সারেঙ্গী ছেড়ে দেয় না। যাই হ'ক, ব্যাপার দেখে ওস্তাদ আমার হার্মোনিয়মটি টেনে নিলেন। এবার কি হয় না হয়! মাইফেল যেন শ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছে।

ওস্তাদ ত ওস্তাদই। ওঁর উপর ছিল স্বয়ং বিশ্বনাথজীর আশীর্বাদ। তিনি মৌজ্দিনের সঙ্গে যেন অন্তর্যামী হয়ে বাজাতে লাগলেন। মৌজ্দিন কিছুতেই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারল না। মানুষের গলায় যতরকম ফান্দা ও পেঁচ হতে পারে, মৌজ্দিন সেগুলি একে একে শেষ করতে লাগল। এমন সময় অকস্মাৎ ওস্তাদ এমন একটি তান নিলেন, যা তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারত না এবং যার মর্ম আমি বুঝতাম। মৌজ্দিন একটু দম্ মেরে থাকল। ওস্তাদ তানটি শেষ করেই মৌজ্দিনকে বললেন, "বেটা! তুম্হারা গলেকা কাম্ ত হাম্ কর দেখ্লায়া, অব হমারা বাজাকা কাম্ভি ত কুছ গলেমে দেখলাও।" মৌজ্দিন হাত জোড় করে বলল, "ওস্তাদ! আর একবার করে দেখান।" এ কথা সে বলতেই পারে; কারণ, ওস্তাদই তাকে ও রকম পরীক্ষা করেছিলেন। ওস্তাদ অবিকল সেই তানটি করে দেখিয়ে দিলেন। শেষ হতে না হতেই মৌজ্দিন ধরে নিয়েছে। নিখুঁতভাবে সে যখন সেই তানটি শেষ করে নিয়ে এল, তখন

বাহবার চোটে যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। ওস্তাদ মৌজ্‌দিনকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলতে লাগলেন এবং অস্পষ্ট বিড়বিড় করে কি যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কোলাহল থেমে গেলে ওস্তাদ সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—"ভাইসব শুনে রাখো, ঐ তান গলায় করতে পারতেন একমাত্র আহ্‌মদ খাঁ খেয়ালী, আর কেউ নয়। আর আজ এই মৌজ্‌দিন ঐ তানটি কমাল্‌ করল। এর পর আজ আর কিছু হবে না। আজকের মত খতম।"

ওস্তাদ মৌজ্‌দিনকে সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, "বেটা! যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে, এই শ্যামলালের সঙ্গে?" সে তৎক্ষণাৎ বলল, "সেটা আপনার অনুগ্রহ, আমি প্রস্তুত।" চলল সে আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে। পরে জানলাম, তার বাপ মা আত্মীয় বলতে কেউ নেই। ডাল্‌কামণ্ডীর তয়ফা-ওয়ালীরা তাকে গান গাইয়ে নেয়, সকালে জিলাবী ও দু'বেলা লুচি-হালুয়া খেতে দেয়। যাই হ'ক—সে রাত্রিতে আমাদের ওখানে খুব করে মিঠাই-রাবড়ী খেল, আমি আর চন্দন দাঁড়িয়ে থেকে তার খাওয়ার তদারক করলাম। মাত্র দুদিন আগেই শিবরাত্রি হয়ে গিয়েছে। চন্দন বলল, "বাবুজী! বিশ্বনাথজীই বুঝি আপনাদের ব্রতের ফল দিলেন। এখন তাঁর কৃপায় এ আমাদের সঙ্গে থেকে গেলে হয়। বাবুজী! একে নিয়ে আমরা দিগ্‌বিজয়ে চল্‌ব, কি বলেন?" আমি বললাম, "ভাই চন্দন! যে আমাদের দিল্‌কে জয় করে নিয়েছে, ওস্তাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে, তার পক্ষে দিগ্‌বিজয়ের বাকি থাকল কি?"

ওস্তাদ পরের দিন সকালে মৌজ্‌দিনকে ডেকে এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল যে তুমি ললতের মধ্যে ললতের তান করলে, এ তুমি শিখ্‌লে কার কাছে?" মৌজ্‌দিন চেয়েই থাকল, কথার উত্তর দিল না। আমি তাঁকে আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল্‌লাম, "ওস্তাদ একটি তান করেছিলেন, শেষের তানটি। ললত্‌ রাগের মধ্যে মধ্যমকে নূতন করে সুর করে সেখান থেকে ললতের চক্‌কর ঘুরে এসে প'ল মুখে। তুমিও ত সেই তান করলে। ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি ঐ কাজটি কার কাছে শিখেছ?" সে তখন বলল, "আমি কারুর কাছে শিখিনি, খোদা জানেন।" আমরা সকলে অবাক্‌। জিজ্ঞাসা করলাম, "ললতের গানটি পেলে কার কাছে?"

সে সরল উত্তর দিল, "কারুর কাছে পায়নি, সত্য বলছি। হুস্‌না ঐ গানটি করলেন, আমার খুবই ভাল লেগেছিল, তাঁর কথা ও সুর নকল করে গেয়েছিলাম।" ছোক্‌রা বলে কি !! হয় সে ভূত, নয় ত মিথ্যাবাদী। দেখলাম, ওস্তাদ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে গড়গড়ার নলটি মুখে করলেন। তার মেজাজের রকম দেখে আমরা মৌজ্‌দিনকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম।

ওস্তাদের কাছে ফিরে এসে দেখি, গড়গড়ার নলটি হাতে করে ওস্তাদ আনমনা হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে, পাছে আর কেউ শোনে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "শ্যামলাল! এ আর কেউ নয়। এ আহ্‌মদ খাঁই ফিরে এসেছে, প্রতিশোধ নিতে।" আমি সশ্রদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওস্তাদ! প্রতিশোধের কথাটা বুঝতে পারছিনে।" ওস্তাদ যা বলে গেলেন, তার সার কথাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোয়ালিয়রে থাকতে ওস্তাদ অনেক বার আহ্‌মদ্ সাহেবের গান শুনেছিলেন। তখন থেকে বিশ বৎসর আগে আহ্‌মদ্ খাঁ মারা গিয়েছেন। অত বড় পাল্লাদার আওয়াজ কোনও গুণীর ছিল না, অত বড় বে-বয়ান্ (অবর্ণনীয়) রকমের তানাইয়াৎ (তানকুশলী) গাইয়েও কেউ ছিল না। কণ্ঠও ছিল অত্যন্ত কর্কশ। একমাত্র তিনিই খেয়াল গানের মধ্যে যথা ইচ্ছা খরজ বদলে সেই খরজ থেকেই বে-ভার (বে-রাস্তার) তান ও চক্র করতে করতে আসল খরজ ও মূল রাগে উপস্থিত হ'তে পারতেন। ওস্তাদ তাঁরই নিকটে এই রকমের কারিগরী ও কৌশল শিখে নিয়েছিলেন; কিন্তু গলায় দেখাতে পারতেন না, বাজনায় দেখাতেন। যাই হ'ক—কোনও আসরে আহ্‌মদ্ খাঁ উপস্থিত থাকাকালে একজন বাঈজী তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যে বলেছিল, যেখানে কর্কশ-কণ্ঠ গিদ্‌ড় (শেয়াল) গান করে সে আসরে তিনি গান করেন না। আহ্‌মদ্ খাঁর প্রতিপক্ষের লোকেরাও ঐ কথা নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে। ফলে আহ্‌মদ্ খাঁ রাগে দুঃখে আর বাইরে গান করতেন না। গণপত রাওজীর বক্তব্য এই যে—মৃত্যুকালে আহ্‌মদ্ খাঁর মনে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা নিশ্চয়ই হয়েছিল। সেই আহ্‌মদ্ খাঁই জন্মেছেন মৌজ্‌দিনের রূপে; পূর্বসিদ্ধ কণ্ঠনৈপুণ্য নিয়ে আর কুদরতী সুর নিয়ে। তাইতেই ত মৌজ্‌দিন কিন্নরকণ্ঠীদের রং নষ্ট করে তাদের অপমান করেছে।

শ্যামলালজী শেষে বললেন—"তুমি বদল খাঁর সঙ্গে একবার আহ্‌মদ্ খাঁর প্রসঙ্গ করে দেখো, কারণ, বদল্ খাঁ ওস্তাদের থেকেও ন'-দশ বৎসরের বড় এবং আহ্‌মদ্ খাঁর সঙ্গে এক আসরে সারেঙ্গীর আলাপ করেছিলেন, এও পুরানো কথা। আর মৌজ্‌দিনের সঙ্গেও আলাপ করে দেখো। সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে। মাত্র একবার শুনেই একটি গোটা গান আয়ত্ত করে ফেলে। লজ্জার কথা বাইরে প্রকাশ করব কি! মৌজ্‌দিন রেখবগান্ধার জানে না।" ওকে কখনও সারগম করতে শুনবে না।"

বাবুজীর মুখে এই বিনা সাধনায় অদ্‌ভুত সিদ্ধির কথা শুনে আমার হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মৌজ্‌দিন সে বার বাবুজীর বাসায় দিন কুড়ি ছিলেন। সকালে-বিকালে যখনই সুবিধা পেয়েছি, ঐ সরল শিশুর মত ব্যক্তির সঙ্গে গল্পগুজব করে বুঝতে পারলাম, বাবুজী যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। মৌজ্‌দিন রাগ তাল জানেন না, শিক্ষাও করেন নি, সারগমও সাধেন নি। ঠিক যেমন হাঁসের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিলে সে আপনি সাঁতার কাটে, খেলা করে, মৌজ্‌দিনও সে রকম গান করেন, রাগে ও তালে। পূর্বজন্মের সংসিদ্ধি ছাড়া এর আর কি ব্যাখ্যা হ'তে পারে! বাবুজী আরও বলেছিলেন, "ওস্তাদের নির্দেশ ছিল, মৌজ্‌দিনকে নিত্য নূতন গান শুনিয়ে দেওয়ার; তা খেয়ালই হ'ক, ঠুমরীই হ'ক বা আর কিছু হ'ক। ওস্তাদ নিজেই তাকে অনেক গান শুনিয়েছিলেন এবং অন্য গুণী ও বাঈ-জীদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের গান শুনিয়েছেন। কথাটা প্রচার হয়ে গেলে খেয়াল-গাইয়েরা আসতে বা গাইতে চাইতেন না। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি। এখন ও যা গায়, সেগুলি সমস্তই শুনে-শেখা গোটা গান ওর অদ্ভুত স্মৃতি থেকে টেনে বার করা; কসরৎ করে শেখা নয়; কোনও কালেই ও কসরৎ করেনি। তম্বুরাই ধরতে জানে না।"

বদল্ খাঁ সাহেব মৌজ্‌দিনকে যে কত ভাল বাসতেন, এক কথায় বলে বুঝান যায় না। অথচ তিনিই বলতেন, মৌজ্‌দিন ত শ্যামলালের নয়নের মণি, ভাইয়াসাহেবের কলিজা। মৌজ্‌দিনের প্রসঙ্গ হ'লে সঙ্গীতের এই মার্কণ্ডেয় পুরুষটি ঘাড় নেড়ে, মাথা নেড়ে, হাত নেড়ে, কখনও বা আমাদের শুনিয়ে, কখনও বা আপন মনে মৌজ্‌দিনের বিভিন্ন জলসায় কীর্তিকাহিনী

আউড়ে যেতেন। একদিন বদল্ খাঁ সাহেবের সামনে ভাইয়াসাহেবের দরুণ আহ্‌মদ্ খাঁর প্রসঙ্গ উঠিয়েছিলাম। বদল খাঁ সাহেব সে সমস্ত বৃত্তান্ত সমর্থন করে তার উপরেও এক চরম মন্তব্য করলেন—"আরে পাঁচুবাবু! এ কথা আর কাউকে বলো না; মৌজ্‌দিন যখন গান করতে বসত, তখন ওর উপর মুসিকের সৈয়দ ভর হ'ত।" মুসিক অর্থ সঙ্গীত; সৈয়দ বলতে কল্যাণ-কামী ব্যক্তির আত্মা বুঝতে হবে। এর উপরে মন্তব্য অনাবশ্যক।

পর পর ও বিভিন্ন মজ্‌লিশে মৌজ্‌দিনের প্রতিভার নিত্য নূতন পরিচয় আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছিল; এতে আর আশ্চর্য কি! সেবারকার মত প্রায় পঞ্চাশখানা গান শুনেছিলাম। কোথায় কোন্ গান করেছিলেন, এখানে হিসাব দিতে পারব না; কিন্তু মনে গাঁথা আছে। মাত্র এইটুকু না বলে পারছিনে—তাঁর মুখে "কহি মধুর মুরলী ধুন বাজি রে", "শ্যাম তোরে নয়না হো রঙ্গীলে", "ইঠ্‌লাতি আতি লচক্ লচক্", "মুরলীবালে শ্যাম" ও "ছব দিখলায়া যা বাঁকে সমলিয়া"—এ কয়টি ঢিমা তালের ঠুমরী গানের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তার জোড়া তখন আর কারুর কাছে শুনিনি। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে কাশীধামে গিয়ে যখন মোতি বাঈজীর মুখে ঐ কয়টি গান শুনলাম, তখন মনে হ'ল, অস্থির সমুদ্রের গভীরে যেমন মুক্তার স্থির আভা সঞ্চিত হয়, সেই রকম মোতির কণ্ঠেই মৌজ্‌দিনের গানের স্থির লাবণ্য সঞ্চিত হয়েছে। আর, কলিকাতার জদ্দন্ বাঈজীর কণ্ঠে মৌজুদ্দিনের গানের কিছু চমক্ এসে দেখা দিয়েছিল। তা হ'লেও এঁরা কখনও মৌজুদ্দিনের ঢং নকল করতেন না।

মৌজ্‌দিন গজল্-দাদ্‌রা গাইতেন অল্প; কিন্তু যা গাইতেন, সেগুলি হ'ত মারাত্মক। এর মধ্যে একখানি "নদীয়া নারে হিরায় আই কঙ্গনা" গানটির সঙ্গে এমন একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যার মধ্যে মৌজ্‌দিনের হঠকারিতা ও বাঈজী-বিদ্বেষ প্রকট হয়েছিল।

বাস্তবিকই মৌজ্‌দিনের বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল অপরিচিত বাঈজীদের উপরে। আসরে সকলে এসে জমায়েৎ হয়েছে, মৌজ্‌দিন খাসা এদিক্ ওদিক্ চেয়ে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময়ে একজন বাঈজী এসে বসলেন। মৌজ্‌দিন অমনি তার দিকে পিছন দিয়ে ঘুরে বসতেন। কথা-বলা দূরের কথা, তার দিকে তাকাতেনই না। এর সামান্য ব্যতিক্রম ছিল গহর ও মাল্‌কা বাঈযুগলের পক্ষে। কারণ, এঁরা ছিলেন ভাইয়াসাহেব ও শ্যামলালজীর

অনুগৃহীত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সাদা চোখে যে প্রকৃতিকে তিনি অবজ্ঞা করতেন, রাঙ্গা-চোখে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই প্রকৃতির হয়েছিলেন অসহায় ক্রীড়নক। শ্যামলালজী যতদিন জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ ইং ১৯২৮ পর্যন্ত, ততদিন তাঁর বৈঠকে মৌজ্‌দিনের গান ও চরিত্রের অফুরন্ত আলোচনা হয়েছে। মৌজ্‌দিনকে যাঁরা ভাল করে জানতেন, তাঁরা সকলেই মৌজ্‌দিনের দ্বৈধ চরিত্র লক্ষ্য করেছিলেন। কোথায় কোন্ কোন্ মাইফেলে মৌজ্‌দিন নিছক হঠকারিতা করে গান গেয়ে বাঈজীদের অপমান করেছিলেন, এ বিষয়ে অনেক ও নির্ভরযোগ্য কাহিনী শুনেছিলাম। আমার নিজ অভিজ্ঞতার একটি নিদর্শন মনে পড়ছে।

আগ্রাওয়ালী মাল্‌কার মত অমন নম্র নিরহঙ্কার বাঈজী খুব কমই দেখেছি। ইনি একদিন বাবুজীর অন্তরঙ্গগোষ্ঠী নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়ীতে সুগ্‌গন বাঈজীর গান উপলক্ষে। সুগ্‌গন নূতন এসেছেন কলিকাতায়, সম্প্রতি মাল্‌কার অতিথি। এঁর গান পরেও অনেক বার শুনেছি; এঁর মত দাদ্‌রা গানের শিল্পী আমি আর দেখিনি। শ্যামলালজী, মৌজ্‌দিন, বশীর প্রভৃতি আমরা উপস্থিত। সুগ্‌গন কোনও রকমে একখানা খেয়াল ও তেরানা সেরে নিয়েই পর পর তিনখানি দাদ্‌রা গাইলেন। দাদ্‌রার এমন কিছু বিশিষ্ট গড়ন আর কারিগরী আছে, যা না হ'লে দাদ্‌রা বলা চলে না। কেবল ছমাত্রার ছন্দ আর ছোলা দিয়ে গান খালাস করলেই দাদ্‌রা হয় না,—তাঁর গান শুনে বুঝতে পারলাম। সভাশুদ্ধ লোক তারিফ করল, মৌজ্‌দিন বাদে। সুগ্‌গন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন পান জরদা সেবনের ছলে। এমন সময়ে মৌজ্‌দিনের একখানা দাদ্‌রা হ'ক বলে রব উঠল। মাল্‌কা একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সকলের মতে সায় দিতে হ'ল। মাত্র হারমোনিয়মের সঙ্গতেই মৌজ্‌দিন গান ধরলেন। কিন্তু আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম তাঁর অশিষ্টতা দেখে। সুগ্‌গন পূর্বে "নদীয়া নারে" গানটি করেছেন; মৌজ্‌দিন সেই গানটিই ধরলেন; শুধু তাই নয়, সেই গানের উপর চারগুণ রং চড়িয়ে দিয়ে। কোথায় ভেসে গেল বেচারী সুগ্‌গনের "নদীয়ার কিনারা।" তিনি অপমানে রাগ করে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে বস্‌লেন; মাল্‌কা প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। আসর নিবে গেল।

পরদিন বাবুজীর সামনে ও মৌজ্‌দিনের সাক্ষাতেই মাল্‌কা দারুণ অভিযোগ

করলেন। মাল্‌কার ইচ্ছা, মৌজ্‌দিন তার অতিথি সুগ্‌গনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মৌজ্‌দিন বলে বসল—"জান্‌ থাকতে ত নয়।" শেষবেশ, মৌজ্‌দিন মাল্‌কার নিকটেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে বল্‌ল, "বহিন্‌, তোমার প্রাণে চোট্‌ লাগবে, তা কি আমি জানি? সত্য বলছি, ঐ গানটি শুনে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, না গেয়ে থাকতে পারলাম না।" আমরা ধরে নিলাম কথাটি সত্য, কিন্তু পুরা সত্য নয়; মৌজ্‌দিন বিজাতীয় আক্রোশের বশেই ঐ রকম অশিষ্টটা করেছে, এই হ'ল আমাদের ধারণা। আমি বাবুজীর কাছে পরে অনুযোগ করে বলেছিলাম যে, তিনি ইচ্ছা করলেই ত মৌজ্‌দিনকে বারণ করতে পারতেন। তার উত্তরে বাবুজী একটি সাঙ্‌ঘাতিক কথা বলেছিলেন। বললেন, "ওস্তাদ্‌ আমাকে বলে ছিলেন, খবরদার, মৌজ্‌দিন গান করতে চাইলে ওকে নিষেধ করো না; নয় ত সে পাগল হয়ে যাবে, রহমৎ খাঁর মত। সে কারণে, আমি কখনও ওকে গান করতে নিষেধ করিনি।" অশিষ্টতা হয় হ'ক—এই হ'ল বাবুজীর কথা।

ঐ রহমৎ খাঁ ও মৌজ্‌দিনের প্রসঙ্গে বাবুজী একটি বৃত্তান্ত বলেছিলেন, যার মধ্যে আছে কলাবিৎ শিল্পীর হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

শ্যামলালজীর কথায়—রহমৎ খাঁ ছিলেন নামজাদা খেয়ালী ও তানাইয়াৎ কলাবিদ্‌, যাঁর মত অদ্‌ভুত হলক্‌তান এ যুগে আর কেউ দিতে পারেন নি। তাঁর দোষ ছিল মাথায়; মাঝে মাঝে পাগলের মত হয়ে যেতেন। বারাণসীতে ভাইয়াসাহেব, মৌজ্‌দিন ও আমরা থাকতে থাকতে মৌজ্‌দিনের খ্যাতি ছেয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। হঠাৎ রহমৎ খাঁ এসে হাজির গোয়ালিয়র থেকে। ওস্তাদ তাকে অত্যন্ত খাতির করে বসতে বললেন। তাঁর জন্য পান তামাক ও বিশিষ্ট খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

রহমৎ খাঁ ওস্তাদকে বললেন, "ভাইয়াজী, মৌজ্‌দিন নামে একটি ছোক-ড়ার বড় সুখ্যাতি শুনেছি। তার গান শুনতে বেরিয়েছি; শুনলাম, সে তোমার সঙ্গেই থাকে। তাকে দেখাও, তার গান শুনব।" ওস্তাদ বললেন, "আচ্ছা, তার জন্য চিন্তা কি, সে এখানেই থাকে। আপাততঃ আপনি কিছু সেবা করুন, বিশ্রাম করুন, পরে গান হবে।" রহমৎ খাঁ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "না ভাইয়া, দেরী করো না; আমি এখনই শুনব, না শুনে যাব না।"

ওস্তাদ কি করেন, অগত্যা মোজ্‌দিনকে ডেকে বললেন, "বেটা! এঁকে আদাব করো। হদ্দু-হস্‌সু খাঁর ঘরের সেরা গাইয়ে, হিন্দুস্থানের গৌরব এই রহমৎ খাঁ সাহেব। ইনি তোমার গান শুনবেন; হুঁসিয়ার হয়ে গান করবে এঁর সামনে।" মোজ্‌দিন আদাব জানাল। পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি আসর বিছান হল; তম্বুরা এল, তবলার ঘোড়ি এল।

মোজ্‌দিন রাগ-রাগিণীর কালাকালের ধার ধারত না। দিনের বেলাই ধরে দিল মালকোষের একখানি মামুলী আস্থায়ী; অবশ্য তাঁর গানের তোড়ে সেটা আর মামুলী থাকলো না। রহমৎ খাঁ, মোজ্‌দিনের গলা ও গান শুনে মহা খুশী। খুব 'সাবাশ্‌' করতে লাগলেন। পরেই বলে উঠলেন, "বেটা! একখানা ভৈরবী ত শোনাও।"

মোজ্‌দিন ধরে দিল—"বাজুবন্দ খুল্ খুল্ যায়।" বুঝতেই পারছ, একে ভৈরবী, তায় মোজ্‌দিন। ওস্তাদ নিয়েছিলেন হারমোনিয়ম। গান চলতে চলতে ওস্তাদ চকিতে তার মধ্যে পুরিয়ার রং দেখিয়ে দিলেন। আর যাবে কোথা! মোজ্‌দিন তার অনবদ্য গায়কি দিয়ে পুরিয়া ও অন্য রাগের বাহার আরম্ভ করে দিল।

গান শেষ হবার আগেই রহমৎ খাঁ তারিফ করতে আরম্ভ করলেন। এ রকম ব্যাপার তাঁর পক্ষে একেবারেই নূতন ছিল। যাই হ'ক, গান থেমে গেল, কিন্তু তারিফ থামে না! ভাইয়া সাহেব ভাবগতিক দেখে তাঁকে হাতে ধরে চলে গেলেন ছাদে, খোলা হাওয়ায়। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁরা ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমরা দেখি, রহমৎ খাঁ সাহেবের ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। সে বড় করুণ দৃশ্য। তিনি সাশ্রুনয়নে ভগবান্‌কে ডেকে বলছেন, "খোদা! আমাকে মোজ্‌দিনের মত তাসির প্রভাবচারী গুণ দিলে না কেন?" আবার কখনও বা ওস্তাদের দিকে কাতর দৃষ্টি করে বলছেন, "বল ভাইয়া বল! আমি যদি এখন থেকে গলা সাধি, আমি কি মোজ্‌দিনের মত গাইতে পারব না?" ওস্তাদ তাঁকে কত করে বুঝালেন; বললেন, "খাঁ সাহেব! আপনি হলেন সঙ্গীতের বুজুর্‌গ্‌ লোক; আপনি এ সব কি বলছেন! আপনার সঙ্গে ওর কথা! শের-এর সঙ্গে কুত্তার তুলনা! বরং ওই খোদার কাছে প্রার্থনা করবে আপনার গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যে।" কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিন চার দিন রহমৎ খাঁ ছিলেন; তাঁর কারণে আমরাও পাগল হওয়ার উপক্রম।

তাঁর প্রার্থনা ও কাতর উক্তি বন্ধ হয় না। ভাইয়া সাহেব মৌজ্‌দিনকে আলাদা করে ডেকে বললেন, "বেটা! ওর পা জড়িয়ে বলো, তুমি ওর গান শুনতে চাও। এবং তিনি যদি বাস্তবিকই গান ধরেন, তা হ'লে হরদম্ তারিফ করতে থাকবে।"

মৌজ্‌দিন রহমৎ খাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে গান করতে অনুরোধ করল। খুবই আশ্চর্যের কথা, রাজা-রাজড়াও যাঁকে অনুরোধ করে গান করাতে পারত না, সেই রহমৎ খাঁ মৌজ্‌দিনের কথায় তখনই বিনা সঙ্গতে গান ধরে দিলেন। উপক্রমণিকাতেই এমন একটি হলক তান দিয়ে তোড়ী ধরলেন, মনে হল, দুয়ার জানলা দুলছে! মৌজ্‌দিন সে রকম তান আগে শোনেনি। সে স্বভাবেই উচ্চৈঃস্বরে তারিফ করে উঠল। আমরাও তাতে সাধ্যমত যোগ দিলাম। ভাইয়া সাহেব ত পঞ্চমুখ। রহমৎ খাঁ আমাদের সকলের তারিফ শুনে গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। পরেই ছেলেমানুষের মত মৌজ্‌দিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি আমি ভাল গান করি? তোমার চেয়েও ভাল গান করি?" মৌজ্‌দিন বার বার তাঁর হাঁটু ছুয়ে খোদার নামে কসম্ খেয়ে বলল, "ওস্তাদ! আমি জিন্‌দগিভর চেষ্টা করলেও ত আপনার গলার কাজ টাকায় এক দামড়ি করে উঠতে পারব না।" শুনেই রহমৎ খাঁ সাহেবের মুখ যেন আত্মপ্রসাদে ভরে গেল; মৌজ্‌দিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া পাড়তে লাগলেন। এবং আপন মনেই বলতে লাগলেন, "ঠিক ঠিক! আমিই ভাল গান করি।" তার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "ভাইয়া, আমি এখন আসি।" এবং তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম, ওস্তাদ ঐ কৌশলটি না করলে মর্মাহত রহমৎ খাঁ সাহেবের মনে আনন্দ ফিরিয়ে আনা যেত না। কলাবিদ্ গুণীই জানে কলাবিৎ শিল্পীর সুখ-দুঃখের রহস্য; আর কেউ জানে না।

বাবুজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, মৌজ্‌দিনের পাগড়ী ও সুর্‌মা বাতিকের কথা। তার উত্তরে বলেছিলেন, ওটাও একটা পাগল বই আর কিছু নয়। কাশীতে ডাল্‌কামণ্ডির গলির মধ্যে গোলমালের সময়ে ওর মাথায় চোট্ লেগেছিল। ও তখন টুপী পরত। ছুটে এল আমাদের কাছে। মাত্র ঠাট্টা করে ওস্তাদ বলেছিলেন—মাথায় পাগড়ী থাকলে দুর্ভোগটি হ'ত না। সেই দিন থেকে ওর বাতিক আরম্ভ হ'ল। চন্দন ওকে পাগড়ী বাঁধা শিখিয়ে দিয়েছিল; চন্দনকে ভারি খাতির করত তার জন্যে।"

বাবুজী বললেন, "সুর্‌মার কথা এখন বলব না। তুমি ওকে আজ সকলের সামনে জিজ্ঞাসা করো, খাঁ সাহেব, তোমার গানের থেকেও ভাল গান শুনেছ কি না। তার পর বলব।"

সেই দিনই সন্ধ্যার বৈঠকে মৌজ্‌দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খাঁ সাহেব! আপনার চেয়েও বড় গুণী আপনি দেখেছেন কি না, সত্য করে বলুন। আমরা ত জানি, আপনার উপরে আর কেউ নেই।" প্রশ্ন শুনেই মৌজ্‌দিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবুজী, তন্নুলালজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "বাবুজী! জগ্‌দীপ, জগ্‌দীপ! আর কেউ নয়। আহা, হা, কি গানই করত! বাবুজীই বলুন, আমি ঠিক বলেছি কি না।"

জগ্‌দীপের প্রসঙ্গ ওঠে। বাবুজী ও তন্নুলালজীর কথার সারাংশ উদ্ধার করে দিলাম।

জগ্‌দীপ সহায়, মৌজ্‌দিনের থেকে কিছু বড়। জোড়া ভ্রূ, বড় বড় আকর্ণ-বিস্তৃত দু'টি চোখ, গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, মধুর কণ্ঠ ও উন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত-পটুত্বই ছিল তার প্রতিষ্ঠার কারণ। ভাইয়াসাহেব ও মৌজ্‌দিনের সঙ্গে দুলীচাঁদজীর সংস্রবের পূর্বে দুলীচাঁদজীই ছিলেন জগ্‌দীপের পৃষ্ঠপোষক ও পালন-কর্তা। জগ্‌দীপের যশোলাভ ছিল না। সে ছিল অতি বিনয়ী; দঙ্গল বা রেষারেষী বুঝতে পারলেই সরে যেত সেখান থেকে।

ভাইয়া সাহেব ও শ্যামলালজী যখন মৌজ্‌দিনকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় দুলীচাঁদের বাড়ীতে প্রথম মাইফেল করলেন, তখন একই আসরে হয়েছিল জগ্‌দীপ ও মৌজ্‌দিনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জগ্‌দীপের মুখের নায়কী বিলাস-বিভ্রম এবং ভাবাবেগপূর্ণ গায়কী মৌজ্‌দিনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে দিয়েছিল। সেই মাত্র একদিন হয়েছিল মৌজ্‌দিনের আত্মাবমাননা; তার গান সে দিন জমেনি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ভাইয়া সাহেব ও বাবুজী। এঁরা জগ্‌দীপের অনুকরণে নায়কী ও গায়কী দিয়ে মৌজ্‌দিনকে প্রস্তুত করে দিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মাইফেলে জগ্‌দীপ ও মৌজ্‌দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখা গেল, মৌজ্‌দিন জগ্‌দীপকে ছাড়িয়ে উঠেছেন—তাঁরই অনুকরণ করে।

জগ্‌দীপ মলিনমুখে দুলীচাঁদের আসর থেকে বিদায় নিলেন, এবং কলিকাতা ছেড়ে চলে গেলেন নেপালে তাঁর আত্মীয়ের কাছে। সেখান থেকে জগ্‌দীপ ব্যথিত হৃদয়ের অভিমানে ভরা একখানি চিঠি লিখেছিলেন শ্যাম-

লালজীকে ; লিখেছিলেন, "আপনারা আমাকে যে স্নেহ আদর, করতেন, তা আমি ভুলিনি। কিন্তু মৌজ্‌দিনের যশের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না। এক কলিকাতায় জগ্‌দীপ ও মৌজ্‌দিন থাকতে পারে না। সে কারণেই আপনাদের মায়া কাটিয়ে এলাম।" বাবুজী আক্ষেপ করে বলতেন, তিনি যদি জ্ঞাতসারে কোনও পাপ করে থাকেন, তবে জগ্‌দীপের মনে কষ্ট দেওয়াই সেই একমাত্র পাপ। এই প্রায়শ্চিত্ত করতেন মাঝে মাঝে এক নিঃশ্বাসে মৌজ্‌দিন ও জগ্‌দীপের স্মরণ করে ; চোখের জলের দু'এক বিন্দু দিয়ে ধোয়া ঐ দু'টি নাম উচ্চারণ করে।

মধ্যে থেকে মৌজ্‌দিনের মনে একটি অলোপনীয় প্রভাব রেখে গেল ঐ জগ্‌দীপ। সে একদিন বাবুজীকে বলে, "ঐ রকম চোখ, ঐ ভ্রূ, যদি ভগবান্‌ আমাকে দিতেন, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই জগ্‌দীপের চেয়েও বড় হ'তে পারতাম। কি গানই করত জগ্‌দীপ! বাবুজী! ও রকম গান ত আর শুনলাম না। আচ্ছা বাবুজী, ওরকম চোখ, ভ্রূবিলাস নকল করা যায় না?"

বাবুজী আর কি বলবেন! বললেন, "তুমি চোখে টেনে টেনে সুর্‌মা লাগাতে আরম্ভ কর। তা হলেই চোখ মুখের সুরত্‌ খুলে যাবে। ওস্তাদের কাছে মুখবিলাস শিখে নিতে পারো না?" সেই থেকে মৌজ্‌দিনের সুর্‌মা বাতিক আরম্ভ হ'ল। গণপত রাও সাহেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলেই তিনি তাঁর সামনে হাত-জোড় করে গরুড়াসনে বসতেন। এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে আগে জিজ্ঞাসা করতেন ওস্তাদের মেজাজ্‌ ও তবিয়তের কথা, পরে জিজ্ঞাসা করতেন এ-গানের সে-গানের মুখবিলাসের কথা। শ্যামলালজী তাঁকে এরকম নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, গণপত রাও সাহেবের মেজাজ্‌ বা তবিয়তের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না, যা আমি নিজে দেখেছি। হোরী-ঠুমরীর কথা বাদ দেওয়া যাক্‌, ধ্রুপদ-খেয়াল গানেও যে বিশিষ্ট রকমের মুখবিলাস অর্থাৎ চোখ মুখ ও কটাক্ষের সমুচিত ভাবভঙ্গী প্রয়োজন, মাটির পুতুল বা ইজিপ্‌সিয়ন মমীর মত মুখ করে গান গাইলে নায়কীর ও গায়কীর শোভা নষ্ট হয়ে যায়—এ ব্যাপার জেনেছিলাম একমাত্র শ্যামলালজীর সংস্পর্শে এসে। চন্দন চোবেজী খইনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে মৌজ্‌-দিনের ও ভাইয়াজীর কাহিনী বর্ণনার প্রসঙ্গে বলতেন, তিনি নিজে কিরূপ ও কতখানি তাঁদের কাছে ঋণী। তার মধ্যে মস্ত কথা ছিল গানের 'ভাও' অর্থাৎ ভাব এবং ভাবের যোগ্য মুখবিলাস।

রহমৎ খাঁ, মৌজ্‌দিন ও জগ্‌দীপের কথা মনে পড়লেই ভাবি, মানুষের বিশেষ করে শিল্পী মানুষের সুখ-দুঃখের আন্তরিক সূত্রগুলি কত গূঢ় ও বিচিত্র! রহমৎ খাঁ কাঁদেন মৌজ্‌দিনের দিকে তাকিয়ে, মৌজ্‌দিন হায় হায় করে জগ্‌দীপের জন্য। না জানি, কোন্ অজ্ঞাতনামা গুণীর জন্য গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গিয়েছেন জগ্‌দীপ। ভগবান্ মানুষের বুকের অস্থি-পঞ্জরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটিকে রেখেছেন সুরক্ষিত করে; তার মর্মে সন্ধান করার মত তীরও সৃষ্টি করেছেন অজস্র ও বিচিত্র; দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্য রেখেছেন কেবল একটি শ্বাসনালী, এবং সুখ-দুঃখের উৎসটি রেখেছেন চোখের কোণে অতি সঙ্গোপনে। বৃদ্ধ হনুমান্‌দাসজী ঠিকই বলেছিলেন—এসব ব্যাপারের ঠিকানা করে উঠতে পারা যায় না।

মৌজ্‌দিনের জীবনাবশেষ মুহূর্তের প্রসঙ্গ আর করব না; আমার স্মৃতিতে হয় ত কাদামাটিই বেশী উঠবে। তবে অন্য একজন বিশিষ্ট গুণী তাঁর স্মৃতিতে কিছু মুক্তা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রসঙ্গ হলেই মুক্তাগুলি উপহার দিতেন। সেই মুক্তার কথাই বলি।

ইং ১৯২৯ সালে একদিন বারাণসীর ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে মোতি বাঈজীর অট্টালিকার দ্বিতল গৃহে ভৈরবীর মাইফেল সবে শেষ হয়েছে। মোতি নিজে গান করেছিলেন "বাজুবন্দ খুল্ খুল্ যায়"। তাঁর সুরের রেশটি নিয়ে গিয়েছিল আমাকে স্মৃতির অতলে, যেখানে মৌজ্‌দিনই ছিল গোপনচারী হয়ে। মৌজ্‌দিনের কথা উঠ্‌ল অবশ্যম্ভাবীরূপে; কারণ, মোতি বাঈজীর মত মৌজ্‌দিনের ভক্ত আর কেউ ছিল না। মোতির চোখ ভার হয়ে এল; তিনি অছিলা করে উঠে গেলেন পূর্বদিকের জানালার কাছে এবং কোনও রকমে চোখের কোণ মুছতে মুছতে বাইরে দূরে তাকিয়ে রইলেন। পর-ক্ষণেই কি ভেবে আমাকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন জানালার ধারে আসতে। দেখি, তাঁর মুখ প্রসন্ন ও নয়ন উজ্জ্বল হয়ে এসেছে। আমি উঠে গেলাম তাঁর পাশে। তিনি অদূরে একটি জংলা জায়গার দিকে আঙ্গুল দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে গদ্‌গদকণ্ঠে কোনও রকমে আমাকে জানিয়ে দিলেন, "ঐ হ'ল ফাৎমান্ কবরভূমি; আর ঐ যে ঝোপটি দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচে কবরের মধ্যে রয়েছেন মৌজ্‌দিন" বলে একটু থেমেই বললেন, "হমারা মৌজ্‌দিন।" দেখি, তাঁর দুচোখ দিয়ে কয়েকটি মুক্তাবিন্দু উৎসারিত হয়ে নেমে এসেছে।

স্মৃতির অতলে ফৈয়াজ্ খাঁ

সঙ্গীত-প্রতিভার স্ম কত বিচিত্র পরিচয়ের মুহূর্তগুলি জেগে ওঠে আমার মনে। স্মৃতির নিকুঞ্জের প্রবেশ-পথেই আত্মহারা হয়ে যাই বিচিত্র কূজনের সম্মোহে। ঐতিহাসিক বন্ধনী দিয়ে মনকে সংযত করতে চেষ্টা করি, বাধ্য হয়ে। স্মৃতির ইতিহাস আমাকে বলে—কালে খাঁ সাহেবের পরে ফৈয়াজ্ খাঁ সা কিন্তু শ্রুতির অনুভব সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, কখনও বা অবলোপ সাধন করে। অনুভব আমাকে বলে—বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে বিশিষ্ট মাধুর্যের স্বাদই বড় কথা; সেই সহজ সরল শ্রুতির পথই অনুসরণ করো, এতে দোষ নেই।

অনুভবের সঙ্কেতই গ্রহণ করেছি; বিশেষ করে ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের ব্যক্তিগত পরিচয়ই আভাস দিতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসকে একেবারে উপেক্ষা করতেও পারিনে। মহীশূরের মহারাজা এই গুণীকে "আফ্তাব-এ-মৌসিকী" অর্থাৎ "সঙ্গীতের ভাস্কর" উপাধি দিয়ে ভূষিত করার পর থেকে (ইং ১৯১১ সাল? ১৯১৩ সাল?) ফৈয়াজ্ নাম ভারতবিখ্যাত হয়েছিল, দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ বাদে। বহুকাল পরে, ইংরাজি ১৯৩৪ সাল থেকে ঐ নাম বাংলার সঙ্গীতসেবীদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ নগরে (ইং ১৯২৬ সাল?) সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্যে ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব আর রামপুরের মুস্তাক্ হুসেন খাঁ সাহেব (ভগবান্ এঁকে দীর্ঘজীবী করুন) এঁরা দুজন সমান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু তখনও বাংলাদেশে এঁর শুভাগমন হয়নি। যৌবনের ফৈয়াজ্কে আমরা প্রকাশ্য আসন গ্রহণ করতে দেখিনি; ১৯৩৪ সালে ফৈয়াজ্ খাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসর। আমরা দেখিনি; কিন্তু অন্যেরা দেখেছিল।

অবশ্য অস্তগামী সূর্যেরও মাহাত্ম্য স্মরণে জেগে ওঠে। সুরের গায়কী রাগের গায়কী বলতে কিছু মনে পড়লেই ফৈয়াজ্ খাঁর কথা মনে পড়ে। রাগ আলাপ করতে থেকে তিনি যখনই যে সুরে সমাহিত হয়েছেন, মনে হয়েছে, সেই সুরটিই যেন সেই রাগের চরম সুর। এবং সে কথা একমাত্র ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবেরই কথা। খেয়ালের অপূর্ব ভঙ্গির মধ্যে তিনি মাত্র

লীলাচ্ছলে যে ঠোক আর লড়ীর তানের বিচিত্র সিল্‌সিলা (শৃঙ্খল) দিয়ে রাগকে কবলিত করে নিয়ে আমাদের সামনে পরিবেশন করে গিয়েছেন, সে কথা ভুলতে পারিনে। কারণ, সে কথা ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেবেরই কথা; অন্যের নয়। মাইফেলের ফৈয়াজ্‌ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা।

তবুও আমার মন ও সকল কথার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। কারণ, সৌভাগ্যের বশেই যৌবনের ফৈয়াজ্‌কে দু'দিনের তরে সাক্ষাৎ করেছিলাম, কলিকাতায় ইং ১৯১৫ সালে। সেই ফৈয়াজ্‌ বৈঠকের ফৈয়াজ্‌। আর তার চেয়েও বড়ো কথা—তরুণ ফৈয়াজের একটি কীর্তিকাহিনী শুনেছিলাম তন্নুলালজীর মুখে। তরুণ ফৈয়াজ্‌ অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়সের একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই ফৈয়াজ্‌ হয় ত ইতিহাস সৃষ্টি করেন, কিন্তু অনুভবের সৃষ্টি করে রেখেছিল, শ্যামলালজী, তন্নুলালজী আর অন্ততঃ দু'জন গান্ধর্বিকার মনে। আমি এই ফৈয়াজের স্মরণেই ব্যাকুল হয়েছি সম্প্রতি।

বৈঠকের ফৈয়াজ্‌

মনে পড়ে যায় শ্যামলালজীর বৈঠকের একটি সন্ধ্যার বিচিত্র পরিবেশ; মনোরম, বিস্ময়কর মুহূর্তগুলি। বৈঠক ১০১ নং হ্যারিসন রোডে দোতলার ফরাশ-বিছানো ঘর। অনিবার্য বলেই মনে পড়ে, মৌজুদ্দিন তখন কলিকাতায় শ্যামলালজীর আশ্রয়ে রয়েছেন।

মৌজুদ্দিনের গানের আশায় ননী ও আমি সন্ধ্যা হতে না হতেই জমেছি। গান কখন্‌ হবে, কিছু ঠিক নেই। অন্তরঙ্গদল রাত্রি আটটার মধ্যেই খুঁটি গেড়ে বসতেন। গুরুজীর বৈঠক যেন একটা "হট্‌হাউস"; গুণী আর গুণমুগ্ধ লোকেরা এসে তাপ সঞ্চয় করে নিতেন নানারকমের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, নানা রকমের জল্পনা কল্পনা করে।

মাত্র চিরঞ্জীব বসে আছে হারমোনিয়ম নিয়ে; বশীর-মৌজুদ্দিনের সাড়া-শব্দ নেই। গুরুজী পূজাপাঠ সারতে অন্দরে গিয়েছেন। বৈঠক শূন্য পুরীর মত। চিরঞ্জীব বল্‌লে, "দেখছেন কি? চিড়িয়া উড়ে গিয়েছে, আজকের মত।" ব্যাখ্যা করে বল্‌ল—"আজ রাত্রের জন্য বড়বাজারের শেলী বাঈজীর বাড়ীতে মৌজুদ্দিন-বশীরের জল্‌সা; তারা সেখানে চলে গিয়েছে। আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে, তবে জানেন তো, বাবুজী যেখানে যান না আমরাও সেখানে যাইনে। আপনারা বসুন, মৌজ করুন! আমি ছুটি

পাই। অন্যেরা এলে বসিয়ে রাখবেন, বাবুজী না আসা পর্য্যন্ত।” বলে উঠে পড়ল; আর সেই ঘুরঘুরে চাকা-লাগান হারমোনিয়মটা গড়িয়ে দিল আমাদের সামনে। আমরা ভাবলাম, মৌজুদ্দিন না থাকতে মৌজ হবে কি?

ননী সম্পর্কে আমার খুড়তুত ভাই। ভাল নাম সুধাংশুরঞ্জন বাগচি; পরে এম-বি উপাধিধারী চিকিৎসক। কিন্তু এও বাহু।

আমরা দু’জনে সঙ্গীতসমুদ্রের কিনারা ধরে পাশাপাশি দু’খানি পানসিতে পাড়ি দিয়ে চলেছি; গুরুজনদের অনুকরণে পাল তুলে দিয়ে হাওয়া ধরতে শিখেছি। কিন্তু নজর আছে তীরের দিকে। অকূল জলধির দিগন্ত দেখা দেয় না; ঢেউ ধরতে খুব আনন্দ, কিন্তু ভয় হলেই পাল গুটিয়ে উপকূলের দিকে ভিড়িয়ে চলি। অকূলের আকর্ষণ আছে, একমাত্র উপকূলের ভরসায়।

হাব-ভাব চেহারায় ননী ছিল যথার্থই সৌখীন; ছিম-ছাম চুলের ডগা থেকে সেলিম-শু’র আগা পর্য্যন্ত। সুন্দর মানানসই চেহারা; বুক ছিল ভরাট চওড়া। তার হৃদয়ে ছিল দুর্জয় সাহস, চোখে অফুরন্ত আলো। সেকালের এণ্টালির ধ্রুপদী হরিবাবুর কণ্ঠের মত ছিল তার গম্ভীর মধুর স্বর; অথচ কখনও কণ্ঠের মার্জনা করেনি সে। নিখুঁত হাস্যরস দিয়ে উচ্ছল হয়ে উঠত তার বাগ্-বিন্যাস; স্বভাবেই ছিল তার অসাধারণ অভিনয়চাতুর্য। আমার বন্ধুদের মধ্যে তার মত সপ্রগল্ভ লোক আমি দেখিনি।

সে দিন সে তার পরিষ্কার হাত দু’খানি সন্তর্পণে বার করে নস্যের ডিবেটি খুলেছে। ডান হাতের দু’টি আঙ্গুল দিয়ে লেলিহা মুদ্রার (লে লিয়া নয় ত!) ভঙ্গীতে ছোট এক টিপ্ নস্য উঠিয়ে নিয়ে পাশের আলমারী-আয়নায় নিজের চেহারাটি দেখে নিল। এটা তার অভ্যাস; বেমানান হলে বলতাম বাতিক। বলল, “ওরে ভাই! শেলী তো আমাদের চেনা লোক। তাঁর ওখানে গিয়ে গান শুনলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় বুঝলাম না।” আমি নস্য তুলে নিয়ে বললাম, “তার জন্য নয় ভাই! আমাদের মৌজ্দিন তো বেলেল্লাগিরির মৌজ্দিন নয়। ওরকম মৌজ্দিনকে না দেখাই ভাল।” ননী ঘাড় নেড়ে বলল, “ঠিক বলেছ। আমাদের মৌজ্দিন দুস্রা মৌজ্দিন; বিলকুল, বে-নজীর!”

নেহাৎ কাজ নেই বলে হারমোনিয়মটা টেনে নিয়েছি, দেখি—সুরও গড়ায় কি না। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন আগ্রাওয়ালী মাল্কাজান বাঈজী। সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও এলেন। তাঁকে এর পূর্বে কখনও দেখিনি।

সমুচিত নমস্কার ও অভ্যর্থনা করে তাঁদেরকে তশ্‌রিফ রক্ষা করতে অনুরোধ করলাম আমরা। দু'জনের চেহারা দেখবার মত, সমাদর করবার মত ছিল। বৈঠকে যেন শ্রী ফিরে এল।

মাল্‌কা আমাদের গুরু-বহিন; খুবই পরিচিত ব্যক্তি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যম আকৃতির এই মহিলা স্বভাবে শান্ত সংযত মধুর; এমন কি, ঠুমরী-গজল গানের ভাবোচ্ছল মুহূর্তেও এঁর আচরণে অধীরতা বা আতিশয্য লক্ষ্য হ'ত না। মুখশ্রীর মধ্যে উদ্ভাসিত ছিল পরিপক্ক সৌন্দর্যের লাবণ্য। সূর্যদেব সে পর্যন্ত সময়ে এঁর জীবনকে পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ পরিক্রমণ করেও কি জানি কেন, সেই বিকশিত কমলের মত মুখমণ্ডলের শোভা-সম্ভ্রমের হানি করতে সাহস করেন নি। এর কারণ আলোচনা করতে গিয়ে ননী ও আমার মধ্যে মতভেদ দেখা দিত। ননীর ধারণা, এঁর অপাঙ্গভঙ্গীতে তির্যগ্‌দৃষ্টির একটি দু'ধারী তলোয়ার খেলা করে; অর্থাৎ যাকে লক্ষ্মী-টেরা বলে, তারই ইতস্ততঃ সঞ্চালনকে সূর্যদেব ভয় করতেন বলেই সৌর বৎসরের প্রভাব ফলিত হয়নি। আমি বলতাম—তা নয়; এঁর অধরপ্রান্তে ভ্রমরের মত কুচকুচে একটি কালো তিল নিত্যনিয়ত বিরাজ করেছে, সদর্পে; সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সমাদর দেখেই সূর্যদেব ঈর্ষায় ম্লান হয়ে প্রতিদিন অস্তমিত হয়ে যেতেন। নিজের ব্যর্থতায় যে মলিন, সে কি অন্যকে খর্ব করতে পারে!

যাই হ'ক, সবচেয়ে বড়ো কথা ছিল, শ্যামলালজীর মত শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুরুর প্রচ্ছন্ন স্নেহাশীর্বাদের পূত ধারাবর্ষণ এঁর জীবনের উপর। এই কোমলস্বভাব বিনয়নম্র কলানিপুণ স্ত্রীচরিত্র ঐ সুকৃতির সদ্‌ব্যবহার করে গিয়েছেন, চোখের সুরমার মতই সেই রক্ষাকবচটি সযতনে ধারণ করে শিল্পজীবন যাপন করে গিয়েছেন যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এঁকে এবং এঁর মত আরও কয়েকজন বিদগ্ধা মহিলাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করতাম, মাত্র প্রতিভার কারণে নয়, সামাজিক জীবনের সুশীলতা ও পরিপূর্ণতারও কারণে। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনে ওরকম রক্ষাকবচের প্রভাব না থাকলে উড়ো বিপদাপদের জঞ্জালে স্খলিত হয় জীবনের ব্রত, অকালে ক্ষয়-মলিন হয়ে যায় প্রতিভার দ্যোতনা। সুদীর্ঘকাল অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর ধরে আমরা আগ্রাওয়ালীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করে এসেছি; জীবনে আবিলতা বা প্রতিভার দৈন্য আবির্ভূত হতে দেখিনি। শ্যামলালজী বলতেন, "দেখ, এঁরা সব গন্ধর্ববিগ্রহ। এঁদের

খাতির করে চলবে। তবেই বুঝবে এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য আর সার্থকতা।” তখন অবশ্য গুরুজীর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি ; কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে চলেছিলাম। বোধ হয় সেই কারণেই পরে অর্থটিও উদ্ধার করতে পেরেছিলাম ‘সঙ্গীতরত্নাকর’ গ্রন্থ পড়ে।

মাল্‌কার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি এলেন, তাঁর চেহারার পরিপাট্য দেখে ননী নস্য নিতে নিতে মৃদুস্বরে বলল, “আচ্ছা চেহারাখানা বাগিয়েছে বটে!” বলেই মাল্‌কার সঙ্গে খুব শান্ত-শিষ্ট হয়ে কথা আরম্ভ করে দিল।

আমি ভাবছিলাম ইনি কে? অর্থাৎ কে হতে পারেন। এঁর মাথায় ছিল লাল মখ্‌মলের জরীদার টুপী, সুন্দর আন্দাজে ডান দিকে হেলান ; দেখে মনে হচ্ছিল, ইনি বোধ হয় লক্ষ্ণৌ-দিল্লী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত লোক, অবশ্যই মুসলমান ; সম্ভবত আগ্রাওয়ালীর আত্মীয়। এঁর চৌকশ মুখমণ্ডলে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি ; তার প্রথম বাঁধটি ছিল ওষ্ঠাধরের সংযত রেখার মধ্যে ; দ্বিতীয়টি ছিল সুঠাম মসৃণ চিবুকের নীচে একটি গাম্ভীর্যের রেখার মধ্যে। চোখে ছিল মুকুলিত দৃষ্টি ; দৃষ্টির মধ্যে ছিল ভাবগম্ভীর পরিচয়। আন্তরিক চটুলতা যদি কিছুমাত্র প্রকাশ হয়ে থাকে তো সেটা সঞ্চিত হয়েছিল গোঁফের আগায়। পরিধানে ফিকে সবুজ রংএর পাতলা সার্জের লংকোট ; বুকের একটি বোতাম থেকে প্রতিপদের চাঁদের মত ঘড়ির চেন চলে গিয়েছে বুক পকেটের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে। সেই পকেটের উপর দেখা দিয়েছিল হল্‌দে রংএর রুমালের কুসুমোচ্ছ্বাস। আর লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর ডান হাতের একটিমাত্র আঙ্গুলে পাথর-বসানো একটিমাত্র আংটি। তখনকার দিনে পশ্চিমা সৌখীন পুরুষদের পক্ষে এ বিষয়ে বাহুল্যই ছিল নিয়ম ; মনে হত যেন আঙ্গুলগুলি ছোটখাট মণিহারী দোকান। তাই মনে মনে প্রশংসা করছিলাম এঁর সৌষ্ঠব সামঞ্জস্যের ভাব, কি রূপে, কি বর্ণসজ্জায়।

সেই শিষ্ট সুন্দর ছবি এখনও স্মরণে জেগে রয়েছে, বিশেষ করে এজন্য যে, মাল্‌কার পাশে সেই মূর্তিটি বড়ই ভাল লেগেছিল তখন। মাত্র দেখতে ভাল লাগাটা তরুণ বয়সের পক্ষে মস্ত উপভোগ।

মাল্‌কা ও ননীর মধ্যে কথাবার্তা চলছিল ; আমি চুপ করে বসেছিলাম। শ্যামলালজীর বৈঠকের একটা নিয়ম ছিল—প্রধান ব্যক্তি, বিশেষ করে কোনও বাঈজী কথোপকথন করতে থাকলে নিকটবর্তী অন্যদের পক্ষে পৃথক্ কথাবার্তা

চালান অশিষ্টতা মনে করা হত। ভদ্রলোকটি সমাহিত হয়ে বসে; আমিও নির্বাক্, কিন্তু মন উস্‌খুস করছে।

বোধ করি দু'মিনিটও যায়নি, দেখি, ননী বার-দুই "মাশে আল্লা" মুখপাত করে মাল্‌কার প্রশংসা করছে; ঠোঁটের পাশে সেই তিলের কথা তুলে সকলঙ্ক চন্দ্রের উপমা ফলিয়ে বেশ রং জমিয়ে নিয়ে এসেছে। "মাশে আল্লা" বচন দিয়ে গুণকথনের পুট দেওয়ার অর্থ ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই পার্থিব গুণকে মানুষের কু-নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখা। মাল্‌কা সতর্ক হয়ে মুখ টিপে হাসি চেপে ননীর কথা শুনে যাচ্ছিলেন; অন্য উপায় নেই বলে। তিনি আমাদের দু'জনকে যেমন ভাল করে জানতেন, ননীকে তেমনি ভাল করে চিনতেন। এক কথায় আকাশে তুলে দিয়ে আন্‌কথায় পাহাড়ের তলে ফেলে দিতে ননীর মত আর কেউ ছিল না। ভদ্রলোকটিও দেখি, কথার সুর ও ছেড়্‌ছাড় বেশ উপভোগ করছেন; তাঁর গোঁফের আগা দু'টি চঞ্চল হয়েছে, মুখের ভাবও যেন হাল্‌কা হয়েছে।

ননী একটা উল্‌টা হাওয়া আমদানী করে কথার সুর বদলে দিল।

প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ খেদ-অভিমানের খাদের সুরে ননী বলল, "ভগবান্ আপনাকে অনেক গুণ দিয়ে উপর থেকে দেখছেন, আপনি কিছু খয়রাত-জকাত্ করেন কি না। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে, আপনার হৃদয় পাথর দিয়ে গড়া; নইলে লোহা হলে তাপে গলে যেত;" বলেই ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার গোঁফ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি একজন সমঝ্‌দার লোক; বলুন তো আমি ঠিক বলেছি কি না।"

গোঁফের মধ্যে সমঝ্‌দারি লুকিয়ে আছে কি না, অথবা মাল্‌কার হৃদয়ের স্বরূপটি তিনি অবগত আছেন কি না, অথবা খয়রাত ও জকাতের মধ্যে পার্থক্যই বা কি ধরণের—এ সব বিষয়ে ব্যাখ্যা করে ওরকম প্রহেলিকার সরল উত্তর দিতে গেলে হয় রসভঙ্গ; কিন্তু উত্তর না দিলে হয় অরসিকতা। ভদ্রলোকটি যে চতুর ও সুরসিক, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকল না যখন দেখলাম, তিনি সুরে সুর মিলিয়ে ননীর কথা সমর্থন করে বললেন, "সে বিষয়ে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নেই! ইনি যদি বলেন তো কসম্ দিতেও প্রস্তুত আছি।" দেখে আশ্বস্ত হলাম, শুধু গোঁফের প্রান্তে নয়, সেই সমগ্র গম্ভীর মুখশ্রীর উপরেও এক ঝলক ছল-কৌতুক দেখা দিয়ে গেল।

মাল্কা ছিলেন সরল প্রকৃতির লোক; ঠাট্টা-তামাসার আবেদনকে তিনি সত্যকারের অভিযোগ মনে করে ত্রস্ত হয়ে উঠতেন, ক্ষণিকের জন্য। তার উপরে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। ঐ যে ভগবানের নাম আর খয়রাত-জকাতের উল্লেখ, এতেই মাল্কা ত্রস্ত হয়ে বললেন, "কেন ডাক্টরবাবু! আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে, আপনি বদ্নামী করছেন?" বলে বিনয়-বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের কাছেও নীরবে প্রশ্নটি জানালেন।

ননী তার উত্তরে বল্ল, "তাহলে খোলসা করেই বলি," বলে ভদ্র-লোকটিকেই যেন মধ্যস্থ ঠিক করে চাপা অভিমানের সুরে আরম্ভ করল, "জনাব! আপনিই বিচার করুন। এই সে দিন ইনি মৌজ্দিনের জল্সা দিলেন নিজের বাড়িতে। কিন্তু, জানি না, কেন ইনি আমার উপর বিরূপ হয়ে এই অভাগ্যকে স্মরণই করলেন না! কী আর বলব জনাব!" বলে ডান হাতখানি তুলে মাল্কাকে নির্দেশ করে ননীর কথার তোড় বয়ে যায়, "আমরা এঁরই নাজ্বরদার হয়ে আছি। হুকুম নয়, চোখের ইশারাও নয়, মাত্র একবার যদি ইয়াদ করেন তো আমাদের কলিজা ধড়্ফড় করতে থাকে, এই মনে করুন—পাখীর পায়ে আঠা লাগলে যেমন হয়। আপনার হাসি আসছে বটে, কিন্তু আমাদের কাছে এটা হাসির কথা নয়; জী হাঁ। যাক এসব কথা। আমি তো ঝগড়া-বাহানা করতে পারিনে;" বলে খুব যেন উদাস নয়নে উপরের দিকে তাকিয়ে ননী বলল, "পরমেশ্বর এঁকে এই মেজাজ্ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি আর কিছু চাইনে। মাত্র এই বলি, আমার শ্বাস যখন ছাতি থেকে ঠোঁটের আগায় উঠে আসবে, সেই অন্তিম সময়ে কেউ যেন এসে আমাকে বলে—মাল্কা ভালই আছেন, ভয় কি তোমার! আমার কান সেই কথাটি আমার হৃদয়ে পৌছিয়ে দিলে তবে যেন আমার আখেরী দম শেষ হয়ে যায়; আর কিছু নয়;" বলে মাঝারি রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ননী থেমে যায়।

কথার স্রোতে যখন পাখীর পায়ে আঠা লাগার তুলনা দেখা দিয়েছিল, সে সময়ে ভদ্রলোকটি হাসতে গিয়ে সামলে নিয়েছিলেন; কারণ, তিনি বিচারক। শেষের দিকে একটু বিস্মিতও হয়েছিলেন বলে মনে হল। হয় তো মনে করছিলেন, খাস্ বাঙলায় বাঙালী ছোকরার মুখেও যখন আশক্-মাশুকের রগড় শুনতে হল, তখন কপালে না জানি আর কি আছে।

মাল্‌কার মুখের ভাব বর্ণনায় কুলোয় না ; হর্ষ লজ্জা ও বিস্ময়ের কোন্ ভাবটি বেশি, কোন্‌টি কম, বুঝতে পারলাম না।

বাদীপক্ষের অর্থাৎ ননীর বক্তব্য শেষ হলে সামান্য অবকাশে ভদ্রলোকটি ননীর কথার খেই ধরে নিয়ে বললেন, "মাশে আল্লা। ডাক্তার সাব! পরমেশ্বর আপনারও দিল্ ওর জবানকে বাঁচিয়ে রাখুন। কারণ কি, আপনি এঁর যে নক্সা তুললেন, তার জবাব নেই। আপনি বেঁচে না থাকলে এঁর হৃদয়ের আজব খবর আর কে প্রচার করবে! বলুন তো দেখি।" তৎক্ষণাৎ ননী খুব কায়দা করে তোতাপাখীর মত মাথা নেড়ে সেলাম জানায় ; দু'হাতি সেলাম। বিচারক রসিক সুজন, সন্দেহ নেই।

অতিশয়োক্তি হোক বা মিথ্যা দোষারোপের জ্বলন্ত বর্ণনার জন্যই হোক, মাল্‌কা একটু লজ্জিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা ছিল সুশোভন, তার অন্তরালে ছিল আত্মপ্রসাদ, নিশ্চয়ই। তবুও দোষ মোচনের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "সে কি কথা বলছেন ডাক্তারবাবু! আপনি নাহক্ আমাকে লজ্জা দিলেন। খোদার কসম্, আমি তো এই পাঁচুবাবুকে দিয়েই আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠিয়েছিলাম। কেন? পাঁচুবাবু কি আপনাকে খবর দেননি?" বলে আমার দিকে সপ্রশ্ন নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন।

ব্যাপারটি পরিষ্কার করা উচিত। মাল্‌কার কথাই সত্য। তিনি আমার উপর ভার দিয়েছিলেন ননীকে নিমন্ত্রণ জানাতে ; আমিও কর্তব্য পালন করেছিলাম। শরীর অসুস্থ ছিল বলেই ননী সে মাইফেলে উপস্থিত হতে পারেনি। সম্প্রতি ননী এই সত্যকে একেবারে চেপে গিয়ে কলহের ভাণ আর দোষারোপের ভণিতা ফলিয়েছে। অবশ্য এ রকমের পরিবেশের মধ্যে ভাণ-ভণিতার মাহাত্মই বড়ো। সত্যের নীরস মহীরুহকে মিথ্যা অভিমানের কল্পলতিকা দিয়ে সাজিয়েও একটা আনন্দ আছে, যদি সাজটি হয় সুন্দর ; আর সার্থক হয় হাসি ও আমোদের পত্রপুষ্প দিয়ে। মিথ্যা কলহের কাঁটাও সেখানে থাকতে পারে, ক্ষণিকের জন্য মনের বেদনাও দেখা দিতে পারে ; দার্শনিকও বলে বসতে পারেন—এর আগাগোড়াই ভ্রম আর মায়া। কিন্তু আমরা অর্থাৎ অজ্ঞানীরা বলি, এ রকমের কলহ ভাল লাগে আমাদের। এর বেদনাই তো চাই আমরা। এ কাঁটা তো বিষমাখান নয়। এর স্পর্শের মধ্যে থাকে গোপন প্রীতির সুখ-প্রলেপ ; ক্ষত হলেও ক্ষতির ভয় নেই।

মাল্‌কা একটা মোকাবিলার চেষ্টা করলেও ননী দমে যাওয়ার পাত্র নয়। ননী আবার ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, "দেখলেন জনাব, এঁর আক্কেল আর ছলনা! আরে! এই পাঁচুবাবু হল রকীব্। আর সেই রকীবের মুখের পেয়ালায় আমাকে পিপাসা মিটাতে হবে! হায় রে অদৃষ্ট!" ননী বলতে চেয়েছে—সেবা ও ভালবাসায় প্রতিদ্বন্দ্বী এমন যে পরিকর, সেই হল রকীব্। ননী কপালে হাত দিয়ে মুখ নীচু করল।

এর উপর আর মোকদ্দমা চলে না। আমোদ আর পরিতোষের মধ্যে দেখি, ভদ্রলোকটির মুখে অপরিচয়ের সঙ্কোচ বা ভাবী পরিচয়ের সম্ভ্রম বলতে যা কিছু ছিল, সব ধুয়ে মুছে গিয়েছে প্রাণখোলা কথার ক্ষণিক কিন্তু অবিরল বর্ষণে।

একটু সংযত হয়ে ভদ্রলোকটি রায় দিলেন, "ডাক্তার সাহেবেরই জয় হল; মাল্‌কা বিবি হেরে গিয়েছেন;" বলে মাল্‌কার দিকে তাকালেন। মুখের হাসি চাপা পড়েছে, কিন্তু চোখে খেলছে তখনও।

মাল্‌কা বোধ হল আপিল করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল ননী, একটি গজলের প্রথম পদ আরম্ভ করে দিয়ে; নিমেষের মধ্যে সুর করে, চোখ-মুখ ঘুরিয়ে, হাত নেড়ে—

রকীব্‌সে যো উয়ো বোসো

কনার্ করতে হ্যায়।

জলা জলাকে হমে বেকরার্ করতে হাঁয়॥

ধারেই কাটুক বা ভারেই কাটুক, পদটি তখনকার দিনে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ছিল—সেরা শিল্পীদের কণ্ঠে ও গানে। ধারের দিক্‌টা অর্থাৎ যে দিক্ দিয়ে মাটির মানুষের মাটির মন কাটা পড়ে—সেই ধারের দিকে ভাবার্থ যথা—কোনও হতাশ প্রণয়ী ক্ষোভের সাম্প্রতিক চরম কারণ একটি উল্লেখ করে বলছেন—পরম্পরায় খবর পেলাম, তিনি আমার প্রেমাস্পদ, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করেছেন। আমাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে পরখ করে দেখছেন, আমি আমার করার্ অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি থেকে চ্যুত হই কি না। লক্ষণার অর্থ ধরে' কবির মনের ভাবটা এই,—যেন কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি যতই আমাকে দহন করুন, আমি তাঁকে ভুলব না। কিছুতেই বে-করার করতে না পেরে তিনি ঐ চরম সংবাদটি আমার গোচর করলেন।

আমিও জগৎকে জানাই যে, এতেও আমি প্রতিজ্ঞাচ্যুত হব না। কারণ, আমি মনে করিনে, তিনি আমার চেয়েও আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশি সুনজরে দেখেন বলেই তাকে চরিতার্থ করলেন। বরং মনে করি, মাত্র আমাকে জ্বালাবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাকে কৃতার্থ করেন। তাই যদি না হবে, তা হলে আমার কাছে ঐ খবরটি পাঠাতে এত আগ্রহ কেন, আর হেতুই বা কোথায়? তিনি আমাকে স্মরণ করেন নিশ্চয়ই; যদিও তাঁর রীতি খুবই বিচিত্র। তাঁর চরিত্র যে অদ্ভুত!

মানুষ মাটি দিয়ে গড়া, একথা ভেবে যখন মাটির মনও ঝুরঝুরে হয়ে ঝরে পড়তে থাকে, তখন ওরকম কথার ধার ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ভার থাকে। এই ভারের দিক্‌টা সূচনা করে কবি বলতে চান—তাঁকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে আমরা ভালবাসি, সেবাও করি। কিন্তু আমি কুঁড়ে ঘরে অভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আমার প্রতিবেশী সুখসমৃদ্ধিতে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে আছে। এ খবরটা আমার পক্ষে জ্বালাকর সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও আমি তাঁকে ভুলতে পারিনে। আমি জানি, তাঁর সোহাগের স্পর্শে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর ভোগ-সুখ উছ্‌লে উঠেছে। স্বীকার করি। কিন্তু তিনি ত ইচ্ছা করলেই আমাকে এ বিষয়ে অজ্ঞ করে রাখতে পারতেন। বেশী কথা কি, তিনি তো আমাকে দরিদ্র, অধিকন্তু অন্ধ ও বধির করেও রাখতে পারতেন। তিনি সে রকম করেন নি। তিনি ইচ্ছা করেন, আমি চোখে কানে ঐ আপাতমর্মান্তিক সংবাদ পাই। তা যদি হয়, তা হলে তিনিও আমাকে স্মরণ করেন নিশ্চয়। কেবল পরীক্ষা করে দেখতে চান, আমি তাঁকে ভুলিছি কি না। আর কি ভুলতে পারি!

এদিক্‌টাকে ভারের দিক্ বলছি এ কারণে যে, অর্থটি মনে লাগলে মাথা আপনিই নত হয়ে পড়ে।

ভীমপলশ্রী রাগের উপক্রমণিকা দিয়ে বাঁধা এই গজলটি শিখেছিলাম আমরা শ্যামলালজীর কাছে; এর গায়কীর কিছু বিশিষ্টতা আদায় করে-ছিলাম গোফুর খাঁ সাহেবের মুখ থেকে। গোফুর খাঁ ছিলেন গোয়ালিয়রে ইনায়েৎ হুসেন খাঁ খেয়ালিয়ার ঘরানার গাইয়ে। পরে গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই গোফুর খাঁ ঠুমরী ও গজলের গীত-রূপ এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যে, অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে হয়—তাঁর ঢং ছিল

নিরালা (নিজস্ব) ও মধুর। তিনি যখন মাঝে মাঝে শ্যামলালজীর বৈঠকে এসে জমতেন, আমাদের আফ্সোসের সীমা থাকত না এই ভেবে যে, অত্যাচার করে তিনি কণ্ঠের মাধুর্য নষ্ট করে ফেলেছেন।

যাই হোক, ননী একবার পদটি গান করে আমাকে ইশারা করল গাইতে। গানই শিখতাম আমরা; কিন্তু ভাগ্যে গাইয়ে হইনি। আর গুরুজীর তীর্থ ছিল অনাবিল আনন্দের মহাদ্রুম, যার ছায়ায় বসে গানবাজনা করতে কখনও ভয় বা কুণ্ঠা হয়নি। সোজাসুজি বলতে গেলে—ননী ও আমি ঐ পদটি গান করেছিলাম সুরে ও ছন্দে মনেরই আনন্দে। ননী গানের ভাঁজটি জাহির করল। আমি তার উপর লতাপাতা কেটে সুরের আল্পনা দিয়ে ছকটি পরিস্ফুট করলাম; এক একবার এক একরকম করে।

মাল্কা আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে যাচ্ছিলেন। তিনিও ঐ পদ গান করতেন। আমরা তাঁর কায়দা অনুকরণ করিনি, এটা তিনি লক্ষ্য করছিলেন। যাই হোক, ননী চুপ করে থাকতে পারল না। ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বলল, "আপনার গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে যেন সুর আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। কথার ছেড়্-ছাড় দিয়ে তো অনুগ্রহ করেছেন এতক্ষণ; এখন মেহেরবানি করে সুরেরও ছেড়্-ছাড় একটু লাগান দেখি। তবে তো বুঝি, আপনি বরাব্বরকা দোস্ত।" বরাব্বরকা অর্থ—সমানধর্মী; ননী তাঁকেও রকীবের দলে টানতে চায়।

বৈঠকে পরিচিত অপরিচিত কোনও লোককে খামকা সুর ছাড়তে অনুরোধ করায় কখনও দ্বিধা বোধ করিনি। ভয়ও ছিল না; কারণ, বেসুরা লোক খুব কম আসত; যদি বা আসত, তারা কখনও গান করত না, এইটেই ছিল মহৎ ভাগ্য আমাদের।

ভদ্রলোকটি ননীর কথায় উত্তর দিলেন না; শুধু মাল্কার দিকে একবার তাকিয়েছিলেন। দেখি, তাঁর চোখের কোণে যেন সুরের ধ্যান দেখা দিয়েছে। গাইয়ে-লোকের চোখের মধ্যে সুরের একটা অগ্নিকোণ আছে। সেখানে তাপ দেখা দিলে কিছু না কিছু আশা করা যায়। তবে ঝড়-গর্জন হবে, কিম্বা স্নিগ্ধ বর্ষণ হবে, আগে থেকে বলা কঠিন।

অকস্মাৎ মুহূর্তের ভ্রমরগুঞ্জন আমাদের কানে এল। প্রস্তুত হতে না হতেই আমাদের প্রত্যাশার চরমকেও ছাড়িয়ে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল

"রকীব্‌সে যো উয়ো" চরণটি। শেষের শব্দ যখন পঞ্চম স্বরে এসে স্থির মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনে হল যেন সুরের আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে জোনাকির চিকিমিকি নয়, এ যেন মেঘনির্মুক্ত চন্দ্রপ্রভা! ননী ও আমি বিস্ময়ে আনন্দে বিমোহিত হয়েছি।

এত ভাবও কি লুকিয়ে ছিল মাত্র তিনটি শব্দের মধ্যে! অথবা এতখানি সুর ও দরদ বুঝি লুকিয়েছিল ঐ অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠে, ঐ অজ্ঞাতপরিচয় হৃদয়ে! এ তো কাঁচা সুরনবীশের কণ্ঠ নয়; এ তো গানের অভিনয় নয়। গানের কার্বণ-কপিও নয়! আমার কথা বাদ দিলাম, আমার হৃদয় দুর্বল। সুরের দরদ নিয়ে শব্দের একটিমাত্র পাপড়ি খুলে গেলে আমায় গান শোনার নেশা ধরে, তা যে কোন গানই হোক। কিন্তু ননী ছিল সেই ধরণের লোক, যারা চোট খেলেও সহজে বেদনা স্বীকার করে না। সেও দেখি, ঐ পঞ্চমের আবাহনে আত্মসমর্পণ করেছে। আর মাল্‌কা! তাঁর স্নিগ্ধ শান্ত অথচ সাভিলাষ দৃষ্টি কোথায় যেন চলে গিয়ে স্তব্ধ হয়েছে। এক একটি সুর এসে কাউকে নিয়ে যায় সুরের অনন্তে, কাউকে বা নিয়ে যায় বিস্মৃত অতীতের দিগন্তে।

শব্দের পর শব্দের পরাগ সঞ্চয় করে নিয়ে সুরের পর সুরে তিনি এগিয়ে চলেন অনায়াসে। ধৈবত ও কোমল নিষাদের চকিত নক্‌শা সেরে নিয়ে ফিরে এসে সমাহিত হলেন পঞ্চমে, "করতে হুঁায়" ধ্বনির মধ্যে। মনে হল যেন বসন্ততিলকের রহস্য সঙ্গে করে' ফুলের এদিক্ ওদিক্ ঘুরে ফিরে এসে ভ্রমর বসল ফুলেরই উপর। সে পঞ্চমের কী স্ফূর্তি, কত শোভা! ভীমপলশ্রী রাগের যত মধু, সবই বুঝি উজাড় করে ঢেলে দিল ঐ পঞ্চমের ধ্বনি; যত সৌরভ, সবই বুঝি উন্মত্ত হয়ে ছুটে বেরুল ঐ পঞ্চমের শ্রুতিধারায়!

নিখুঁত সুরে একটি ছোট্ট ফিরৎ, একটি মোলায়েম ঝট্‌কা দিয়ে দ্বিতীয় চরণটি দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন সুরে। পঞ্চম নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়েছে; মধ্যম, গান্ধার, রেখবও ক্ষণিকের গোপন রহস্য জানিয়ে চলে গিয়েছে। সুর এসে দাঁড়িয়েছে বিস্ময়ের বাণী মাত্র বহন করে। তবুও মনে হল যেন গানের ফুলটি তখনও দুলছে সেই পঞ্চমের আবেগে; যেন জানিয়ে দিচ্ছে তার অতৃপ্ত বাসনা, "আবার এসো, পঞ্চমকে সার্থক করো, সে পিপাসা তো মেটেনি।"

গজল গানের নিয়মধর্ম পালন করে প্রথম চরণের পদাঙ্কগুলি অনুসরণ করে তিনি আরম্ভ করলেন তৃতীয় চরণটি। পঞ্চমে সেই ক্ষণিক আবেশ, সুরের সেই লুকোচুরি। কিছু ঘুরে ফিরে এসে সেই পঞ্চমেই যেন সম্ভোগের পূর্ণাহুতি! এবার চতুর্থ চরণে ফিরে এলেন তিনি, খণ্ড খণ্ড সুরের আরতি-চক্র করে; যেন সম্মোহনী লীলার শেষে সুরে বিশ্রান্তি হল। পঞ্চমের সেই বিলাস, তার সুগন্ধ, তার আকৃতি, সব কিছু ঝরে গিয়েছে ফিরবার পথে, মধ্যম-গান্ধার-রেখবের ত্বরিত তর্পণের অন্তরালে! সুরে এসে দেখা দিল যেন খণ্ডিতার অচিরসঞ্চিত বেদনাবশেষগুলি! নিরাশ হৃদয়ে রেখে গেল শুধু একটি তৃষ্ণা, একটি সঙ্কেত,—যাদের সার্থক করতেই হবে গানের গহনে, সুরের পথে, নূতন বাণীর সাজে, নূতন অভিসার দিয়ে। বর্তমানের বিরতি অর্থ ভবিষ্য আরতির নূতন বর্তিকায় নূতন আকাঙ্ক্ষার অগ্নিস্পর্শ।

এরকম করে নূতন হতে নূতনতর অভিযান কখন্ আরম্ভ হয়, কখন্ শেষ হয়, জানিনে। অনুভবের ইন্দ্রধনু উদিত হয় জ্ঞানসূর্য্যের বিপরীত দিকে; তাদের মিলন অসম্ভব। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

আরও মনে হয়, এক একটা গোটা গান যেন এক একটি ফুল। পদগুলি যেন পাপড়ির এক একটি ঘের। শব্দগুলি যেন এক একটি দল। কথায় সুরে ছন্দে এরা ফুটে ওঠে, নিজেদের সার্থকতা দিয়ে ফুলকেই সার্থক করবে বলে। সেই সন্ধ্যালগ্নে গান শেষের পর মনে হয়েছে—ফুলের পাপড়ি আর দলগুলি বিকশিত হয়েছে, মাত্র আপনাপন সুষমার স্পর্ধায় নয়, সমস্ত গানের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করাও যেন তাদের প্রেরণা, তাদের প্রয়োজন, তাদের বিশিষ্ট গৌরব, তাদের সব কিছু। পুরা গানটা আমাদের জানা ছিল বলে' আগে থেকেই আমাদের মনে তার অস্ফুট বাসনাগুলিও জেগেছিল, প্রতীক্ষা করেছিল কোনও অজানা মুহূর্তের অভাবনীয় সুযোগ। কিন্তু এর পূর্বে তাদের পূর্ণ সার্থকতা সম্ভব হয়নি। মনে হল গানের সেই মর্মকথা, সেই "অরমাঁ"কে এত তীব্র এত স্পষ্ট করে, আর কখনও সাক্ষাৎ করিনি। এখন বুঝি, যিনি সেই অপূর্ব সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

বুঝলাম এক নিপুণ পরিপক্ক গীতরসিক আমাদের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন। শৌখীন খোশ্‌খেয়ালী মেজাজে এরকমের শিল্পচাতুর্য অসম্ভব। অন্তত বিপজ্জনক। তিলমাত্র সুরে ঘাটতি হলেই গানের সমস্ত ছবি কলঙ্কিত

হয়; ঘণ্টার পর ঘণ্টায় রাগালাপের শুদ্ধিপত্র দিয়ে এরকম অশুদ্ধির কলঙ্ক মোচন হয় না। 'ঠাহ্‌রান' অর্থাৎ কথা ও সুরের স্থিতি পরিমাণ ওজনে একটু কম-বেশী হলেই ফুলের সাজ নষ্ট হয়ে যায়। ভাবের দলগুলি আলগা হয়ে ঝরে পড়ে ফুল ফোটার আগেই; রেখে দিয়ে যায় মাত্র রাগের কঙ্কালসূত্র। গানের তাল-বেতাল ভৈরবী আছেন, রাগ-কঙ্কাল-মালিনীও আছেন; আবার কথা-সুর ও ছন্দের ত্রিপুরসুন্দরীও আছেন। প্রত্যক্ষ করি বলেই এদের অস্বীকার করিনে। অনুভব করেছি বলেই তো ত্রিপুরসুন্দরীকে স্মরণ করতে বাধ্য আমি। গজল ও আর সব ঐ ধরণের গান তো শ্মশাননৃত্যের জন্য নয়, কঙ্কালের মালা সাজানোর জন্যও নয়। সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরীর অংশ এঁরা।

সেই অপূর্ব আবির্ভাবকে সার্থক করে' তিনি যখন সুরে এসে বিশ্রাম নিলেন, তখন আমরা স্তব্ধ হয়ে আছি। ননী যখন পরিহাস-রসিকতায় মন লাগিয়েছিল, তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, ঘটনাচক্রের নেপথ্যে এমনতর উপভোগ প্রত্যাসন্ন নিয়তির মত অপেক্ষা করছে। শ্যামলালজীর বৈঠকে অন্তরঙ্গদের সমাবেশ হলে, কথায় কথায় উঠত ভাবের হাওয়া; হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসত গানের সুর; সুর মিলিয়ে যেত জল্পনা-কল্পনার তরঙ্গে; অবশেষ থাকত কিছু ভাবান্তর, কিছু পুরান কোনও কথার অবান্তর সূত্র। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার স্রোতে ভেসে অকস্মাৎ এমন গীতশ্রী নিজে এসে কখনও ধরা দেয়নি। মাত্র একারণে আমার হৃদয়ে স্মৃতির অতলে এই নিরালা ঘটনা নিভৃতে পথ চেয়ে থাকা কোনও বিরহিণীর মতো প্রতীক্ষা করে আছে। যে প্রতীক্ষা করে চেয়ে থাকে, তাকে খুঁজে পাওয়া ত কঠিন নয়।

সকলের আগে ননী কথা বল্‌ল; "আপনি যে এমন পাকা খেলোয়াড়, আমরা তো কিছুমাত্র আন্দাজ করতে পারিনি। যদি ঐ সুরটি না ধরে দিতাম, আপনিও নিজেকে লুকিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু আপনার তারিফ করতে কথাও খুঁজে পাইনে আমরা" ব'লে মাল্‌কার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "আপনি যে কি খেয়ালে থাকেন বুঝলাম না। এমন গুণীকে আপনি লুকিয়ে রেখেছেন! বেয়াদবী মাফ করবেন, আপনারা বড়, আমরা ছোট। তা হ'লেও মেহেরবাণী করে এঁর তারিফটা প্রকাশ করতে"—। ননীর কথায় ছিল অন্তরের সুর। যদিও ছোটরা বড়দের পরিচয় যাচাই করতে পারে না, তবুও ভদ্রলোকটি সেই অন্তরের সুরটি অনুভব করে তার সম্মান রক্ষা করলেন হাসিমুখে আদাব জানিয়ে।

মাল্কা হাসতে হাসতে বললেন, "পরিচয় দেওয়ার সুযোগ দিলেন কই আমাকে! এসে অবধি ত পাগল করে তুলেছেন। তার উপর গান ধরলেন আপনারা। যদিই বা থামলেন তো আপনি আবার এঁরও গলায় সুরের ফাঁস পরিয়ে দিলেন—।"

মাল্কার কথা শেষ হতে না হতেই পাশের দুয়ার দিয়ে শ্যামলালজী বৈঠকে প্রবেশ করলেন। তখনকার রেলীর উৎকৃষ্ট ধুতি ছিল তাঁর পরনে; গায়ে গেঞ্জী, তার ওপর আদ্দির পাঞ্জাবী। গলার পাশের বুটি আঁটতে আঁটতে তিনি এসে দাঁড়াতেই মাল্কা ও সকলে উঠে দাঁড়ালাম, নমস্কার জানালাম। বাবুজী প্রতিনমস্কার করতে করতেই বলে উঠলেন, "আরে! এ যে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে দেখছি। বড়ো আনন্দের কথা ভাই! সেই তো বলি, ও রকম সুর ওর আন্দাজ আবার কে জাহির করল। বসুন বসুন সকলে।"

ফৈয়াজ্ খাঁ? কোন্ ফৈয়াজ্? সেই ফৈয়াজ্ যার কথা দু'একবার তন্নুলালজী ও বাবুজীকে বলতে শুনেছি। ধন্য এই লগ্ন, এই মুহূর্ত! আমার বুকে আশা আর আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বাবুজী এগিয়ে গিয়ে ঐ ভদ্রলোকটির দুখানি হাত ধরে সমাদর করলেন, পরে আবেগভরে কোলাকুলি করলেন। বাবুজী ও মাল্কা আসন গ্রহণ করলে আমরা বসলাম।

বাবুজীর বয়স তখন আন্দাজ পঞ্চান্ন হবে; দেখতে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সুস্থ শক্তিমান্ পুরুষ বলে বোধ হ'ত। ভগবান্ তাঁকে অনেক গুণ, প্রচুর কর্মশক্তি ও অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। সরস, একনিষ্ঠ ভক্তির ফল্গুধারা তাঁর জীবনের নিভৃত সাধনাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল। আত্মীয় ও অন্তরঙ্গের দলের বাইরে তিনি নিজেকে ধরা দিতেন না, অথচ নানারূপে, নানাদিকে, নানা কাজের মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচর্যপূত জীবন উৎসর্গ করা ছিল। নিজের স্বার্থে দেবী সরস্বতীর সেবায় তিনি যত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি উদ্যম ফলিত হয়েছিল—অন্য সেবার্থীদের সাহায্য করায়, প্রতিদানের আশা না করে।

বাবুজী ও এই গুণী ভদ্রলোকটি, অর্থাৎ ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিলাম আমি ও ননী; অত্যন্ত উৎসুক হয়ে। রাজ্যের খবর

এসে পড়ছিল; সবই পুরানা জমানার, অর্থাৎ পুরান লোকের সম্বন্ধে, যাঁদের বিষয় আমরা দু'জন বিশেষ কিছু জানতাম না।

শুনলাম, আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র, বোম্বাই, মহীশূরের উল্লেখ। গোলাম আব্বাস খাঁ ও অন্য কয়েকটি নামে গুণকথনের আভাস ছিল প্রচুর। সমস্ত জড়িয়ে বুঝলাম, গোলাম আব্বাস্ প্রসিদ্ধ খান্দানি ঘরানার পুরান গাইয়ে; ফৈয়াজ্ খাঁ সেই ঘরের গুণী আব্বাস্ খাঁর দৌহিত্র, নিবাস আগ্রায়। সম্প্রতি এখানে এসে ধর্মতলায় এক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। আজ রাত্রির জন্য শেলী বাঈজীর বাড়ীতে এঁর ও মাল্কার নিমন্ত্রণ আছে। মাল্কা বুঝি সেখানে যাবেন না। কিন্তু ফৈয়াজ্ খাঁকে যেতে হবে, মাত্র ভদ্রতার খাতিরে নয়, মৌজ্দিনের গানের লোভেও। মৌজ্দিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি অনেক দিন; প্রণয়-ঋণের খাতায় আগ্রহটা জমা পড়ে আছে। কথায় কথায় বুঝলাম, ইনি মৌজ্দিনকে ভাল করেই চেনেন। আমি এই ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের চেহারা হিসাব করে আন্দাজ করলাম, ইনি মৌজ্দিনের বয়সের কাছাকাছি হবেন। আন্দাজটা ভুল হয়নি।

পরিবেশটি বেশ স্বাভাবিক হয়ে এল, যখন শ্যামলালজী নিজের পানের কৌটা থেকে পান তুলে দিলেন মাল্কা ও ফৈয়াজের হাতে। ছোট ছোট নতি জানিয়ে তাঁরা তাম্বূলের সদ্ব্যবহারে মন দিয়েছেন, এরই মধ্যে ননী বাবুজীর কাছে পান আদায় করেছে, আলগোছা ভাবে গালে পুরে রুমাল দিয়ে আঙুলগুলি মুছে পকেটের মধ্যে থেকে সুরতির কৌটা খুলে ফৈয়াজ্ ও মাল্কার হাতে পরিবেশন করতে শুরু করেছে; অতি সন্তর্পণে, অর্থাৎ নিজের পাঞ্জাবির আস্তিন যেন ময়লা না হয়, গ্রহীতাদের পরিধেয় তথা সাদা ফরাস যেন মলিন না হয় এবং পরিবেশন করতে গিয়ে যেন কোনও রকমের সংস্পর্শ-দোষ না ঘটে। ছোটখাট এই দানযজ্ঞ শেষ করে নিজেও কিঞ্চিৎ যজ্ঞভাগ মুখে পুরে ননী বলে উঠল, "হায় হায়! বাবুজী! কী সুর আর কী মেজাজ্! মনে হল, ইনি যেন গানের চিরাগটি জ্বেলে দিলেন। আমরা আঁধারে শুধু তেল আর সল্তে নিয়ে খেলা করছিলাম।" কথাটি ত এক-বর্ণও মিথ্যা নয়। ননীর কথায় আমিও সায় দিলাম।

বাবুজী খুব খুশি হয়ে বললেন, "গোলাম আব্বাসের ঘরের রোশ্নি যদি থাকে ত এঁর কাছেই আছে। আর কিছু আছে," বলে মাল্কার

শুচিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এর কাছেও কিছু আছে।" রোশ্‌নি অর্থাৎ আলো, এখানে তার অর্থ গানের গায়কীর আলো। হাতে সুতা বেঁধে বা সোনার চেন বেঁধে গুরুর কাছে গানের 'আস্তাই' (ধ্রুপদ ও খেয়ালের গীতের প্রথম চরণকে 'স্থায়ী' বলে, অপভ্রংশ আস্তাই) আদায় করা যায়, কিন্তু আলো আদায় করা অত সহজ নয়।

ফৈয়াজ্ মাথা নত করে বাবুজীর প্রশংসার সম্মান করলেন। তখন পর্যন্ত আমরা সে প্রশংসার পুরাপুরি অর্থ বুঝতে পারিনি। কারণ, এঁর মুখে খেয়াল গান ত শুনিনি। সেই রোশ্‌নির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম বহু বহু বৎসর পরে। কোথায় ১৯১৫, আর কোথায় ১৯৩৪ সাল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, আব্বাস খাঁর ঘরের প্রদীপটি কত মজবুত, তার বনাওট্‌-সজাওট্‌ই বা কত চমৎকার। আর সেই যৌবনকালের ফৈয়াজ্ যে "আফ্‌তাব-এ-মৌসিকী' উপাধি পেয়েছিলেন, তার সার্থকতাই বা কি ধরণের ছিল। আরও বুঝতে পেরেছিলাম—তেল ও সলতে ক্ষয়ের চরমে পৌছবার আগে যে আলো জ্বলে ওঠে, সে আলো যেন বলে, "আমাকে এই শেষবারের মত দেখো, দেখনেওয়ালারা সব। এ আলো আর জ্বলবে না।"

বাবুজীর মুখে প্রশংসা শুনে মাল্‌কার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; হওয়ারই কথা। শ্যামলালজীর মতো সত্যবাক্ পুরুষের মুখে প্রীতিস্নিগ্ধ বাণী; তার উপর বর্তমান গুরু সপ্রশংস উল্লেখ করছেন পূর্বের গুরুকে এবং অতীতের সতীর্থকে। তার উপর? আরও কিছু ছিল, যা তখনও আমরা জানতাম না।

ননী কিছু বলবার জন্য উদগ্র হয়েছে। বাবুজীর কথা শেষ হলেই ননী বলল, "বাবুজী! একটা নিবেদন আছে। মাল্‌কা আজ আমাদের উপর রনূজ্ হয়ে আছেন। খাঁ সাহেবের বিচারে উনি হেরে গিয়েছেন বলে। যাকগে, আপনি একটু আমাদের হয়ে ওঁকে ভাল করে প্রশংসা করে দিন; হয় ত তাতে উনি আমাদের উপরে রাগের ভাবটা ছেড়ে দেবেন।" দেখলাম, ননী হাসি-মস্‌খরার রাশ আলগা দিয়েছে মাত্র; তবে রথ থেকে নামা দূরে থাক, লাগামই ছাড়েনি তখন।

ননীর কথার রকম-সকম দেখে ফৈয়াজ্ খাঁ একটু সোজা হয়ে বসলেন। বাস্তবিকই ননী কোন্ দিক্ থেকে কি রকমের হাওয়া আমদানী

করে, কিছু ঠিক নেই। মাল্‌কা একটু কাতর স্বরে বাবুজীকে বললেন, "বাবুজী, এই ডাক্তারবাবুর হাত থেকে বাঁচান আমাকে। ইনি যে রকম শুরু করেছেন আজ, হয় ত কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে আমাকে।"

মাল্‌কা ও আমাদের মধ্যে এরকমের হাস্যকলহের ব্যাপার বাবুজী বিলক্ষণ জানতেন। বেশি কথা কি, বৈঠকের সকলের চেয়ে বড় কথা শিল্পী তন্নুলালজী, বলদেও দাসজী আর হাকিমজী, এঁদের শাগরেদী করে এ বিষয়ের মার-প্যাঁচ, প্রয়োগ-পরিহার শিখতে হয়েছিল কিছু কিছু, পরীক্ষাও দিতে হ'ত, দিল্লগীর দঙ্গলে, অন্যের কাছে মার খেয়ে। মাল্‌কা আমাদের গুরু-বহিন্‌। তিনি বৈঠকে এলে ছল-ছুতা করে, তারিফ-তামাশা করে আগে তাঁর মনটি সরস করার প্রয়োজন বুঝেছিলাম। কারণ, এর পরেই নিবেদন করতাম আমাদের প্রার্থনা, যথা, "সেই যে খাম্বাবতীর আস্তাইটি"···, "সেই যে ঠুমরীর অন্তরাটি," অর্থাৎ 'একবার শোনান্‌,' 'আর একবার শোনান্‌,' 'ফের শোনান,' 'না শোনালে আপনারই আফ্‌সোস থেকে যাবে, চিরকাল; আমাদের আর কি?"— ইত্যাদি নানা রকমের নিত্য-নূতন দাবী। আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা ছিলেন ভীরু ও ভালোমানুষ; দাবী উদ্ধার করা কঠিন ছিল না। এঁর জুড়ি চুলবুল্লেওয়ালী মাল্‌কা ছিলেন বিদুষী, সুচতুরা; তাঁকে ঘাল করা সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করে, দয়া করে হার মানতেন, যখন আমরা খলিফা বদল্‌ খাঁ সাহেবের জবানী অনুরোধ-উপরোধ পেশ করতাম, প্রশস্তি ও কল্পনা দিয়ে সাজিয়ে। কিন্তু সাধনা কখনও বিফলে যায় নি। এঁদের স্মরণকে কখনও উপেক্ষা করব না। কারণ, মেঘ চাইতে জল পেয়েছি, একখানা গান শুনতে চাইতে তিনখানা তিন রকমের শুনতে পেয়েছি। এঁরা আমাদের, অর্থাৎ ছোট ভাইদের কতখানি সম্ভ্রম করতেন, কতখানি অনুগ্রহ করতেন, কতখানি প্রীতির চোখে দেখতেন, একসঙ্গে, একদৃষ্টিতে, এক নিঃশ্বাসে তার তল পাইনি, তুলনাও খুঁজে পাইনি। সে সব আবদার-অনুগ্রহের মুহূর্তগুলি স্মরণ করতে গেলেই দেখি—নিষ্কলুষ সৌখ্যের আলোয় স্মৃতির দেউল ভরে আছে; সেই আলো উপছে এসে পড়ছে বর্তমানের আঙিনায়; উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে অতীতের ছায়া-শরীর-বিশিষ্ট মূর্তিরা। এ-আলোর একটিমাত্র রশ্মিও যদি ভবিষ্যতের দিকে ছুটে গিয়ে অপেক্ষা করে, তবেই বুঝব, আমার হৃদয়ে কিছু কৃতজ্ঞতা আছে।

বিচারকের গম্ভীর সুরে বাবুজী বললেন, "ডাক্তারবাবু! মাল্‌কা আপনার নামে শিকায়েৎ করলেন। আপনার জবাব কি আছে বলুন।" এবার মাল্‌কাই অভিযোগ করলেন।

খুব একটা বিষাদের সুরে ননী বলল, "কী আর জবাব দেব বাবুজী! আমাদের তগ্‌দিরই বুঝি খারাব। তার মধ্যে আসানি এই যে, খাঁ সাহেব এসেছেন, আর আমাদের ভবিষ্যৎ ঠাণ্ডা করে দিলেন গান করে। কিন্তু ইনিও এলেন, আর মাল্‌কা চড়ি-নিখাদে বলতে আরম্ভ করেছেন, কল্‌কত্তা ছেড়ে চলে যাবেন!' লোকে শুনবে, হয় ত বলবে, বুঝি আগ্রায় ফিরে যাবেন! যাই হক, কপালে যাই থাক আমাদের, মাল্‌কা বিবির ট্রেন সিটি দিলেই আমরা বৈরাগ্‌-যোগ নিয়ে নেব, গান আর শুনব না কারুরই। কি বল পাঁচু ভাই! তুমি কিছু মদত্ দেও আমাকে, আমার ছাতি যে শুকিয়ে গেল।"

এর পর শুধু হাসির রোল; যত বা বাবুজীর, তত বা খাঁ সাহেবের, তত বা আমার ও মাল্‌কার। চড়ি-নিখাদই সপ্তম বা শেষ সুর। মাল্‌কা একটু দম্ নিয়ে বললেন, "ডাক্তারবাবু! দোহাই আপনার, আমি হার মানলাম, আমার কথা ফিরিয়ে নিলাম। আপনি রেহাই দেন।"

ননী এতক্ষণে যেন প্রসন্ন হ'ল; বিনীত হয়ে করজোড়ে মাল্‌কার দিকে চেয়ে বলল, "বহিন! আপনি বাবুজীর খাস সাগরেদ। আপনাকে নিয়ে আমরা মস্‌খরা করি, আপনি ছাড়া আমাদের আছে কে! আর আপনি বদ্‌লা নেন আমাদের গান শুনিয়ে, চোট দিয়ে! এ কি আমরা ভুলতে পারি! যাক্, দু'দফা হেরে গিয়েছেন। বেশি নয়, দু'খানা গান পাওনা থাকল; মেহের-বানি করে ইয়াদ্ রাখবেন।"

ফৈয়াজ্ খাঁও যেন চূড়ান্ত আমোদ পেয়েছেন। বাবুজীকে বললেন, "দর্‌দী ঔর ইন্‌সান্ ত অনেক দেখেছি। তবে এঁর মত জিন্দা দিল হর্‌দম্-তৈয়ার ত আর দেখিনি! এঁদের সঙ্গে জান্-পহচান্ নেই, তা হলেও—"

বলতেই শ্যামলালজী বললেন, "হাঁ-হাঁ বলছি। খেয়াল করুন;" বলে একে একে আমাদের নির্দেশ করে' যথাযোগ্য পরিচয় দিলেন। শেষে বললেন, "এঁরা আমার বে-ফিকর্ দোস্ত।" এর অর্থ হল—এঁরা আমার সেই রকমের বন্ধু ও বিশ্বস্ত, যাঁরা আমাকে চায় মাত্র আমারই জন্য, অন্য কোনও ফিকির বা স্বার্থচিন্তার বশে নয়। আমাদের জীবনে ত ওরকমের কথা শুনিনি।

ঐ ছোট্ট দু'টি শব্দের মধ্যে যে স্নেহ, প্রীতি ও আশীর্বাদ, সমস্ত এক হয়ে ছিল, এ দু'টি ক্ষুদ্র হৃদয় তার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করেছে মাত্র। যোগ্য হতে পেরেছিলাম কি না, একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

পরিচয়ের প্রসঙ্গেই উঠল বদল্ খাঁ সাহেবের কথা। সে দিন কি জানি, কি কারণে বদল্ খাঁ সাহেব দমদম থেকে এসে জমতে পারেন নি। সমস্ত কথা যেন চলে গেল অতীতের ছায়া অনুসরণ করতে করতে পৌরাণিক পথে। খলিফা বদল্ খাঁ সাহেব তখন মুনি-ঋষিদের পর্যায়ে উঠেছেন,—গুণ, বয়স আর চরিত্রের কারণে। ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের বাপ-দাদা-পরদাদারা আগ্রার বদল্ খাঁকে জেনে গত হয়েছেন ; ফৈয়াজ্ খাঁকে নিয়ে চার পুরুষের হিসাব ! তখন বদল্ খাঁ সাহেবের হিসাবী বয়স তিরাশি বৎসর !

কথার সূত্রে আগ্রার, গোয়ালিয়রের খানদানি ঘরের আলগা খবর এসে জমল। খানদানি অর্থ—যে বংশের বা সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের কোনও শিল্পী পূর্বেকার কোনও বাদশাহী আমলে শাহের সভায় গতায়াত করতেন ও বিশিষ্ট খাতির পেয়েছিলেন, সেই বংশের সৌভাগ্যের কারণেই পরবর্তী বংশধরেরা খানদানি মর্যাদা দাবী করতেন। পরে এই শব্দটি আর 'ঘরানা' শব্দ প্রায় একরকম অর্থে প্রয়োগ করা হত। তখনকার কালে অর্থাৎ আমাদের কালের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল—তানসেনের দৌহিত্র-বংশের প্রখ্যাত গুণী পুরুষ রামপুর ষ্টেটের ওস্তাদ উজীর্ খাঁ সাহেব। বংশানুক্রমে এই ধারা বাদশাহ বা শাহদের সংস্রব বজায় রেখেছিল। অথচ তানসেনের পুত্র-পৌত্রদের ধারা পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে যে সেনীঘরানা বা পছাঁওবাজী সম্প্রদায় নামে অভিহিত হত, তাকে খানদানি বলা হত না ; কারণ বাদশাহ বা শাহদের সাক্ষাৎ পোষকতা থেকে ঐ সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যাই হক, খেয়ালীদের মধ্যে মাত্র গোলাম আব্বাসের ঘরই যে খানদানি, এ কথা শুনলাম সে দিন। আমাদের সময় পর্যন্তও খানদানি ঘরের, অর্থাৎ 'ঘরানার' বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও—মনে পড়ছে, ঐ সৌম্যদর্শন, সুরসিক ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব সে সকল কথা চলতে থাকার কালে দু-একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। যার সরল অর্থ—"তে হি নো দিবসা গতাঃ !" যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না।

সাক্ষাৎ গোলাম আব্বাসের ঘরের কথা এসে পড়ল। একটা ক্ষীণ

আশা নিয়ে আমি ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের একটু নিকটে গিয়ে বসলাম। গজল্ যদি হাওয়ায় উড়ে এসে বসতে পারে ত ভারী পায়ে হেঁটে খেয়ালের একখানা নমুনা এসে হাজির হতে আর কতক্ষণ! অবশ্য একটা যোগ্য সঙ্গতি অপেক্ষা করছে; হয় ত একটু সাধ্য-সাধনা করতে হবে। তাতে আমরা অন্তত পেছপাও নই। এই চিন্তা করেই ত এগিয়ে গিয়ে বসেছিলাম তাঁর কাছে। রসিক সহৃদয় পুরুষই ত আমাদের আশা।

কিন্তু—ভাগ্যদেবতা যে হাতের মুঠো খুলে সে দিন পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন, অকস্মাৎ সেই হাতটি গুটিয়ে নিলেন। সে দিনকার শেষ নিয়তির মতই এসে উপস্থিত হলেন গহ্‌রজান বাঈজী। তিনি জমতে না জমতেই এসে পড়লেন পুরুষোত্তম দাসজী, যাঁকে আমরা 'মহাদেও' বলে সম্বোধন করতাম।

বৈঠকে গহ্‌রের আগমনের অর্থ, জল্পনা-কল্পনা লণ্ডভণ্ড, তখনকার অন্য সব কাজ পণ্ড! তাঁকে মনে করতে গেলেই খুব বড় হয়ে দেখা দেয় সেই বিচিত্র জীবন আর অদ্ভুত প্রতিভা। কিন্তু সেই সন্ধ্যালগ্নের গহ্‌র বলতে মনে পড়ছে, এলোমেলো হাওয়ার একটি ঘূর্ণী, যা নিজেও থাকে না, পরকেও দিশেহারা করে দিয়ে যায়।

গহ্‌র আসতেই ননী ও আমি দু'দিকে বেশ একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে বসলাম, ভয়ে সম্ভ্রমে। সকলকে সম্ভ্রম করতাম; প্রতিদানে পেয়েছি প্রীতি ও সম্ভ্রম। কিন্তু গোপনে ভয় করতাম এই কলাপটীয়সী মহিলাকে। অবশ্য চোখে-মুখে সপ্রতিভ থাকতাম; কিছু না হক, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরের ছেলে আমরা; বিশেষ করে শ্যামলালজীর শিষ্য। গুরুজী আমাদের মনোভাব বুঝতেন বলেই আমাদের ভালবাসতেন, আর নিশ্চিন্তও ছিলেন।

তখন আমাদের দু'জনের বয়স একত্র করলে যত হয়, গহ্‌রের একার বয়স তা থেকে বেশি বই কম ছিল না। এ হল হিসাবী কথা; গহ্‌রের নিজের কাছ থেকে আমি জন্মকোষ্ঠী আদায় করেছিলাম বলেই ও কথা বলতে পারি। যাই হক, গহ্‌র বৈঠকে এলে অঙ্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অধ্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভবই ছিল। তাঁর দেহ সমান কি অসমান, খর্ব কিংবা দীর্ঘ, ক্ষীণ অথবা মেদবহুল—এরকম গবেষণার অবসর পাইনি; অনুপস্থিতিতে আন্দাজ করতে গেলেই সংশয় হত। কারণ, তাঁর বাক্যে ও আচরণে দেখা দিত তরুণীর উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচপলতা; তাঁর নিত্যকারের রূপসজ্জায় লক্ষ্য হত

ষোড়শীর গর্ব ও গৌরব; তাঁর স্বাভাবিক গমনেই ছিল কুঞ্জরের গতিবিভ্রম। তাঁর হাব-ভাব-কটাক্ষের সামান্য সাবলীল ভঙ্গিমা দেখে তওয়ায়েফরাই লজ্জিত, আড়ষ্ট হয়ে যেতেন কুলবধূর মতো! চিকের আড়ালে সত্যকারের কুলবধূরা সে দৃশ্য দেখে কি মনে করতেন, তা আমি এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। গহ্‌রের সঙ্গে তুলনা করে মনে হয়, আজকের বাঈজীরা ত সরল, নিরীহ! আজকের সিনেমা-তরুণীরা ত শিশু; আমেরিকানেরা যাদের পিঠ চাপড়ে বাৎসল্যের ভাবে বলে, 'বেবি!' রামচন্দ্রঃ!

গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব, বদল্ খাঁ সাহেব, শ্যামলালজী প্রভৃতি গুরুদের প্রতি গহ্‌রের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অচলা; এক চুল এদিক্-ওদিক্ হতে দেখিনি। কিন্তু বৈঠকের অন্য সমস্ত লোকদের, স্ত্রী বা পুরুষ, পরিচিত আর অপরিচিতদের তিনি মনে করতেন বন্ধু অথবা বয়স্য, না হয় বাধ্য অথবা বশ্য। বৈঠকে এসে মাত্র সখ্যের খাতিরে কোনও পরিচিত স্ত্রীলোক বা পুরুষের কাঁধে হাত ছুঁয়ে আসন পরিগ্রহ করা তাঁর পক্ষে এবং একমাত্র তাঁরই পক্ষে অদ্ভুত বা অশোভন মনে করা হত না। পরিচিত লোকদের সঙ্গে রহস্য বা প্রকাশ্য কথাবার্তার ছলে অতি নিরীহ, নির্মোহভাবেই তিনি শানিয়ে নিতেন চোখ-মুখের অস্ত্রগুলি; এবং নির্মম নির্বিশেষে সেগুলিকে প্রয়োগ করতেন, আমাদের মনে হত, যেন অপরিচিতকে জয় করারই উদ্দেশ্যে। বৈঠকে তাঁকে প্রথম বার সাক্ষাৎ করার সময় আমরা মনে করেছিলাম—ও সবই ছলনা ও অভিনয় মাত্র। দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর থেকে মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম—আচরণ সঙ্গতই হক, আর উদ্ভটই হক, সমস্ত কিছুই গহ্‌রের প্রকৃতিগত, দুর্নিবার, অকৃত্রিম!

কদাচিৎ তাঁর আচরণে অশোভনতা দেখে আমাদের তরুণ মন বেদনা অনুভব করেছে, সত্য কথা। তবুও শ্যামলালজী ও অন্য বয়স্ক ব্যক্তিরা সে রকমের ব্যাপারকে ক্ষমা করে নিতেন। তার একমাত্র কারণ, গহ্‌রের মধ্যে এঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন গীত ও নৃত্যের অনন্যসাধারণ প্রতিভা; এবং তারই সঙ্গে সেই অদম্য স্বভাবকৃত লীলাপ্রবণতা। এর খুঁটি-নাটির বিস্তারিত প্রসঙ্গ এখানে হতে পারে না। মাত্র বলতে পারি আমরাও গহ্‌রের কলাকুশলতা, প্রতিভার বিকাশ রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। চমৎকৃত বা তন্ময় হয়ে যেতাম বললে আমাদের পক্ষে একটা সামান্য সত্য কথা বলা হল এবং খুবই কম করে বলা হল। কিন্তু গহ্‌রের পক্ষে কিছুই বলা হল না। গহ্‌রের সমৃদ্ধির

অবস্থাকে যাঁরা সঙ্গীত সমালোচনার দৃষ্টিতে অনুশীলন করেছিলেন, সে রকম কয়েকজন প্রাচীনকে বলতে শুনেছি—"এ ত কী! কিছুই নয়, শুধু গহ্‌রের ছায়া!" এমন সব প্রবীণদের অনুবাদ করলাম, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন গুণী ও গুণগ্রাহক, বিদ্বান্ ও বিদগ্ধ, সুশীল ও সংযতবাক্; যথা, বদল্ খাঁ সাহেব, বিশ্বনাথজী, ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র, শ্যামলালজী, তন্নুলালজী, চৌধুরান্ বাঈজী সাহেবা প্রভৃতি। এরকম কথা জেনে শুনে ননী ও আমি গহ্‌রকে দেখে ভয়-সম্ভ্রম করতাম বলে' মাত্র একরকম তটস্থ ভাবেরই ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু এতে করে তিলমাত্র অপবাদ হয় না গহ্‌রের, লেশমাত্রও মর্যাদা বাড়ে না সে চরিত্রের।

গহ্‌র এসেই সর্বপ্রথমে বাবুজীকে নমস্কার জানালেন; পরে প্রশান্ত দৃষ্টিতে অন্য সকলকে নমস্কার করে ননীর দিকে আসন নিলেন। অন্য দিকে মাল্‌কা, তাঁর পাশে ফৈয়াজ্ খাঁ ও তাঁর পাশে আমি; গহ্‌রের প্রায় সম্মুখে বসে আমরা তিন জন। আমার লক্ষ্য থাকত গহ্‌রের চোখের দিকে, বিশেষ করে। সেই চোখের মধ্যেই উদ্বেল হয়ে দেখা দিত ভাবের তরঙ্গ; চোখের ভঙ্গিমাই উছলে উঠত কথার অগ্রদূত হয়ে; চোখের দৃষ্টিই ছিল বাক্যের উপক্রমণিকা। ঠোঁটের আগায় কথা ফুটত পরে। তন্নুলালজী, যিনি আট বছরের গহ্‌রকে কোলে নিয়ে আদর করেছিলেন, তিনিই এ সব রহস্য আমার গোচরে এনেছিলেন।

এক নিমেষের মধ্যেই গহ্‌র সকলকে দেখে নিয়েছেন। সস্নেহ দৃষ্টিতে মাল্‌কার সঙ্গে কুশলসংবাদ বিনিময় করেছেন। একটি সশ্রদ্ধ গ্রীবাভঙ্গি, একটি সবিকাশ ঈক্ষণের সঙ্গে তাঁর মুখ ফিরে গেল বাবুজীর দিকে; চোখেরা চাহনিতে শিশুর মত সরল জিজ্ঞাসা।

"বাবুজী, আপনি শেলীর জলসাতে যাবেন কি? গাড়ী তৈয়ার রয়েছে" গহ্‌র জিজ্ঞাসা করলেন। বাবুজী বল্‌লেন, "না। আমি ত যাচ্ছিনে। তবে আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। যাক, তোমার ধ্যান একটু ঠিক করে বল তো এঁকে দেখেছ কি না। কিছু মনে পড়ে কিনা" বলে বাবুজী গহ্‌রের হুঁশ ফিরিয়ে দিলেন ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের দিকে। বাবুজীর কথায় বুঝলাম, গহ্‌র ও খাঁ সাহেব নিশ্চয় এর পূর্বে পরস্পরকে দেখেছেন। বুঝলাম না, এঁরা দু'জন পরস্পরকে চিনতে পারছেন কি না। অবশ্য পূর্বের পরিচয় ইচ্ছামত

ভুলে যাওয়ার বা অস্বীকার করার অধিকার স্ত্রীজাতিরই আছে। জগতের লোকে এ কথা মাথা পেতে নিয়েছে। পুরুষ বেচারার পক্ষে এরকম অধিকার স্বীকৃত হয়নি। আগে-ভাগে চিনে নেওয়ার দায়িত্বটা গহ্‌রের উপর কেন চাপিয়ে দিলেন বাবুজী, এও বুঝলাম না তখন।

ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেব অবিচলিত হয়ে বসে ; যেন দীপশিখার নিষ্কম্প রূপ একটি।

নির্নিমেষ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে গহ্‌র, খাঁ সাহেবের মুখের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবার অপূর্ব একটি ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাঁ হাতের তর্জনী উঠে গিয়ে চিবুক স্পর্শ করেছে, কি না করেছে, অমনি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল সেই বিস্ময়ের ভাব ; কার্মুকের মত ভ্রূযুগলও নির্মুক্ত হ'ল সঙ্কোচ থেকে। হর্ষে মুখ উৎফুল্ল ; চোখের তারা দুটি বিশদ হয়ে অভিবাদন করে নিয়ে এল যেন অতীতের কোনও নির্মল স্মরণকে। বাবুজী গহ্‌রকে ধ্যান ঠিক করতে বলেছিলেন। গহ্‌রের ধ্যানাবস্থার অর্থ দর্শকদেরই চিত্তবৃত্তির স্তম্ভ বা প্রলয়, গহ্‌রের কিছু নয়।

স্বচ্ছ স্মিত হাসি দিয়ে মাখান মধুর সুরে গহ্‌র বললেন, "বাবুজী! ইনি কেমন করে আমার স্মরণের বাইরে চলে যাবেন। তা কখনও হ'তে পারে না। যে চোট দিয়েছিলেন আমাকে, তা আমি কখনও ভুলব না ;" বলে, একটু আনমনা হয়ে মুখ নীচু করে পরিধানের গোলাপী জর্‌জেটের আঁচল-শেষের ফুলকাটা লেসটি আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগলেন। পরক্ষণেই বল্‌লেন, "বাবুজী! ইনি তো সেই দিল্লীর জলসার ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেব! ত খাঁ সাহেব, আপনি কবে কলকাতায় এসেছেন, আমি কিছুই খবর পাইনি! মাল্‌কা! তুমিই বা আমাকে খবর দিলে না কেন? খএর যা হয়েছে, তা হয়েছে। এখন বলুন, জনাব, কবে গান শোনাচ্ছেন আমাদের।"

অন্তের হাতে কমলালেবু দেখে ছোট্ট ছেলের চোখ যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, গহ্‌রের চোখে-মুখে সেই অকৃত্রিম উল্লাসই দেখেছিলাম। শেষের কথাটি ছিল আবেগ-আকুলতা দিয়ে জড়িত ; মধুর ত যেন বীণায় আলাপের আগে দু'একটি পর্দায় দু'একটি সুরই বেজে উঠ্‌ল। মনে মনে গহ্‌রকে ধন্ত-বাদ করেছিলাম ঐ কথাগুলির জন্য। গহ্‌রের আকুলতার অর্থ সম্ভাবনার অর্ধেক পথে এগিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া প্রাচীনদের মুখেই শুনেছিলাম, কোনও

নামী ওস্তাদ কলকাতায় এলেই গহর্ আগ্রহ করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন, গান শুনতেন, পাঁচ জনকে শোনাতেন; যথাযোগ্য দক্ষিণা পাথেয় দিয়ে তুষ্ট করাটা ত একটা অভ্যস্ত প্রথা—সকল বাঈজীদেরই পক্ষে।

গহ্‌রের পক্ষে এতখানি আগ্রহ শোভন ও স্বাভাবিক হ'লেও ফৈয়াজ্ খাঁ খুব একটা সংযমের ভাব নিয়ে বাবুজীকে বল্‌লেন, "জনাব! আমরা পশ্চিম-দেশের বাসিন্দা। পূরবের আদব-কায়দায় আমরা দুরস্ত নই। এ কারণে এঁর কথার উত্তর দিতে হয় ত বেআদবী হয়ে যাবে; মাফ করবেন। আপনি অনুগ্রহ করে এঁকে বুঝিয়ে দিন, আমাদের ঘরের এ প্রথা নয়, যেখানে সেখানে তম্বুরা বগলে করে ঘুরে গান গেয়ে নিজকে জাহির করি। এঁদের যদি ইচ্ছা হয়, তো একটু কষ্ট করে আগ্রায় গিয়ে আমাদের ঘরানার গানের স্বাদ নিতে পারেন। আমি ত এখানে গান করার জন্য আসিনি।"

গহ্‌রের গায়ে-পড়া ভাব খাঁ সাহেব একেবারেই সহ্য করতে পারেননি, বুঝলাম। তবুও কথাগুলি অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। ওরকম কথায় যে-কোনও লোক নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করতে পারত। কিন্তু বিধাতা গহ্‌রকে গড়েছিলেন অন্য আজব রকমের সরস মাটি দিয়ে।

পুরুষোত্তম এরই মধ্যে এক সময়ে এসে বসেছিলেন আমার পাশে। অতি বিচিত্র এক রকমের হেলায় গহ্‌র পুরুষোত্তমের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন তৎক্ষণাৎ। তাঁর দু'চোখে যেন দু'রকমের চাহনি; একটিতে যেন সরল বিস্ময়, অন্যটি যেন প্রচ্ছন্ন রহস্যে চঞ্চল ও কুটিল। অদ্ভুত সাধন হয় চোখ দিয়ে; অদ্ভুত সিদ্ধি ছিল গহ্‌রের চোখে! পুরুষোত্তমকে গহ্‌র জিজ্ঞাসা করলেন, অবিকৃত স্বরে—"পুরুষোত্তম ভাই! বলো ত, আগ্রা কলকাতা থেকে কত দূর?"

পুরুষোত্তম দাস, অথবা "মহাদেও" নিত্যকার বৈঠকের লোক; বয়সে পঞ্চাশের কাছাকাছি উঠে যেন থেমে গিয়েছেন। যেমন স্নিগ্ধ গোলগাল চেহারা, তেমনি সদানন্দ তাঁর হৃদয়, রসে-ডুবিয়ে-তোলা মধুর বচন। অন্য কারণেও আমরা বন্দী ছিলাম তাঁর কাছে। বড়বাজারে আফিং চৌরাস্তা অঞ্চলে ক্ষীরসমুদ্রের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলেই গণ্য হতেন ঐ ·মহাভাগ; অর্থাৎ ক্ষীর-রাবড়ি-মালাইয়ের মহাজন তিনি। আদর-আহ্বান করে, বা ছলে-অজুহাতে, এমন কি, জোর-জবরদস্তি করেও তিনি আমাদের নিয়ে

যেতেন সেই ক্ষীর-জলধির বেলাভূমিতে, অর্থাৎ তাঁর বিরাট্ দোকানে। সেই বেলাভূমিতে বালকের মতোই নিরীহ হয়ে আমরা রসনা-স্বর্গের মধুর ও অদ্ভুত রসের আস্বাদ নিয়ে ধন্য মেনেছি নিজেদের। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে 'না' বলবার মত ক্ষমতাই ছিল না আমাদের। হে মহাভাগ! যতদিন আপনি মরলোকে প্রকট ছিলেন, আমরা আপনাকে বৈঠকে সাক্ষাৎ করে, বরণ করে ধন্য হয়েছি। আজ আপনি অপ্রকট; তাই স্মরণ করছি। আমরা মোক্ষ নামে মায়াপিশাচীর ভক্ত নই; অপ্রাকৃত সুখও চাইনে আমরা। আমরা চাই, জন্মজন্মান্তরে আপনার মতো মহাপ্রাণ মুরুব্‌বী লোকের সঙ্গ; আর কিছু নয়।

মহাদেব সবে মাত্র হাতে 'সুখা' ডলে নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সবরকম ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। গহ্‌রের প্রশ্নে এক-গাল হাসিমুখে তিনি বল্‌লেন, "হদ্দ্‌ করলে, গহর তুমি! কেন! কলকাতা থেকে আগ্রা কত দূর, তা কি তুমি জান না? আচ্ছা বলি। আগ্রা কলকাতা থেকে যত দূর, সেই আগ্রা থেকে কলকাতাও ঠিক তত দূরে। যদি বিশ্বাস না হয়, মেপে দেখো! বুঝলে ত?"

মহাদেওর কথায়, তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাবে আমাদের মন, এমন কি, ফৈয়াজ্‌ খাঁর গম্ভীর বদনও একটু লঘু ও শিথিল হয়ে এল। কিন্তু আচমকা ফিরে এল একটি প্রতিধ্বনি গহ্‌রের মুখ থেকে। যেন আকাশ থেকে পড়ার ভাব করে গহ্‌র বল্‌লেন, "আচ্ছা! তাই না কি? তা হবেও বা বুঝি"; বলে—গালে হাত দিয়ে খাঁ সাহেবের ও মাল্‌কার মুখের দিকে কুটিল কটাক্ষ বর্ষণ করে বল্‌লেন, "কী জানি! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আগ্রা আর কলকাতা দূরে নেই; মিলেই গিয়েছে বোধ হয়! পুরুষোত্তম ভাই! তুমি কি বলো? আমার থাক্‌-পড়া নজর কি ভুল দেখল?"

একে আনাড়ীর মার কিছুতেই বলা যায় না। খাঁ সাহেব যেমন বাবুজীর মারফৎ গহ্‌রের উত্তর দিয়েছিলেন, এখন গহ্‌রও যেন মহাদেওর মারফৎ তাঁর সতর্ক মন্তব্য প্রচার করলেন। এ যেন সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। আমি ত কিছু দোষ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু কোলাকুলি আর হয়নি।

কারণ, ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেবের মুখ ভারী হয়ে গিয়েছে, গহ্‌রের কথার শ্লেষ বুঝে। চিবুকের নীচে রেখাটি দৃঢ়, স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল আবার।

কোনও উত্তর দিলেন না তিনি; মনে হল, অস্বস্তি বোধ করছেন। গহ্‌র তাঁকে চিনেছেন সুনিশ্চিত। কিন্তু তিনি গহ্‌রকে যথার্থই চেনেননি, না কি, স্বীকার করতেই নারাজ, বুঝে উঠলাম না। ননী ও আমার মধ্যে চোখে-চোখে প্রশ্নবিনিময় হয়ে গেল মাত্র। মহাদেও অন্যের অলক্ষ্যে আমার হাতের পাশে একটা খোঁচা দিলেন, যার অর্থ "গহ্‌রের তামাশা দেখ একবার!" গহ্‌রের কথার পরে মহাদেও অনায়াসে কিছু বলতে পারতেন; কিন্তু কিছু বলেননি, শুধু কি হয়, মজা দেখবার আশাতে।

মাল্‌কা বাবুজীর মুখের দিকে চাইলেন; এমন ভাবে যে, মুখে কথা না ফুটলেও তাঁর চোখ দুটি বলছিল, "বাবুজী! গহ্‌রকে আমরা সামলাতে পারব না। আপনিই ওঁকে সামলান দয়া করে।" বাবুজী কিন্তু একেবারেই চুপ করে থাকলেন, যেন নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র।

মুহূর্তের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফৈয়াজ্ খাঁ বাবুজীকে বল্‌লেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি এখন যেতে ইচ্ছা করি। ধর্মতলায় যাব; সেখান থেকে যাব জলসায়।" বাবুজী খুব খাতিরের সুরে বল্‌লেন, "হাঁ, হাঁ, আপনি চলে যান। এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তবে একটা কথা বলি, শুনে রাখুন। মনে রাখবেন, আপনি যেন আমাদের ঘরেরই লোক। আপনার নানাজীর সঙ্গে তেজনারায়ণ, দুলীচাঁদ, আর আমাদের খাতিরটা মাত্র দেখনা-পুছনার মামলা ছিল না; কখনই নয়। আর কলকাতা শহরও আজব রকমের। ভগবান্ না করুন, যদি কোনও বিষয়ে কিছু অসুবিধে হয়, আর আমি যদি খবর না পাই, তা হ'লে আমার আফ্‌সোসের অন্ত থাকবে না বলে রাখছি। আচ্ছা, যান্ আপনি; আর মাল্‌কা।"

বাবুজীর মুখে সে-কালের সাদা-সিধা কথা শুনে ফৈয়াজ্ খাঁর মুখ প্রসন্ন, উজ্জ্বল হয়ে উঠে। নম্র-মধুর স্বরে ফৈয়াজ্ বললেন, "আপনাকে দেখার সৌভাগ্য সেই কবে হয়েছিল; আর আজ হ'ল। আমাকে আর আমাদের ঘরের লোকদের আপনারা মনে রেখেছেন, এ আমারই ভাগ্য মনে করছি। কারণ কি, অনেক দিনই কেটে গিয়েছে, যখনকার কথা স্মরণ করছেন আপনি। স্মরণ ত অনেকেই করে; আর নজরও আছে নাকি অনেকের। কিন্তু যে নজরে আপনারা দেখছেন, আর যে হৃদয় দিয়ে আপনারা স্মরণ করেন, সে নজর আর দিল তো বেশী দেখা যাচ্ছে না আজকের জমানায়।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের বাঁচিয়ে রাখুন দীর্ঘজীবী করে। আদাব বাবুজী"; বলে একে একে অন্যদের আদাব জানাতে জানাতে খাঁ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আমি মুখ উঁচু করে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। আমার মন আগেই উঁচু হয়ে গিয়েছিল তাঁর মধুর সংযত ভাষণ শুনে। দেখলাম, বাবুজীর দিকে মুখ রেখে দু'চার কদম পিছু হেঁটে সুবিন্যস্ত পদক্ষেপে দুয়ারের প্রান্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বর্তমান অনুষঙ্গের অকারণ কলকাকলী ও পত্র-মর্মরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই যেন চলে গেলেন একজন পুরুষসিংহ, কোনও অদৃশ্য ভবিতব্যের অরণ্যানীর মধ্যে! মাল্‌কা কখন্ যে তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছেন, কিছুমাত্র মনে পড়ে না আমার।

এলোমেলো হাওয়া শান্ত হয়ে যেতে আরও কিছু সময় লেগেছিল; তার সব কথা মনে নেই; কারণ, আমার মন চলে গিয়েছিল ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে! চমক্ ভেঙ্গে গেল গহ্‌রের প্রতি বাবুজীর তিরস্কার শুনে। বাবুজী বল্‌ছিলেন, "তোমার কি রত্তিভর আক্কেলও ছিল না? ফৈয়াজ্ খাঁ পুরাণা খান্‌দানী ঘরানার ছেলে। মান-ইজ্জৎ বলতে ওদের একটা আলাগ্ হক্ আছে, খাস্ তাজিম্-তক্‌রিম আছে। আর, আমি থাকতে তোমার কি অখ্‌তিয়ার এসে গেল যে, তুমি ওকে গান করতে বলো? আমি বল্‌তে পারতাম্ না? মাল্‌কা অনুরোধ করতে পারত না? আমি যে ওঁকে গানের কথা বলিনি, কেন বলিনি, বুঝবার মত আক্কেল আছে কি?"

বাবুজীর কথা শুনে আমরাও নিজেদের অপরাধী মনে করছিলাম। অত বড়ো একটা গাইয়েকে দিয়ে আমরা গজল্ গাইয়ে নিয়েছি! অবশ্য তাঁর পরিচয় জানা ছিল না, এই রক্ষা।

গহ্‌র মাথা নীচু করে বাবুজীর তিরস্কার শুনে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল আমার, যেন আশীর্বচনই গ্রহণ করছিলেন গহ্‌র। দূর্বাঘাসের ডগায় এক পস্‌লা জলের কতটুকুই বা পড়ে; আর তাতে কি-ই বা হয়! দূর্বার প্রকৃতি ত বদ্‌লায় না। বরং, বর্ষণের আঘাতে নুইয়ে পড়াটাই তার পক্ষে মস্ত লাভ, মস্ত গৌরব।

বাবুজীই বল্‌লেন—"ওঁকে নিয়ে জলসার বন্দোবস্ত করলেই উনি মনে করতে পারেন, আমরা হয় ত ওঁর সঙ্গে মৌজ্‌দিনকে লড়িয়ে দেওয়ার মজা

ওঠাতে চাই। আরে, ছী ছী! তা কি আমি কখনও হ'তে দেব আমার বৈঠকে! বা দুলীচাঁদের বাড়িতে? হায় রে জগ্দীপ," বলে বাবুজী নীরব হয়ে গেলেন। দেখলাম আমরা, বাবুজী কোঁচার খুঁট তুলে নিয়ে চোখের কোণ দু'টি পরিষ্কার ক'রে নিলেন।

সে মুহূর্তে আমিও বুকের মধ্যে কাঁটা ফোটার মতো একটা কিছু অনুভব করেছিলাম। তখন সেটা বেদনাই ছিল। কিন্তু মধুর সে বেদনা; নয় ত আজও স্মরণে জেগে ওঠে কেন সে সব কথা?

পরের দিনের কিছু ঘটনা কিছু অভিনব পরিচয় স্মরণের জালে ধরা দেয়।

বৈকালে এলগিন রোড অঞ্চল থেকে ফিরে এস্প্লানেডের মোহনায় নেমেছি। শ্যামবাজারের ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। চমৎকার একটি সম্ভাবনার আশায় মন বিভোর; আর এক সপ্তাহকাল ফৈয়াজ্ খাঁ কলিকাতায় থেকে গেলে এমন একটি সঙ্গীত-নিকুঞ্জে তাঁকে নিয়ে যেতে পারব, যেখানে দঙ্গল বা রেষারেষির সম্ভাবনা নেই।

তখন মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের আরম্ভও হ'তে পারে। পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্রের সঙ্গে যেন ষড়্যন্ত্র করেই দু'চারটি উত্তরী বায়ু ঘুরতে ফিরতে চলে যাচ্ছে। অনুভবে মনে হ'ল, এ সব বসন্তেরই আগমনী বার্তা, আসলে। তবে শীতের ছদ্মবেশ একেবারে ছাড়তে প্রকৃতি লজ্জিত হচ্ছেন; অথবা এখনও উত্তরী বায়ের অঞ্চল উড়িয়ে আমাদের মন নিয়ে খেলা করতে ইচ্ছা করেন, লীলাময়ী তিনি। সদ্যসৃষ্ট আমার কল্পনাজালটি ঝিক্‌মিক্ করে উঠছিল সেই রৌদ্রে; দুলে উঠছিল সেই বাতাসের আবেগ নিয়ে; নূতন ক'রে বোনা মাকড়সার জালের মতো।

পশ্চিম দিকে ছোট পার্কের প্রতি দৃষ্টি যেতেই দেখি, তন্নুলালজী একটি বেঞ্চের উপর বসে রয়েছেন; ঠিক যেন একটি প্রবীণ উর্ণনাভ জাল ছেড়ে দিয়ে উদাস নিঃসঙ্গ বিশ্রাম উপভোগ করছে। তাঁর কাছে এগিয়ে চলল এই তরুণ মাকড়সাটি, মনের জাল গুটিয়ে নিয়ে।

আমি সবে যৌবনের পথে আগুয়ান হয়েছি। তিনিও প্রৌঢ়ত্বের সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে বার্ধক্যকে প্রবঞ্চিত করে এগিয়ে চলেছেন। সামনে অনতি-দূরে তিন-কুড়ির কালদণ্ডকে দেখেও তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়নি, কপালে অনুশোচনার রেখাপাত হয়নি, প্রাণের ছন্দ ও গতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। আমি যখনই তাঁর দিকে এগিয়ে যেতাম, তখনই তিনি সেই কালদণ্ডের দিকে

পিছন ফিরে চলে আসতেন আমার দিকে; মন্থর, কিন্তু অভ্রান্ত পদক্ষেপে; কারণ, অতীতের পথ ত তার কাছে সুপরিচিত। ভবিষ্যতের দিকে পিছন ফিরবার কায়দাটা তিনি জানতেন বলে কখনই পিছু হাঁটেননি।

যখনই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি, দেখেছি—তিনি তাঁর অতীত অভিজ্ঞতার অম্লান কুসুম নিয়ে প্রস্তুত আছেন, উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আমার তরুণ মন তখনি সে উপহারকে অনুভবের অঞ্জলিতে ধরে নিয়েছে। তখন যা ছিল স্নেহের, প্রীতির উপহার, এখন সেটা পরিণত হয়েছে মননের, স্মরণের ঋণে।

মনে পড়ছে সে-দিনের তন্নুলালজীকে; সেই বিরাট্ বপু, বিশাল বক্ষ, বিস্তৃত ললাটের আকারে প্রতিফলিত একটি মহাপ্রাণ। তন্নুলাল, শ্যামলাল, আর দুলীচাঁদ বলতে আমরা দেখতাম তিনটি তিন রকমের মূর্তি; কিন্তু বুঝতাম একটি মাত্র প্রাণ। সেই প্রাণের পরিচয় ছিল সঙ্গীতের অক্লান্ত সেবায়, আর অবকাশকালে বিদগ্ধ আলোচনায়।

তবুও বিশেষ করে তন্নুলালজীর চোখেই ছিল বাস্তবের ছবি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী; কথাবার্তার মধ্যে সেটা প্রকাশ পেত' সরস অথচ বলিষ্ঠ বক্তব্যের রূপ নিয়ে। তিনি যখন বৈঠকে উন্মুক্তহৃদয়ে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতেন, তখন তাঁর গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির মধ্যে বেজে উঠত যেন সুরবাহারে বৃদ্ধ-খরজের দু'চারটি মীড়দার সুর; ধনুর মতো বেঁকে উঁচু হয়ে উঠত তাঁর ভ্রূযুগল। তাঁর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম কখনও অতীতের, কখনও বা অনাগতের প্রতি একাগ্র সন্ধান; বর্তমান ত কবলিতই রয়েছে বজ্রমুষ্টির মধ্যে। তর্কের সময়ে দেখেছি, বাজ-পাখীর পাখনার মত সতর্ক উল্লাসে কেঁপে উঠত তাঁর নাসাপল্লব দু'টি; আমরা বুঝতাম, তাঁর মৃগয়া সার্থক হয়েছে। সঙ্গীতের অতবড় বস্তুবাদী অথচ চুলচেরা সমালোচক আমি আর দেখিনি। অথচ অলৌকিকের অবতারণা করার সময়ে তিনি বলতেন—অলৌকিক হলেই যে অবাস্তব হবে, এমন কি কথা আছে!

তাঁর নিকটে যেতেই তিনি বললেন—"চলুন। হেঁটে ফেরা যাক। বসে হাওয়া খাওয়া বাতের রোগীর সহ্য হয় না।" তন্নুলালজীর ডান হাঁটুতে পুরান বাতের সঞ্চয় ছিল; খুব ক'রে হেঁটে বেড়িয়ে তিনি ভালই ছিলেন বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত।

আমার আশা ভরসার গল্প করতে করতে যখন চৌমোহনা পার হয়ে

ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে চলেছি, তখন পাশে রাস্তার দিকে হঠাৎ নজরে দেখি, গাড়ীর দঙ্গলের মধ্যে মন্থরগতিতে একটি ফিটন্ চলেছে পূর্বদিকে, আর তার মধ্যে বসে আছেন মাল্কা ও ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব! তাঁদের পায়ের কাছে ফলফুলুরীর চুবড়ী। খাঁ সাহেবের গায়ে কালো রংএর কোট, মাথায় কালো রংএর টুপী। মাত্র দাড়ি নেই বলেই তাঁকে মোল্লা সাহেব ব'লে ভ্রম হয়নি। তন্নুলালজীকে তাঁদের কথা বলতে না বলতেই দেখি, তাঁরা আমাদের লক্ষ্য করে কাছে ফুটপাথের পাশেই গাড়ী থামিয়েছেন। প্রসন্ন পরিচয়ের মুখে নমস্কারের বিনিময় হ'ল। গাড়ীতে বসেই মাল্কা বিনীত অনুরোধ জানালেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন, বাঁসবাবু। গাড়ী থেকে নীচে নামা খুব মুশ্কিল। খাঁ সাহেব আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে পছাঁও রওনা হচ্ছেন। যদি বিশেষ কাজ না থাকে, আর তক্‌লিফ না হয় ত আপনারা আমার বাসায় এসে পদধূলি দিলে মেহেরবানি মনে করি। যদি অনুমতি করেন, এখন বাসায় যেতে পারি আমরা।" তন্নুলালজী বললেন, "হা হাঁ। আপনারা চলে যান। আমরা ঘুরতে ফিরতে পৌছিয়ে যাব। আদাব, আদাব।" তন্নুলালজির ডাক-নাম ছিল 'বাঁস'বাবু। যৌবনে শখের খাতিরে পশ্চিমা বাঁসলি বাজাতেন। বাল্যাবস্থায় গহ্বর তাঁর নাম দিয়েছিল "বাঁসবাবু"। কীর্তি-কাহিনী স্তব্ধ হ'লেও শেষ বয়স পর্যন্ত পরিচিত মহলে ঐ নাম মুখরিত ছিল।

ফৈয়াজ্ খাঁ তা হ'লে আজই চলে যাচ্ছেন! আমার সুখকল্পনার জাল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হঠাৎ মনে হ'ল, ধর্মতলা ষ্ট্রীটে অত্যন্ত ভিড়; রোদের ঝিকিমিকিও নেই, শীতস্পর্শ বায়ুর চঞ্চল আবর্তনও নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রকমই ত হয়।

চলতে চলতে তন্নুলালজীকে বললাম, "কিছু মিষ্টান্ন উপহার নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। বাবুজী বলেছিলেন, গুণী লোকের সঙ্গে অন্তত প্রথম বার দেখা করতে গেলে কিছু মিষ্টান্ন বা ফল উপহার নিয়ে যেতে হয়।" তন্নুলালজী বললেন, "কথা মন্দ নয়। তবে এক্ষেত্রে বরং হগ সাহেবের বাজার থেকে ভাল দেখে দু'টি ফুলের তোড়া নেওয়াই উচিত;" বলে এমন কিছু যুক্তি দিলেন, যা একেবারে অকাট্য। যথা, খাঁ সাহেবকে ফল-মিষ্টান্ন দিতে হ'লে মাল্কাকেও আলাদা করে দিতে হয়। ভোজ্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা

পুরুষের চতুগুর্ণ, তা ছাড়া মাল্‌কার পোষ্যবর্গও আছে। কম করে দিলে বেথাতির হয়; ইত্যাদি বিচার করে তন্নুলালজীর কথাই থাকল। তখন আমরা মেডিক্যাল কলেজে শরীরতত্ত্বের চর্চা করছি। ঐ চারগুণ ভোজ্য কথাটি খুব মিথ্যা বলে মনে হয়নি। যে জাত সন্তানের মধ্যে তিনগুণ সঞ্চারিত করবে, সে যদি চারগুণ না খায়, তা হ'লে যে ঘরনী বলতে কোনও গুণই হাতে থাকে না। সে আবার শিবকে কোন্ গুণে বশে রাখবে! তাঁর সেবার ভার নেওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে! তার চেয়ে ফুল বিল্বদলই ভাল।

ফলকথা, মার্কেট থেকে পাতার বাহার দেওয়া রগরগে গোলাপের দুই তোড়া হাতে করে নিয়ে চললাম আমরা ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে, মাল্‌কার আবাসে।

এর পূর্বে শ্যামলালজীর সঙ্গে সেখানে কয়েক বার গিয়েছি। মাত্র তন্নুলালজীর সঙ্গে পদার্পণ এই প্রথম। গেটের সামনে এসেই তন্নুলালজী দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি দাঁড়ালাম, দু'হাতে দুই তোড়া; ছিনিয়ে নেয়, কার এমন সাধ্য।

মুখখানা গম্ভীর করে তন্নুলালজী বললেন, "এইবার নিজের গাল দুটি চড়িয়ে নিন; আর কাণ দুটিও মলে নিন দেখি।" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তার মানে?"

"মানে আছে বৈ কি!" তন্নুলাল বলতে লাগলেন, "বোকাদের জন্য আর চালাকদের জন্য। বোকাদের মানে—এরকম জায়গায় এসে গালে চড় দিলে, আর কাণ মলে নিলে মুখটা বেশ রঙ্গীন দেখাবে, কিছুক্ষণের জন্য! আর চালাকদের মানে—বোকা হওয়ার আগে-ভাগে প্রায়শ্চিত্তটা সেরে রাখা, নিজের গালে নিজে চড় খেয়ে, নিজেই কাণমলা দিয়ে। বুঝলেন না!" আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এতও বা জানেন আপনি! তা আমি রাজী আছি। কিন্তু হাত যে আমার জোড়া, হাতে ফুলের তোড়া।" তন্নুলালজী হেসে বললেন, "সাবাস পাঁচুবাবু! যাক্, হাত জোড় যখন করেছেন ফুল নিয়ে, তখন সব মাফ। চলুন ভিতরে যাই।"

নীচের তলায় অনুচরবর্গের মধ্যে একটি যুবক—মনে পড়ছে বিখ্যাত তবল্‌চি ন্যাটা আব্‌বুলের ভাইপো, নিজেও বাজিয়ে—সে এসে আমাদের নিয়ে গেল উপরে হল-ঘরের পাশে ছোট সাজান কামরায়। আমরা

উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাল্‌কা ও খৈয়াজ্ খাঁ এলেন। আসুন-বসুনের পালার অপেক্ষা না করেই আমি একটি তোড়া মাল্‌কার হাতে, অন্যটি ফৈয়াজ্ খাঁর হাতে দিলাম; আদাব করলাম দু'জনকে। দু'জনই আপ্যায়িত হ'লেন। মাল্‌কা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "এ নিশ্চয়ই বাঁস-বাবুর মতলব মুতাবিক! কী, আমি ঠিক বলিনি?" আমি বললাম, "বিলকুল ঠিক বলেছেন আপনি! উনিই বললেন, রঙে রঙ মিলিয়ে দিতে হয়।" খাঁ সাহেব খুব খুশী হয়ে বলে উঠলেন, "বহুত আচ্ছা, ডাক্টর সাব! খুব বলেছেন আপনি।" মাল্‌কা হাসতে হাসতে বলেন, "আপনারা সকলে দেখছি আমাকে না বানিয়ে রেহাই দেবেন না, আজ!" বানান'র অর্থ, কোনও সামান্য চরিত্রকে অতিরঞ্জিত করে বিদ্রূপের ঠাট্টা-তামাশার যোগ্য করে তৈরী করে নেওয়া।

কখন্ আমরা সোফায় বসে পড়েছি মনে নেই। মাল্‌কাই প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। বললেন, "খাঁ সাহেব, আপনি এঁকে তন্নুলালজীকে মনে আনতে পারছেন নিশ্চয়ই?" বলে কোনও এক জলসার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁকে। সেই জলসার কথা হয় ত খাঁ সাহেব মনে এনে-ছিলেন; কিন্তু তন্নুলালজীকে তাঁর মনে নেই, এটা বুঝতে পারলাম তাঁর চোখের ভাব দেখে। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "বড়ই তাজ্জবের কথা! এঁকে মনে করতে পারছিনে। আমি লজ্জিত হলাম। ওঃ হোঃ! কত দিনের আগের মামলা সে!"

মাল্‌কা ছাড়বেন না, তাঁকে লজ্জা থেকে মুক্ত করবেনই। বললেন, "সেই যে গহ্‌র, গহ্‌রের মা, আর আমি ছিলাম একদিকে; আর অন্য দিকে তেজনারায়ণজী, শ্যামলালজী আর ইনি এসে বসলেন, সিংজীর পাশে। কেন? আপনার মনে হচ্ছে না?" মাল্‌কার আগ্রহ দেখে খাঁ সাহেব কী আর করবেন! একটু চিন্তাকুল নয়নে চেয়ে থেকে বললেন, "হাঁ হাঁ। বেশক্ মনে পড়ছে এঁকে।" তন্নুলালজী ওরকম "বেশকের" অর্থ বুঝতেন। মাল্‌কাও বুঝলেন। প্রসঙ্গের মধ্যে যেটা কিছুই মনে পড়ছে না, অথচ মনে না পড়াটা লজ্জাকর, সেখানে আমরা বলি, "নিশ্চয়ই। সে আর বলতে!" যাক, মাল্‌কা ও রাস্তা ছাড়লেন।

তন্নুলালজী স্বভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "খাঁ সাহেব! আপনি ঘরের ঝাণ্ডা কলকাতা শহরে কবে তুলে ধরবেন?" অর্থাৎ খাঁ সাহেব ত

জলসা না করেই চলে যাচ্ছেন। ফের কবে এসে কলিকাতাবাসীদের গান শোনাবেন, এই হ'ল প্রশ্ন। সামান্য উপক্রমণিকা মাত্র, যা না হ'লে নূতন রাস্তা খোলা যায় না।

কথাটি শোনা মাত্রই দেখি, খাঁ সাহেবের মুখ হর্ষে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে গেল যেন। অপলক নেত্রে তন্নুলালজীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তিনি হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। পুরানা কায়দায় সামনের দিকে ঈষৎ নত হয়ে বার দুই তস্‌লিম জানিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি বললেন, "শেঠজি! আমার ফরামোশী ঔর গফ্‌লত্‌ মাফ করুন (বিস্মরণ জন্য অবহেলা ক্ষমা করুন)। এখন আপনাকে খুব মনে করতে পারছি। আপনি তেজনারায়ণজীর ডাইনে বসেছিলেন, ভগবান্ তাঁর আত্মার শান্তি করুন। আপনি তাঁরই জবানের হুকুমৎ ফের জারি করলেন আজ! আর আমার ইয়াদ্‌কেও পুরাপুরি জাগিয়ে দিলেন। আহাঃ হা! কী সব দিনই না এসেছিল! আর চলেও গেল!" বলে উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মাল্‌কাও যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তখন। হয় ত অতীতের কোনও কিছু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে বর্তমানের কোল থেকে।

খাঁ সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তন্নুলালজী উঠে তাঁর হাত ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলেন সোফার উপরে। মাল্‌কা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। খাঁ সাহেবের ভাবান্তর দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি। ভাবছিলাম, ইনিই না সে দিন গহ্‌রকে উপেক্ষার কশাঘাত করেছিলেন! আর ইনিই আজ কোন্ পুরানা দিনের কী একটা মুখের কথা মাত্র স্মরণ করেই আত্ম-সমর্পণ করে ফেললেন! কোন্ অতীতে কোন্ তেজনারায়ণজীর মুখ থেকে কী একটা হুকুমৎ জারি হয়েছিল; আর আজ এখন তন্নুলালজী নাকি ফের সেই হুকুমৎ জারি করলেন। অমনি অতীত এসে পড়ল বর্তমানের মধ্যে! মুখ ত গ্রামোফোনের চোঙ্গা, আওয়াজ খালাস করাই তার কাজ। কিন্তু সেই কথাটি না জানি কত সঞ্জীবনী সুধায় ভরা!

তন্নুলালজী মনখোলা সুরে বল্‌লেন, "সত্য বলুন ত খাঁ সাহেব ও রকম কথা জীবনে কতবার শুনেছেন!" খাঁ সাহেব মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "কী সুন্দর কথাই আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আজ! খোদার

কসম্, ন তো তেজনারায়ণজীর মতো কথা শুনেছি, ন তো শ্যামলালজীর মতো কথা আর কেউ বলেছে আমাকে এ পর্যন্ত," বলে' বোম্বাই, আগ্রা, মহীশূর, আরও কতো শহরের গুণগ্রাহকদের কত কী প্রশংসা করে গেলেন। শেষে বল্‌লেন, "কিন্তু তেজনারায়ণজী আর শ্যামলালজীর মত' দিলকা-খবর-লেনেওয়ালা ত দেখলাম না আর।" এর পরে দেখা দিল বৈঠকী হাওয়ার মামুলী রীতি। ছোট ছোট খবর উড়ে আসে, চলে যায়, আকন্দ তুলোর উড়ন্ত চুলের মত। মোটের উপর বুঝলাম, গুণীদের নিজস্ব সুখ-দুঃখের চুবড়ির মত' একটা দিল্ আছে। সে ত সকলেরই আছে। যারা পরস্পরের চুবড়ীর খবর নেয়, তাদের বলি বন্ধু, সুহৃৎ, এইমাত্র।

এ কথা সে কথার পর তন্নুলালজী বর্তমানে ফিরে এসে বল্‌লেন, "লেকিন্ আমার কথার জবাব দিলেন না ত আপনি। কল্‌কাতা শহরে ঘরের ঝাণ্ডা তুলবেন কবে? এরকম হোন্‌হারির মধ্যে কতদিন বেঁচে থাকতে হবে আমাদের? পশ্চিমের আফ্‌তাব্ কি পূবে ঘুরে আসবে না?" হোন্‌হারি অর্থ সম্ভাব্যের প্রত্যাশা। সকলেই আশা করে, পশ্চিমের সূর্য ঘুরে পূর্বে উদিত হ'ন। ফৈয়াজ্ তখনও পশ্চিমের আফ্‌তাব্।

ও কথার মধ্যে হয় ত একটা শ্লেষও ছিল। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মহীশূর প্রভৃতি শহরে সূর্যের যতই নাম হক, বিশেষণের যতই ঝঙ্কার উঠুক, পশ্চিমের সূর্য থেকে পূর্ব দিকের সূর্যেরই সম্মান বেশী। বাংলায় কল্‌কাতায় এসে সুনাম অর্জন করতে না পারলে যেন মন ভরে না, অন্ততঃ তন্নুলালজীর। সম্ভবত এই শ্লেষটুকু বুঝতে পেরে খাঁ সাহেব চুপ করে ছিলেন, আর কথা শুনে যাচ্ছিলেন।

তন্নুলালজী আবার বললেন, "এই দুই ডাক্তারবাবুকে ত আপনি ঘায়েল করেছেন মাত্র একটা গজল শুনিয়ে। তবুও ত এঁরা আপনার ঘরের লিহাজ্ (গানের দৃষ্টিভঙ্গী) আর লড়ী আর ঠোক্‌দার তানের স্বাদ পাননি; পেলে না জানি কি হত! কল্‌কাতায় সুরের নাম করে কতই না কুদ্‌না-পিট্‌না হচ্ছে, আর আপনি চুপে-ছাপে পশ্চিমে বসে আছেন। এ ত ভাল কথা নয় খাঁ সাহেব!"

খাঁ সাহেব বিনয়ের সুরে উত্তর দিলেন, "শেঠজি, আপনি যা বল্‌লেন,

সবই ঠিক। কিন্তু আমার মন চায় না খামখা দঙ্গলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমাদের ঘরের সে রকম লিহাজ্‌ও নয় আপনি ত জানেন। আর এও খেয়াল করুন, খোদার যখন মর্জি হবে, তখনই কলকাতা শহরে আমার ঘরের ঝাণ্ডা উঁচু হয়ে দেখা দেবে। আরও—সাচ্‌-মুচ্‌ ত বলুন আজকাল জেনানা-দের গানের রং ঔর জোশ্‌ (উন্মাদনা) বেশী নয় কি? মর্‌দের গান, পাল্লাদার আওয়াজ আর তানতর্‌কীবের সমজদারী কি আছে, সে কালের মত?" বলতে বলতে আড়চোখে চাইলেন তিনি মাল্‌কার দিকে।

মাল্‌কা পাশেই সোফায় বসে ছিলেন, নিরীহ শ্রোতা হয়ে এতক্ষণ। খাঁ সাহেবের কথার শেষ দিক্‌টা শুনেই সোজা হয়ে বসলেন তিনি, আহত অভিমানের ভঙ্গি করে; উদ্যত ভুজঙ্গের শোভায়। কুণ্ডলিনীর মতই যেন জেগে উঠল তাঁর কণ্ঠের ত্রিবলী। স্বভাবে নত, শান্ত হলে কি হয়! জাতটা যে আড়াই-পেঁচী কুণ্ডলিনীর!

স্থির দৃপ্তনেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন, "আপনারা খাঁ সাহেবের লড়ী ঔর ঠোক্‌কি তান শুনতে চাচ্ছিলেন? এই নেন, শুনুন এঁর ঠোক্‌ আর লড়ীর নমুনা! বাঃ বাঃ খাঁ সাহেব! কী সমঝ্‌-বুঝের কথাই বললেন আপনি! কেন? মঙ্গুবাঈ, জোহ্‌রাবাঈ, বনারসের সরস্বতী রাজেশ্বরী, হুস্‌না, আরও ন-জানি কত কে, এঁরা কি গাওয়াইয়া নয়? না কি গানা শেখেননি?" বলে একটু থামলেন।

মনে করলাম, প্রলয়েরই বুঝি সূচনা হল। খাঁ সাহেবের মুখে কথাটি নেই। কিন্তু গোঁফের প্রান্তে জমেছে হাসির ভাব। একটু আশ্বস্ত হলাম। সন্দেহ হ'ল, মাল্‌কা গল্প শুনতে শুনতে পাছে ঢুলে পড়েন সোফার উপরে, এই ভেবেই খাঁ সাহেব একটি বাক্যের খোঁচা দিলেন। তা যদি হয়, তা হলে খাঁ সাহেবের কৌতুকপ্রিয়তার বলিহারি দিতে হয়।

মাল্‌কার আবেগ শেষ হয়নি। বল্‌লেন, "ভগবান্‌ই জেনানার গলার সুর আর রং আর জোশ্‌ চড়িয়ে দেন, যখন তাঁর মর্জি হয়! তখনই লোকে সেটা পসন্দ করে। আপনার কথা আমি কিছুতেই মানব না। আর আপনারাও শুনবেন না এই আলস্‌সি লোকের কথা। ইনি নিজের গম্‌ নিজেই উঠাতে থাকুন। এঁকে কতবার বলেছি কল্‌কাতায় আসুন, দেখুন—বাংলা মুলুকে সমঝ্‌দারি আছে কি না। এঁর মুখে সেই এক কথা!

আর মাথার মধ্যে সেই এক ধন্ধা! কল্‌কাতায় গহ্‌র থাকে; ইনি তাকে বরদাস্ত করতে পারেন না! বাঁস্ বাবু বলুন ত, গহ্‌র কি সারা কলকাতা জুড়ে আছে? নাকি সে বাঘ্‌নি যে, লাফিয়ে পড়ে এঁকে খেয়ে ফেলবে? বলুন ত!" বলে অপাঙ্গের দৃষ্টি দিলেন খাঁ সাহেবের দিকে।

তবুও খাঁ সাহেবের উচ্চবাচ্য নেই। তন্নুলালজীর চোখের কোণে কুটিল কৌতুকের চোরা চাহনি দেখা দিয়েছে মাত্র।

মাল্‌কার মুখে গহ্‌র-বাঘিনীর কথা শুনেই মনে পড়ল—খাঁ সাহেবের অস্বাভাবিক আচরণ বাবুজীর বৈঠকে, যে মুহূর্ত থেকে গহ্‌র উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ওস্তাদ্ কালে খাঁ সাহেবের চরিত্র। এই ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব, এমন সুস্থ সৌম্য রসিক পুরুষ, ইনিও কি কালে খাঁর মতো বাতিকগ্রস্ত? মৃদুস্বরে খাঁটি বাংলায় তন্নুলালজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কালে খাঁর ভায়রা-ভাই নাকি ইনি?" তন্নুলাল-শ্যামলালজীরা পাকাপাকি রকমের বাংলা বুঝতেন; বাংলা বলতেও পারতেন এঁরা; তবে মাঝে মাঝে পশ্চিমা টান আর পেঁচমোড়া এসে পড়ত, কিছু উর্দুর বুক্‌নিও দেখা দিত এঁদের বাংলায়। মাল্‌কাও খাশা বাংলা বুঝতেন, তবে ভাল বল্‌তে কইতে পারতেন না। কিন্তু বাংলা টপ্‌পা গাইতেন সুন্দর।

মাল্‌কা তৎক্ষণাৎ আমার কথাটি বুঝে ফেলেছেন এবং যাকে বলে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলেন। মুখে রুমালও চাপা দিলেন শেষে। অবশ্য কালে খাঁ সাহেবের গহ্‌র-ভীতির কথা মাল্‌কার খুবই জানা ছিল।

তন্নুলালজী কিছু বলার আগেই ফৈয়াজ্ জিজ্ঞাসা করলেন মাল্‌কাকে, "মনে হচ্ছে যেন কালে খাঁ সাহেবের জিক্‌র হল?" জিক্‌র অর্থাৎ উল্লেখ। তা শুনে মাল্‌কা বেশী করে হাসতে লাগ্‌লেন। খাঁ সাহেব নিশ্চয়ই কালে খাঁ সাহেবের বাতিকের কথা জানতেন না। জানলে তিনিও হেসে উঠতেন; নয় ত বলা যায় না কি হত।

তন্নুলালজীই উত্তর দিলেন, "হাঁ, জি! ডাক্‌টরবাবু কালে খাঁ সাহেবেরই প্রসঙ্গ করলেন।" খাঁ সাহেব আমাকে প্রস্তুত হওয়ার অবসর না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—"কেঁও ডাক্‌টর সাব্! আপনি কালে খাঁ সাহেবের গানা শুনেছেন?" আমি বললাম, "জী হাঁ। লাহোরওয়ালা কালে খাঁ সাহেবের গান শুনেছি আমি। তাঁর গলার আশ্চর্য কারিগরিও শুনেছি,

গত বৎসর।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কোন্ সে আশ্চর্য কারিগরি, যা আপনি শুনেছিলেন?" আমি সরল মনেই উত্তর দিলাম, "খেয়ালীদের গলায় যত রকমের লিয়াকৎ (কৌশল) আছে, সেগুলি ত শুনেইছি, তার উপর, শুনেছি তাঁর গলায় অদ্ভুত সুরেলা লরজ্‌দার তান, যা আমি এ পর্যন্ত আর কাউকে করতে শুনিনি।"

বলতেই দেখি, খাঁ সাহেব আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে ঘাবড়ে গিয়েছি আমি। কী ভুলই না করলাম! গুরুজীদের মুখে একটা সাধারণ নীতির উপদেশ পেয়েছিলাম, যথা, খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত এক গুণীর সামনে অন্য গুণীর গুণপনা বয়ান করা উচিত নয়। ওরকম করার অর্থ—প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া, বর্তমান গুণীর ঐ গুণ নেই, এক কথায় বর্তমান গুণীর প্রচ্ছন্ন নিন্দাই করা হ'ল। এবং নিজের আহম্মকি জারি করাও হ'ল ভাবের ঘোরপাকে পড়ে। আমি এইমাত্র নীতির লঙ্ঘন করে ফেল্‌লাম; আহম্মক ত হয়েইছি। এখন উপায়? কাতর নয়নে তন্নুলালজীর দিকে চাইলাম, যার অর্থ—"বাঁচান, নইলে ডুবলাম।"

তন্নুলালজী কিন্তু কড়ে আঙ্গুলটিও এগিয়ে দিলেন না; হয় ত মজা দেখছিলেন, ডুবন্ত লোকটা হাঁচড়ে-পাঁচড়ে জল খেয়ে কূলে উঠতে পারে কি না। অগত্যা পাতাল দেখাই সাব্যস্ত করলাম, তথনই। বললাম, "খাঁ সাহেব! আমার কথার বে-আদবি মাফ্ করবেন। আমার কানে আপনার সুর আর মেজাজ যেমন ভাল লেগেছে, তেমন কালে খাঁ সাহেবের মুখে তানও ভাল লেগেছিল; হক্ কথাই বলছি। এখন, গজলের সুর আর লরজের তান একই কানে, একই মনে ভাল লাগাটা দোষ কি গুণ, আমি জানিনে। যদি দোষ হয় ত সেটা আমারই দোষ, আর যদি গুণ হয় ত এই তন্নুলালজী, আর মাল্‌কা বিবি, আর গুরুদের সঙ্গত-সুহবতেরই গুণ। আপনারাই আগুন জ্বালিয়ে দেন, আপনারাই নিবিয়ে দেন।" বলে চুপ করে গেলাম।

খাঁ সাহেবের মুখের ভঙ্গিমা দেখে মনে হ'ল, যেন পায়ের নীচে জমি পেয়েছি; ডুবতে হবে না আর। দেখি, খাঁ সাহেব মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছেন, আর মাথা নাড়ছেন। এতক্ষণে তন্নুলালজী সাড়া দিয়ে বললেন, "খাঁ সাহব্! ডাক্‌টরবাবুর কথার মত্‌লব বুঝলেন ত?"

খাঁ সাহেব প্রসন্ন হয়ে বললেন, "খুব ভাল করেই বুঝেছি, জনাব! তুই ডাক্‌ট্রবাবু মনে হয়, যেন তম্বুরার যোড়ীর তার! সুর ভালই বলছে, জওয়ারিও মোলায়েম বলছে! বাকি শুধু খরজ্ ঔর পঞ্চমের সাহারা। ত ফের তাও মিলে যাবে এঁদের।" তন্নুলালজী যেন তাঁর মুখের কথাটি কেড়ে নিয়েই বললেন, "তাও মিলেছে এঁদের। খরজ্ ত বদল্ খাঁ সাহেব, আর পঞ্চম ত শ্যামলালজী।"

খাঁ সাহেব বললেন, "খুবই খুশীর কথা সন্দেহ নেই। মগর্—কল্‌কাতা শহরে সৌখীন বাঙ্গালীবাবুর কানে যখন লরজের তানে খুব্‌সুর্‌তি (সৌন্দর্য) পৌঁছে গিয়েছে, তখন বাকি থোড়াই থাক্‌ল"; বলে একটু থামলেন। আবার বললেন, "লেকিন্ ডাক্‌টর সাব! আপনারা ত ডাক্‌টরি করবেন আখেরে। আপনারা কি গানা বাজনাও করবেন?"

খাঁ সাহেবের কথার ঢংএ চমৎকৃত হয়েছিলাম; কেনই বা হব না।

চট করে মাথায় একটা উত্তর তৈরি হয়ে গেল। বললাম, "জনাব! গান-বাজনা আমাদের হবে না, কোনও ভয় নেই আপনাদের! আমরা ডাক্‌টরি করব নিশ্চয়ই। খাস করে—যারা বেসুরা চোট্ খেয়ে তড়পাতে থাকে, তাদের কষ্টের আসানি করতে চেষ্টা করব। তার পর, যা হওয়ার হবে," বলে গম্ভীর হয়ে উপরে তাকালাম।

আমাদের ভাবী পেশার কথা শুনে তিনজনে একপশ্‌লা হেসে নিলেন। হায়, হায়! এখন ভেবে দেখি—পরের চিকিৎসা করব কি, নিজেকে বেসুর্ থেকে রক্ষা করতে গিয়েই জান্ পরেশান হয়েছে। জীবনের তম্বুরা ঘেরাটোপ দিয়ে সাজিয়ে রাখাই সার হয়েছে। এখন সাজ্-পোশ্ খুলতে দেখছি, তার বাজ্‌ছে অতি পুরাতন সুরে। মরচেধরা তার! বাজাতে সাহস হয় না; তবুও পুরান গুণীদের গুঞ্জনধ্বনি নূতন করে শুনবার লোভে একটু আধটু ছেড়ছাড় দিয়ে ফেলি, সেই অনাদৃত জীবনতম্বুরার তারগুলিতে। অতি সাবধানে রক্ষা করে চলেছি সেই পুরান মরচেধরা তারগুলি; সুরের খাতিরে নয়, স্মৃতির লোভে।

হারান কথার খেই তুলে নিয়ে মাল্‌কা বললেন, "কল্‌কাতায় এখনও কিছু বাকি থেকে গেল কিন্তু"—। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর দিকে চাইতে মাল্‌কা বললেন, "বাকি আপনার ঠোক্ ঔর লড়াকি তান! কবে সে সব

জারি করবেন, এও ত বলে দিয়ে যান। উমিদ্ (আশা) মাত্র নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব !"

"তক্‌দির (ঈশ্বরের ইচ্ছা) যখন পুরা হবে, তখনই এসে শুনিয়ে দেবো ; নিশ্চয় শুনতে পাবেন আপনারা" বলে খাঁ সাহেব যেন কথাটা বদলে দেওয়ার জন্যই বললেন, "শেঠজি ! আপনি অনুগ্রহ করে শ্যামলালবাবুকে আমার বহুত সেলাম জানাবেন। আর তাঁকে বলবেন, হঠাৎ আমাকে রওনা হয়ে যেতে হল জরুরী চিঠির কারণে। যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলাম না, এ অপরাধ যেন ক্ষমা করেন তিনি। আর বলবেন, কল্‌কাতায় এসে সব দিক্ দিয়েই সুখ-সুবিধা হয়েছে, আনন্দও হয়েছে ভগবানের কৃপায়। ফের যখন সুযোগ হবে, নিশ্চয়ই দেখা হবে তাঁর সঙ্গে আর আপনাদেরও সঙ্গে।"

বাবুজীর সঙ্গে ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেবের দেখা হয়েছিল আর একবার ; লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তখন থেকে দশ-এগার বৎসর পরে। তা থেকেও আট-নয় বৎসর পরে কলিকাতা-বাসীদের তক্‌দির (ভাগ্য) পুরা হয়েছিল, যখন খাঁ সাহেব কলিকাতায় সিনেট হলে সঙ্গীত অধিবেশনে গান আর তান, ঠোক্ আর লড়ীর বিচিত্র পরিবেশন করে শ্রোতাদের বিহ্বল করে তুলেছিলেন। শ্যামলালজী তখন স্বর্গে গিয়েছেন ; মাল্‌কা শিল্পজীবন থেকে অবসর নিয়ে নিভৃতে ধর্মজীবন যাপন করছেন। তন্নুলালজী তখন বেঁচে থাকলেও দুপুর রাতের জলসা বা শেষ রাতে কমাল্ উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। ননীর সঙ্গে খাঁ সাহেবের দেখা হয়েছিল মাত্র আর একদিন ; মহারাজ নাটোরের ভবনে খাঁ সাহেবের জলসা উপলক্ষ্যে মজ্‌লিসে। সে দিন আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম ; কিন্তু সে দেখা নামে মাত্র। অবশ্য ইং ১৯৩৪এর পর থেকে ১৯৩৯ (বা ৪০) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে খাঁ সাহেবের গান শোনার সৌভাগ্য বহু বার ঘটেছে।

খাঁ সাহেবের কথার সুরে বেজে উঠেছিল বিদায়ের আখেরী তান। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মুহূর্তের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল প্রথম দিনের ঘটনাগুলি, প্রথম পরিচয়ের প্রগাঢ় স্মৃতিগুলি। মনে পড়ে গেল ননীর মুখের শেষ কথাটি। খাঁ সাহেবকে বললাম—"খাঁ সাহেব ! আপনি আজ চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনার সুরের বাণ বিঁধে থাকল আমাদের হৃদয়ে। একে

আপনি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। আর সেই ডাক্‌টরবাবুর কথাটাও স্মরণ করিয়ে দেই। মাল্‌কা নামে দুনিয়াতে আরও লোক থাকতে পারে। কিন্তু 'আগ্রাওয়ালী' বলতে এই একটি বই দুটি নেই। আপনিও আগ্রার লোক; কিন্তু যাওয়ার সময়ে এঁকে টেনে নিয়ে যাবেন না, দোহাই আপনার।"

ননীকে স্মরণ করিয়ে দিতেই খাঁ সাহেব হাসি চাপতে পারলেন না। শেষে বললেন, "বাঃ জি বাঃ! সেই ডাক্‌টরবাবুর তান আপনি পুরা করে দিলেন, আজ! তাঁকে আমার আদাব জানাতে ভুলে যাবেন না। আর বলবেন, আমার কী এমন যোগ্যতা আছে এঁকে আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাই! আপনারা বন্ধুত্বের ডোরা দিয়ে এঁর নিয়ত্‌কে বেঁধে ফেলেছেন, কয়েদ্ করে রেখেছেন;" বলে মাল্‌কাকে নির্দেশ করে বললেন, "কেমন? আমি কিছু বে-আন্দাজ কথা বলেছি কি না, এঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমার কান শুনছিল খাঁ সাহেবের কথা; কিন্তু চোখ ছিল মাল্‌কার মুখের দিকে। অনুভব করেছিলাম, যেন সন্ধ্যার বিদায়-দিগন্ত থেকে কত কী অস্ফুট কাকলী ভেসে আসছে; কত কী অদৃশ্য রহস্য ঘটে যাচ্ছে দিন আর রাতের সন্ধিক্ষণে, আকাশ আর মাটির সঙ্গমস্থলে। মাল্‌কার মুখমণ্ডলে দেখেছিলাম প্রসন্ন কুতূহলের ছবি। কিন্তু চোখের পল্লব দু'টি কেঁপে উঠছিল ক্ষণে ক্ষণে, যেন গূঢ় অভিমানের আনন্দহিল্লোলে। নিরুপদ্রব সূর্যাস্তের শেষ রক্তিমচ্ছটাও যেন দেখেছিলাম তাঁর চোখের কাজলঘন প্রান্তদেশে। কিন্তু মাত্র অল্পক্ষণেরই জন্য।

অতিসমীপ বিহঙ্গের মধুর কলধ্বনির সুরে মাল্‌কা খাঁ সাহেবের শেষের ঠোক্ তানের জবাব দিলেন। বললেন, "আপনার হৃদয়ের আন্দাজ-বেআন্দাজ আপনিই জানেন; আমি ত তার হিসাব করিনে। হিসাবের কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, আপন নসীব্‌কেই জিজ্ঞাসা করুন, যিনি আপনাকে দু-চার রোজের জন্য এখানে পাঠিয়েছিলেন আর আপস্‌ও করিয়ে দিলেন, আজ। আমরা ত কেবল নিজেদের আন্দাজই জানি। কি বলেন, বাঁসবাবু!"

বুঝলাম দিনের শেষের সব খেলা, সমস্ত অভিমান পরাভূত হয়ে গেল এই সন্ধ্যার প্রশান্তির কাছে। দেখি, নরগিসের মত চোখ দুটি ভরে গিয়েছে

সন্ধ্যার নীলিমায়; নিরাবেগ মাধুরীর মধ্যেই যেন বিলীন হয়ে গেল হৃদয়ের কুঙ্কুমরাগ। সম্মুখেই রয়েছেন ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব; তবুও সে আকাশ থেকে সরে গেলেন তিনি সেই সত্যকারের বিদায়বাণী নিয়ে। সূর্য ডুবে গিয়েছেন সেই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে। অপূর্ব সেই বিদায়লগ্নে যেন প্রতিভাত হল মাত্র একটি সন্ধ্যাতারার নির্মল জ্যোতি; আপন প্রকাশেই যেন চিরতৃপ্ত, চিরসার্থক। পূর্বদিকের অরুণোদয়ের লগ্নে আর এঁকে খুঁজে পাইনি।

তন্নুলালজী কি ভাবছিলেন জানিনে। কিন্তু একটি কথার সূত্রে তিনি আমাদের টেনে নিলেন বাস্তব জগতে। মাল্‌কার কথায় যেন সায় দিয়ে তিনি বললেন, "খুব ঠিক বলেছেন মাল্‌কা। হিসাব-নিকাস্ আন্দাজ-বেআন্দাজ, সব আপন-আপন। এক্সচেঞ্জ ওর শেয়ার মার্কেটের কথা হয় সব গোপনে, বন্ধুর সঙ্গে। নইলে লোকসানি খেতে হয়।"

মাল্‌কার মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি গোপনে অর্থাৎ শ্যামলালজীর উপদেশের অপেক্ষা না করেই শেয়ার বাজারে চড়ি-মন্দি খেলায় ভাগ্যপরীক্ষা করতেন। আর লোকসান হলেই বাবুজীর কাছে অভিযোগ করতেন তন্নুলালজীর নামে; অর্থাৎ তন্নুলালজী আগেভাগে কেন সাবধান করে দেননি তাঁকে।

নারীচরিত্রের বন্ধুর নিম্নভূমিতে নেমে এলেন মাল্‌কা। চকিতের উৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যা ভাও বাঁস্‌বাবু? অর্থাৎ বৈকালের শেষ দর কত? তন্নুলালজীই এখানে একমাত্র সঙ্গী, মাল্‌কার। তিনি বললেন, "আঠ্-তিন। সাত বাজে বাদ ফের খবর দেবো" অর্থাৎ ফোনে খবর চলবে।

সত্যকারের বিদায় হয়েই গিয়েছে। তন্নুলালজী দু'চারটি কায়দাদুরস্ত কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও উঠলাম। তন্নুলালজীর আপত্তি সত্ত্বেও মাল্‌কা ও ফৈয়াজ্ নীচের গেট পর্যন্ত নেমে এলেন ও বিদায়ী আদাব জানাতে থাকলেন। আমরাও বিদায় নিলাম, আদাব জানিয়ে।

পশ্চিমের অভিযাত্রী সেই সূর্য আর সন্ধ্যা-গগনের সেই শুকতারাকে আর কখনও দেখিনি একসঙ্গে বাইরের আকাশে।

ফিরবার পথে তন্নুলালজীকে জিজ্ঞাসা করলাম দিল্লীর সেই জলসার কথা। বাংলা, হিন্দী আর উর্দুর বুনানীর উপর টীকা-টিপ্পনীর ফুলকাটা দিয়ে তিনি সেই জলসার কথা বিবৃত করেছিলেন, পথে চলতে চলতে,

আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে। সার কথা আর মজার কথা যা মনে লেগেছিল, তাকেই সন্ত্রম করে তুলে নিয়েছি স্মৃতির জালে। তন্নুলালজীর জবানীতেই বলি—

“আমেদাবাদের কংগ্রেস অর্থাৎ বার’ তের বছর আগেকার মামলা। হুজুগ-তামাশা দেখে শ্যামলাল, তেজনারায়ণ, আর আমি ফিরছি দিল্লী দিয়ে। সিংজীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছি। ধনী সৌখীন ইয়ারবকশ্ পুরুষ তিনি। আর যাকে বলে পয়লা নম্বরের তমাশ্বিন। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, দোমহল্লা, পুরানা ঢং-এর। আমাদের খাতিরে সিংজী নাচ-গানের জলসা দিলেন এক রাত্রি। গহ্র আর গহ্রের মা তখন দিল্লীতে ছিলেন। গহ্র আর দু’তিন জন বাছাই-করা তওয়ায়েফ্দের (নাচ ও গান করতে পারেন, এমন বাঈজীদের) নাচগান হল, ঠুমরী-গজল-দাদরার বাগিচা খুলে গেল, ফুল ফুটল রকমারী। সিংজী ছিলেন ঠুমরী গজলের সৌখীন, আর বিশেষ করে গহ্রের ভক্ত। গহ্র তখন গণপত্ রাও সাহেবের এলাকার মধ্যে পড়ে গিয়েছে, শ্যামলালের শাগির্দ্ হয়েছে। সে কাহিনী ত জানেন আপনি। যাক্, গহ্রের গানের জোশ আর চমক নিয়ে সারা হিন্দুস্থানে হল্লা উঠে গিয়েছে তখন। এমন কি, আসরে মৌজ্দিনের সঙ্গে লড়বার সাহসও এসে গিয়েছিল গহ্রের। মৌজ্দিনের কাছে হেরে যাওয়ার বড়াই সে আজও করে; শুনবেন একদিন তার নিজের মুখে। মোট কথা, সে রাত্রিতে গহ্রের রংই বজায় থাকল। মৌজ্দিন তখন কাশীতে ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে রয়েছে।

শ্যামলাল আর তেজনারায়ণ যেমন হুজুগে, তেমনি ছটফটে; তার উপর তাঁদের ছিল ধর্মবাতিক। তাঁদের পাল্লায় পড়ে কোথায় কোন্ পুরানা মন্দির আর সেকালের ইমারত দেখে বেড়াতাম আমি আর সিংজী। হয়রানের চরম হয়েছিল যে দিন আমরা হুড়তে-পুড়তে কুরুক্ষেত্র গিয়ে ফিরে এলাম মহাভারতের বিভূতি আর এখনকার পোড়ামাটির ধূলা গায়ে মেখে।

সিংজী হাপসে এসে পড়েই তাকিয়ায় ঠেশ দিলেন। বল্লেন, “মনের আর গায়ের ব্যথা মারতে আগে চাই হকিম্ সাহেবের সোনেচাঁদিওয়ালা ফওলাদ্ (সোনা আর রূপা-দেওয়া লৌহভস্ম) দোচার্ খোরাক্ কম্ সে কম্। আর শরবৎ দোচার্ বোতল কম্ সে কম্। পরেই চাই—সিরু্ফ্ আরাম দোচার রোজ—কম্ সে কম্। আর দোচার তওয়ায়েফ্দের নাচ-

গান, গহ্‌র কম্ সে কম্" ; অর্থাৎ গহ্‌র থাকতেই হবে। "কম্ সে কম্" বোলটা ছিল সিংজীর একচেটে ; রস দিয়ে আমোদ করে তিনি বোলটা ছাড়তেন খুব লাগ্‌সই। হকিম্ সাহেব ছিলেন সিংজী আর তেজনারায়ণের বিশিষ্ট বন্ধু ; যেমন রসিক, তেমনি বিদ্বান্। আর সেতারের আওয়াজ শুনলেই ঢুলানি আসত হকিম্ সাহেবের।

মোটের উপর সকলেই একমত। ফওলাদ আর শরবতের ফায়দা নেবেন না একমাত্র শ্যামলাল। শ'খানেক ডণ্ড-বৈঠক আর শ'পাঁচেক যোড়ী ঘুরিয়ে নিলেই নাকি তাঁর মনের হা-হুতাশ আর গায়ের বেদনা আরাম হয়ে যাবে। আর তেজনারায়ণেরও একটা চিমটিকাটা আপত্তি ছিল তওয়ায়েফ্‌দের জলসার বিষয়ে।

তেজনারায়ণ ছিলেন সেকালের যা কিছু ভারী মালের নিহায়েত শৌকীন, সমঝ্‌দার। অর্থাৎ তাঁর মতে বাড়ী হবে ত পাথরের ; তার চেহারা হবে ত কেল্লার মত ; তার উঁচাই হবে ত কুতব্‌মিনারের মতো ; নয় তো কি ? মেয়েদের গলায় সোনার কণ্ঠীর এক-একটি দানা হবে ওজনে ছটাকভর, নাচওয়ালীদের পেশোয়াজী ঘুঙ্গুর হবে পাঁচ-পাঁচ সের ওজনের ; নয় ত কি ? বলতেন তিনি, গান ত ধুরপদ-ধামার আর বিলমপদ আস্তায়ী। এক এক গানে হবে, এক এক ঘণ্টার মামলা ; নয় ত কি ? গাওয়াইয়া হবে ত খানদানীঘরের ; গলার আওয়াজ হবে ত পাল্লাদার, এক গাঁয়ের গান শুনবে পাশের গাঁয়ের লোক, ঘরে বসে ! নয় ত কি ? সাজ ত রবাববীণ-সুরশৃঙ্গার আর পাখাওজ ! এক কথায় তেজনারায়ণ ছিলেন যত বা পুরানা রিওয়াজের (রীতি-নীতির) তত বা পসন্দ না-পসন্দ বাতিকের লোক। যত বা সরল, তত বা তেজী, মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি ; মুখ থেকে একবার 'না' বেরিয়ে এলে সেটা আর কখনও 'হাঁ' বলে ঘুরে আসত না।

তেজনারায়ণের মুখে ও-ধরণের কথা উঠলেই সিংজী ফুটকী দিতেন, "কম্ সে কম্! কেঁও তেজনারায়ণজী!" একদিন বীণার প্রশংসা করতে তেজনারায়ণ বললেন, "আহঃ। বীণের সাস্ ঔর আওয়াজ যেন বর্‌খার দাদুরের মতো!" সঙ্গে সঙ্গে সেতারের কথা তুলে বললেন, "যেন ঝিঙ্গরের (ঝিঁ ঝিঁ পোকার) আওয়াজ, বিলকুল রুখাসুখা ; আর তার ভিতরে মালও নেই, সাসও নেই" (সাস্ অর্থ—বাজনার সুরের রেশ বা দম)। হকিম্‌জী

উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সেতারের বদনামটি হজম করে গেলেন। এ কথা সে কথার পর বিন্দাদীন্ কাল্কাদীনের ঘরের নাচের কথা উঠল, তার পুরানা তরিকার (ঢং, চাল) কথা উঠল, হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে হকিম্সাহেব তেজনারায়ণজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তেজনারায়ণজী! মনে করুন যদি হাথিকে নাচাতে হয় ত তার পক্ষে পেশোয়াজী পায়েল্ কত ওজনের হওয়া উচিত? এক এক মণ, না কি দশ দশ মণ?" বলে তেজনারায়ণের অলক্ষ্যে আমাদের ইশারা করলেন চোখ টিপে। আমরা হাসি চেপে বসে; দেখলাম, তেজনারায়ণ কিছু হিসেব করছেন। মুখে বিড়বিড় করে হিসাব করে তেজনারায়ণ বললেন, "না না, দশ-দশ মণই হওয়া উচিত! খুব সিধা হিসাব রয়েছে এর"—। বলতে যা দেরী; সিংজী চীৎকার করে উঠলেন, "কম্ সে কম্! ইয়েভি ত কহিয়ে তেজনারায়ণজী!" হাসির হল্লায় ঘর ভরে গেল; তখন তেজনারায়ণের চৈতন্য হয়েছে। কিন্তু এতই সরল তিনি! অপ্রস্তুত হননি। বললেন, "হাঁ হাঁ, বুঝতে পেরেছি। সেতারের নিন্দা করেছিলাম বলেই ত হকিম্সাহেব ফন্দাবাজী (চাতুরী) করলেন। তাতে হয়েছি কি! না হয় সেতারের কথাই বলব না আর!" বলে হকিম্সাহেবকে আদাব জানিয়ে অল্প হাসতে থাকলেন! কি সব দিনই ছিল! আর কেমন সব দিলদার লোকই বা ছিল, পাঁচুবাবু!"

বলে তন্নুলালজী থামলেন। আমি তখুনি বললাম, "কম্ সে কম্! কেঁও তন্নুলালজী!" শুনে তিনি হেসে বললেন, "কতকটা হয়েছে। তবে অভ্যাস করলে আরও ভাল হতে পারে।" তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কী জানি! সে দিন চলে গিয়েছে বটে। কিন্তু সেই মানুষরা হয় ত জন্মাচ্ছে অন্য চেহারা নিয়ে! দুঃখ করাটা কিছু নয়"—। পরে বলতে লাগলেন—

অবশ্য গান-বাজনা আর নাচের যথার্থ সমঝ্দারও ছিলেন তেজনারায়ণ, আর ঠিক সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে খাতিরের সম্বন্ধ ছিল ভাইয়া সাহেবের, মহম্মদ আলি খাঁ রবাবিয়া আর বন্দে আলি খাঁ বীণকার আর আগ্রার গোলাম আব্বাস্ খাঁ সাহেবের। তেজনারায়ণের মনের মত মাল বলতে আমরা বুঝতাম—পুরানা ঘরানার লিহাজ্-মিজাজ্ তরকীব (বস্তুর রূপ) দিয়ে তালা-বন্ধ গুদামের মাল।

তেজনারায়ণ বললেন, বুলবুলিদের লড়াই আর ভাল লাগে না; বরং ধুরপদ্ ধামারের জলসা হলে ভাল হত। তাঁর পসন্দী মাল কোথায়? কিন্তু তাঁর অপসন্দীকেও অমান্য করতে সাহস করলেন না সিংজী; কারণ, তেজনারায়ণই শেরা অতিথি। ফলে গল্পের মজলিসে মন দেওয়া ছাড়া আর কাজ থাকল না।

এমন সময়ে খবর এল, আগ্রাওয়ালী মাল্কা ও তাঁর মা এসে পড়েছেন দিল্লীতে। আরও এসেছে ফৈয়াজ্ খাঁ, গোলাম আব্বাসের নাতি, সেই ঘরের উঠন্ত গাওয়াইয়া। ফৈয়াজ্ তখন জওয়ান্ পাঠ্ঠা (তরুণ পালোয়ান); তেজী মেজাজ নিয়ে আপনাতে আপনি মস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটা আমরা জানতাম। শ্যামলালই সব কিছুর পাক্কা খবর রাখতেন; আর শোনা খবরকে তেড়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করার উৎসাহটা তাঁর ছিল চিরকাল।

নূতন খবর শুনলাম তেজনারায়ণের মুখে। বছরখানেক আগে বোম্বাইতে বড় বড় কলাবন্তদের মাইফেলে এই নওজওয়ান ফৈয়াজ্ ধ্রুপদ-ধামার-বিলম্পদ্ আর আলাপ শুনিয়ে খুব নাম আর ইজ্জত হাসিল (অর্জন) করেছেন। তেজনারায়ণ নিজে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। আর আগ্রাওয়ালী মাল্কা নবীন বয়সেই আব্বাস খাঁর ঘরের ভারীচালের ধামার আর বিলম্পদ্ খেয়ালে পাক্কা তালিম (শিক্ষা) নিয়েছেন। কদর্দান লোকেরা তাঁর নামের সঙ্গে আগ্রাওয়ালী বলে খাস পহচান্ (বিশেষণের চিহ্ন) জুড়ে দিয়েছে। তার উপর ঠুমরী গজলের রঙ্গীলা গানও শিখেছেন তিনি; না হলে তওয়ায়েফ্দের মধ্যে একজন হওয়াই যায় না, ইত্যাদি করে তেজ-নারায়ণ বল্লেন আমাদের। সিংজী বল্লেন, "হাঁ হাঁ, কম্ সে কম্; ত মাল্কাজানকেই একটা মুজরা (নাচ-গান পরীক্ষার মজ্লিস্) দিয়ে হিমায়েত্ (পোষকতা) করা যাক্। কী বলেন তেজনারায়ণজী? ফৈয়াজ্ খাঁর জলসা পরে হক, আলাদা করে?"

আগ্রাওয়ালীর মা তেজনারায়ণের পরিচিত। আব্বাস খাঁ সাহেব, তাঁর ঘরের বিদ্যা আর কাজ-কারবার তেজনারায়ণের পসন্দের জিনিষ। তেজ-নারায়ণ খুশির সঙ্গে রাজি হলেন। খাস্ করে—নূতন বিদ্যাধরী কন্যাটিকে সমাজে সমঝ্দারের মধ্যে জাহির করাটাও সব দিক দিয়ে শোভন হয়। ফৈয়াজ্ খাঁর নামওয়ারি (খ্যাতি) বেশী; তার গান পরে হলেই যেন ভাল।

শ্যামলালেরও ইচ্ছা—মাল্কার গান হোক আগে, অন্ততঃ এক রাত্রির জন্য ; তবে সে রাত্রিতে মাত্র মাল্কারই গান হোক, অন্য কারুর নয়।

অবশ্য সে জলসাতে অন্য দু'চার জন বাঈজীর নিমন্ত্রণ হল ; তেজনারায়ণ নিজেই বল্লেন, অন্যেরা শুনুক এসব বে-নজীর, মাল্দার চীজ, তাদের চোখ-কান খুলে যাবে। ফৈয়াজ্‌কে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন তেজনারায়ণজী। সিংজী বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করলেন গহ্‌র আর তার মাকে। গহ্‌র উপস্থিত থাকতে বড়ঘরের জলসায় গহ্‌রের নিমন্ত্রণ না হলে সেই ঘরেরই বদনামী হত, গহ্‌রের এত নাম তখন।

মজলিসে মাল্কা গান আরম্ভ করলেন সেকালের গম্ভীর কায়দায়, তম্বুরা কোলে নিয়ে। দুদিকে বসল সারেঙ্গীয়া দু'জন, আর পিছনে তবলচি। আগ্রা-দিল্লীর সারেঙ্গী আর লক্ষ্ণৌর তবলার বাজ্! এদের তুলনা দেখলাম না এখনও পর্যন্ত। মাল্কা শুরু করলেন ধামার দিয়ে"—।

কথায় বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বলেন কি! মাল্কা গাইলেন তম্বুরা নিয়ে! তাও আবার ধামার?"

তন্নুলালজী বললেন, "হাঁ জী, হাঁ। সেকালকার সেরা বাঈজীরা ওরকম গান ত শিখতেনই ; এমন কি, আসরে এক-একখানা ধ্রুপদ-ধামারও গাইতেন, সর্বপ্রথমে। কিছু না হোক, বাদশাহী আমলের ইজ্জতের সেলামীর মতো। কেন? আপনি ভুলে গেলেন? এই ত সে দিন চৌধুরান্ ধামারে নাচ দেখালেন, আর আপনি ত নিজেই দেখলেন!"

সত্য কথা! ওল্ড্ বালীগঞ্জ অঞ্চলে মল্লিকদের বাগানবাড়ীতে নৃত্যপটীয়সী চৌধুরান্ বাঈজীর নাচ দেখেছিলাম। সে নাচ ছিল ধামারের লহরার সঙ্গে বাঁধা, তার বিষয় ছিল হোলির উল্লাস। সঙ্গত্ করেছিলেন স্বয়ং আবেদ্ হুসেন খাঁ সাহেব। আবেদ্ হুসেন খাঁ সাহেব সেই ধামারের 'উঠান্' অর্থাৎ আরম্ভিক প্রবন্ধবিশেষ শিখিয়েছিলেন কাশীর বীরু মিশ্রকে, আর পরে শিখিয়ে গিয়েছেন কল্কাতার হীরু গাঙ্গুলীকে। এঁদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। তবে মনে হয়েছে, দু'জন যেন বাঁকের কলসী, কেউ কম নয়, কেউ খালি নয়। মহারাজ নাটোরের বাড়ীতে বিশেষ করে বীরুর জন্য জল্সা করা হয়েছিল একবার ; ফরমাইশ্ করে শুনেছিলাম সেই ধামারের বিচিত্র উপোদ্‌ঘাত আর লহরীলীলা। আর হীরু ভাইয়ের কাছে

ত শুনেইছি পরে। কিন্তু আজ চোখের সামনে ত এমন কাউকে দেখিনে, যিনি ধামার নেচে ইজ্জ্‌ত কামাতে পারেন। চৌধুরানের নাচ প্রথম বার দেখেছিলাম ইং ১৯১৪ সালে; তখন তিনি বয়সে শ্যামলালজীর সমান, চাই কি কিছু বড়োই হতেন! চৌধুরানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধামারের নাচ কিম্বদন্তীর পথে পদার্পণ করে থাকে, তা হ'লে এই ক্ষণিক স্মৃতি দিয়ে তাকে বিদায়ী নমস্কার জানাই।

তন্নুলালজী বলতে লাগলেন, "চৌধুরানের পক্ষে ধামারের নাচা সম্ভব হলে, কুড়ি-বাইশ বয়সের মাল্‌কার পক্ষে ধামার গাওয়া আশ্চর্য কী? আপনি কি মনে করেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে নাচটা সহজ, আর গানটা কঠিন?" আমি বললাম, "তা নয়। তবে মাল্‌কা ধামার আর তম্বুরার রাস্তা ছাড়লেন কেন?" তিনি বল্‌লেন, "তার কারণ আলাদা। সে কথা হবে আর একদিন, মাল্‌কারই সামনে। এখন তাড়াতাড়ি করলে চল্‌বে না"। আমি বললাম, "আচ্ছা, আচ্ছা। তাই হবে। আপনি বলুন।" তন্নুলালজী বলতে লাগলেন—

"সুরিলা মাজা গলা, তার উপর হোরিধামারের বাঁট, আর ঢোঁড়ন্‌ আর মোঢ়ন্‌ আর লচাও; খুবই ভাল লেগেছিল আমাদের কাছে মাল্‌কার গান আর তালিম্‌। পর পর দু'খান ধামার গেয়ে বেশ করে সুর জমিয়ে নিয়ে মাল্‌কা ধরে দিলেন "গারা"র বিলম্‌পদ। গলায় যদি সুর কায়েম অবিচলিত থাকে আর ঘষা-মাজা বাঢ়ত্‌-বহলাওবার (রাগ বিস্তারের কায়দার) যদি পরিপাটি থাকে, তা হ'লে বিলম্‌পদ আস্তাই দিয়ে একরকমের ধ্যান তৈরী হয়ে যায়। আপনি ত মাল্‌কার এখনকার গান শুনেছেন; এখন তার গানে পুরা বাহার খুলে গিয়েছে। তখনকার গান শুনে আমার ও শ্যামলালের মনে হয়েছিল, লতাটি তৈরী লক্‌লকে যতদুর হ'তে হয় হয়েছে গায়কীর গুণে, বাকি আছে ফুল ফোটার চমক্‌দারি। যাকে গানের 'চমক্‌' বলে, সেটার ঘাটতি ছিল, আমরা বুঝেছিলাম। চমক্‌ জিনিসটা অনুভব করা যায়, কিন্তু ব'লে বুঝান যায় না। গুণীর মনের অন্দরমহলে যখন আগুনের খেলা চলতে থাকে, তখন সেই রোশ্‌নির ঝলক্‌ দেখা দেয় গানের মধ্যে, গায়কীর মধ্যে। কতকটা মেঘের গর্ভে বিদ্যুৎ আর বাইরে ঘটাকারীর মাঝে মাঝে বিজলির চমক্‌; না দেখলে বুঝা যায় না। মাল্‌কার গান জমল

গায়কীর গুণে। তেজনারায়ণের আনন্দ হয়েছিল সমঝ্দারের আনন্দ; তার মধ্যে কিছু হয় ত স্নেহ, আর আত্মপ্রসাদও ছিল। আমরাও খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, তারিফ করতেও কসুর করিনি। পাঁচু বাবু! তখন গান শুনে তারিফ করেছি মাল্কার। আর এখন গান শুনবার জন্যে আগে থেকেই তারিফ করতে হয়! বুঝুন ব্যাপারটা।

পরে মাল্কা পর পর দু'খানি ঠুমরী গেয়েছিলেন; রঙ্গিলা কিন্তু হাল্কা। পুরানা চালের ঠুমরী আমার ভাল লাগে না। মাল্কার পক্ষে না গেয়েও উপায় ছিল না; কারণ, তওয়ায়েফ্ বলে কিছু পরিচয় দিতেই হবে। যাই হক্—মাল্কা ফের জমিয়ে নিলেন পর পর দু'খানা ভারী চালের গজল গান করে। গজল জিনিসটা খুব আজব্। ভাল গাইয়েদের মুখে পোড় খেয়ে যতো পুরানো হয়, ততই তার স্বাদ হয় পাকা; আর টকরস আর ঝাঁঝ মরে গিয়ে থেকে যায় শুধু তেজ্ (জ্যোতিঃ) আর তাবিশ (তাপ) আর মিঠাস্ (মিষ্টতা)। তার উপর সেই জিনিসটা যদি নূতন মুখ থেকে সুর আর মেজাজ্ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তা হ'লে ত কমাল্ বুঝতে হবে। আমরা শুনে শুনে বুড়ো হয়ে গেলাম। আমাদের কাছে নূতন গজলের টকরস আর ঝাঁঝ আর ফেনা তেমন ভাল লাগে না। তবে কি জানো, আসলে মালটা ভাল থাকা চাই। নইলে, ওরকম হাল্কা জিনিস যত পুরানো হবে, ততই তার স্বাদ হবে ক্ষারজলের মতো আর ঝাঁঝ হবে ভিনিগারের মত! মেজাজী সমঝ্দার লোকের পাতে দেওয়া যায় না, এই আর কি।

গজল গান করে মাল্কা আসরের মেজাজ বদলে দিলেন, তবিয়ৎ খুশ করে দিলেন, সব দিক্ দিয়ে। ঠুমরীতে যা কিছু ঘাটতি পড়েছিল, পুষিয়ে দিলেন। তারিফও উসুল করলেন যথেষ্ট। তেজনারায়ণ আগাগোড়াই খুশী; ঠুমরী জমেনি, তাতে কি হয়েছে! আমাদের কাছে সব ভাল, যার আগা-গোড়া ভাল, ধামার থেকে গজল পর্য্যন্ত। মাল্কা আরম্ভ করেছিলেন সন্ধ্যার একটু পরে; ছাড়লেন যখন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগার' হবে। বুঝলাম আমরা, তাঁর দম্ তৈরী হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার এখানেই শেষ হতে পারত; কিন্তু হয়নি। সকলেই খুশী হয়েছেন। কিন্তু খুশী হননি গহ্রের মা। সিংজীর অন্য ইয়ার্দের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে মতলব আঁটছিলেন, গহ্রকে দিয়ে লড়িয়ে দিলে কী মজাই না হয়!

ইয়ারেরা সিংজীকে ধরে বসল, গহ্‌রের গান না দিলেই হবে না। তামাসার লোভে সিংজী নরকে যেতেও তৈয়ার, এ ত সামান্য কথা। মাল্‌কার গান শেষ হ'তে না হ'তেই মতলব আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য ওরকমের মজলিসে অত তাড়াতাড়ি হাঁই ওঠে না। গান শেষ হ'তেই দঙ্গলী সভাসদেরা বলতে আরম্ভ করলেন—গহ্‌রের গান হোক। জলসার মস্‌রুর (উৎসব) ত সবে আরম্ভ করে দিলেন মাল্‌কাজান!

শ্যামলালজীর এ বিষয়ে কিছু অমত ছিল। কিন্তু তেজনারায়ণজীই সেটা মিটিয়ে দিলেন, বল্‌লেন—গহ্‌রও ত ধামার বিলম্‌পদ গাইবে, শোনাই যাক্‌ না তার গান। যাই হ'ক—না বলার মত অশিষ্টতা ছিল না তেজনারায়ণজীর। গহ্‌র চিরকালই তৈয়ার। মাল্‌কার সাথ্‌-সঙ্গতীরা সঙ্গত করবে? করুক! কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই গহ্‌রের। বরং গহ্‌রের সঙ্গে সঙ্গত্‌ করতে পেয়েছে, এইটেই হবে তাদের পক্ষে বলবার কথা।

গহ্‌র প্রথমেই একটি বাণ মারলেন,—দাঁড়িয়ে উঠে, নেচে, একখানি দরবারির তেরানা গেয়ে। আর তারই মধ্যে, সপাট্‌ দূনী আর ছুটতানের ফুলঝুরি উড়িয়ে"—

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে বাধা দিতেই তন্নুলালজী বল্‌লেন, "শুনবেন, শুনবেন। অন্তত হুস্‌না, বিদ্যাধরী আর গহ্‌র যদি বেঁচে বর্তে থাকে, আর আপনার অদৃষ্টে থাকে, তেরানায় নাচও দেখবেন, ভাঁও দেখবেন, আর তানও শুনবেন। সব কিছুই হয়, আর ভালও লাগে, যদি কাজের কাজী হয়, আর হিম্‌মত (সাহস) থাকে।" বলা উচিত মনে করি, ঐ তিনজন বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার সৌভাগ্য ঘটেছিল। তন্নুলালজীর কথায় নির্ভর করতে শিখেছিলাম যে দিন জিজ্ঞাসা করলাম বদল্‌ খাঁ সাহেবকে আর যে মুহূর্তে তিনি সে রকমের দু'খানা তেরানা শুনিয়ে দিলেন। তন্নুলালজী বলতে থাকেন—

"ঐ এক তেরানায় গহ্‌র যেন মাইফেলের চোখ আর কান নূতন করে শানিয়ে দিল। আর তার সঙ্গে মনে করুন, সেই চমক্‌, সেই বিজ্‌লির খেল, যা থাকলে মরা গানও জিন্দা তাজা হয়ে দেখা দেয় গুণীর গলায়! তার পর, আসরের মনটি কেড়ে নিতে যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু গহ্‌র এক থাবা দিয়ে নিল' ভাইয়া সাহেবের ঘরের ঠুমরী গেয়ে, আর বে-নজীর ভাঁও (চোখ মুখের ভাব) বাতিয়ে। এখনকার গহ্‌রের ভাঁও বতান'

দেখেছেন ত? বুঝে দেখুন ওর জওয়ানির আলম্ (কালোচিত রূপ লাবণ্য)! বুঝতে পারবেন কি না জানি না; কল্পনা করতে পারবেন। শিকারী চিতা দেখেছেন কি? দেখেন নি। তা হ'লে আর কি বলব বলুন! বাস্তবিক চিতার বল তেজ আর চতুরাই দিয়ে ভগবান্ গড়েছিলেন গহ্রকে। আগ্রা-ওয়ালী মাত্র ঠাট্টা করে বলেছিল, "গহ্র বাঘ্নি," কিন্তু সত্য কথাই বলেছিল সে। সেই জলসার ব্যাপার নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা হয়েছিল। তেজনারায়ণ নিজে স্বীকার করেছিলেন, তওয়ায়েফ্দের মধ্যে চমক্ যদি কারুর থাকে ত সেটা গহ্রের। আর তার বুদ্ধিরও বলিহারি। আগ্রা-ওয়ালী সে দিন নাচের কায়দা দেখায়নি, তেরানাও গায়নি, তার ভাঁও বাতায়নি। ঠিক এই তিনটির কসর (অভাব) পুরা করে দিয়ে গহ্র মেরে দিয়েছিল চোট্! এতেই মাইফেল ঘায়েল হয়ে গিয়েছে, মাল্কার রং বিগ্ড়ে গিয়েছে। ঠুমরীর পর গহ্র যখন গজল আর দাদ্রা চালিয়েছিল, তখন ত মরার উপর খাঁড়ার ঘা!

গহ্রের গান শুনে মাল্কার মা মুখ ভার করে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে দেখছিলেন তাঁর মেয়ের মুখের অবস্থা। আমি কিন্তু নজর করে দেখি, গহ্রের গানের লুৎফ্ (আনন্দ) আর দরদ্ই ফুটে উঠেছিল মাল্কার মুখে চোখে। যেমন পরিষ্কার আয়নায় চেহারা আরও পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। আরে পাঁচুবাবু! গানা বাজানা আর নাচ—এর মজা নিতে হ'লে চোখ বুঁজে বসে থাকলে ত হবেই না, এমন কি, গুণীর মুখের দিকে শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকলেও পুরা মজা হবে না। খোলা চোখে মাঝে মাঝে দেখ্তে হবে সেই ঝরণার ধারা সব কোন্ পাথরে ঘা খেয়ে কত আজব রকমের হীরা আর মোতির টুক্রা হয়ে ছিট্‌কে পড়ছে এদিক্ সেদিকে। তবেই ত তমাম্ উস্থল হবে!

কিন্তু অস্বস্তি ভোগ করছিলেন তেজনারায়ণ। সেটা চেপে রাখতে না পেরে সরল মনেই বল্লেন আমাদের, "অনর্থক মাল্কাকে চোট খাওয়ান হ'ল। বেচারা ছেলেমানুষ, ছল্বলের (ছলনা ও প্রগল্ভতার) কি জানে? কাজটি কি ভাল হ'ল?" আমরাও যে বুঝিনি তা নয়। তবে মনে আঁচ্ লাগেনি। মাইফেলে তৈরী হ'তে হবে চোট খেয়ে আর চোট দিয়ে; এতে দুঃখই বা কি, আর দুসরা রাস্তাই বা কোথায়? কিন্তু শ্যামলাল আর

তেজনারায়ণের মন ছিল নরম। শ্যামলালই বলে উঠলেন, "যা হওয়ার তা হ'ল। আমি আগেই বলেছিলাম, কেবল মাল্কারই গান হ'ক আজ। সিংজী বুঝলেন না।" সিংজীর মত টাট্ ত দু'টি ছিল না; গম্ভীর হয়ে বল্ল, "আমি ভেবেছিলাম, মাল্কার মুজ্রা কম্‌সে কম্! আমি কি জানি এ রকম হবে!" শ্যামলাল এক পাল্টা দিয়ে বল্লেন, "জানি সব। যা হয়েছে তা হয়েছে, তেজনারায়ণজী। এখন উপায় আর কি আছে বলুন।"

তেজনারায়ণ প্রকৃতিতে বীর, সরল; জিদ্ হলে আর ফেরা নেই। বললেন, একটা উপায় আছে। গহ্রের পরে ফৈয়াজ্‌কে গাইয়ে দিয়ে রং ফিরিয়ে দেওয়া; একটা চেষ্টা মাত্র। যদিও ফৈয়াজের জন্য খাস্ একদিনের জলসা ঠিক করা ছিল, তবুও তেজনারায়ণের মনের আবেগ মিটাতেই হবে। আমি বুঝলাম না, তাতে মাল্কার ইজ্জত কি এমন উঁচু হয়ে উঠবে। বরং ভয় হচ্ছিল, ফৈয়াজ্ যদি গায় আর রং জমাতে না পারে, কিছুই বলা যায় না— তা হ'লে তেজনারায়ণ হয় ত খাবেনই না সে রাত্রিতে! আসল কথা তেজনারায়ণের ইচ্ছা—মাল্কা ও ফৈয়াজের হিপাজতে ঘরানার যে ইজ্জত্ রয়েছে, সেই ইজ্জত্‌কেই বাঁচাতে হবে অপমৃত্যু থেকে। যাই হ'ক—সিংজী খুবই রাজী; কারণ, তখনও পর্যন্ত গহ্র মাইফেলকে হাই তুলবার অবসর দেয়নি; তার চেয়ে বড়ো কথা, মজা বাড়বে বই কম্‌বে না।

তখন গহ্র শেষ দাদ্রায় কয়েকটি নিরালা (স্বতন্ত্র, অতুলনীয়) আখেরী তান করে চলেছে। তেজনারায়ণ ফৈয়াজ্‌কে ডাকলেন তাঁর কাছে। ফৈয়াজ্ তেজনারায়ণকে খুবই জানতেন। মৃদু গম্ভীর বচনে তেজনারায়ণ বললেন, "আপন ঘরের ঝাণ্ডা নীচু হয়ে গেল, নজরে এসেছে কি? কিছু ত একটা করা উচিত?" ফৈয়াজ্ একটু উদাসভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "জনাব! আপনারা যেমন বুঝেছেন, আমিও তেমনি বুঝেছি। কিন্তু কিই বা করা যেতে পারে, এখন," বলে অন্য দিকে চাইল। বোধ হ'ল, ফৈয়াজ্ তেজনারায়ণের চোখের দিকে সিধা নজর করতে নারাজ।

খুব তেজী সুরে তেজনারায়ণ বললেন, "কেন? গহ্রের পরে তুমি আলাপ দিয়ে শুরু করে আবার ঘরের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরবে! পারবে না? মর্দ হয়ে?"

আমরাও আব্বাস খাঁর নাম ধরে সে কথায় সায় দিয়ে গেলাম। সিংজী

ছিল দঙ্গলবাজ। তিনি বোম্বাইয়ের কথা তুলে শেষে বললেন, "মাইফেলের পুরানা রং যদি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে ত এই পুরানা ঘরের নওজওয়ান! হাঁ, আর কেউ নয়!" কিন্তু ফৈয়াজ্‌কে রাজি করান যাচ্ছিল না। ভাবলাম, তার দলের বিশ্বস্ত দঙ্গলী ইয়ারেরা নেই বলেই না কি। ফৈয়াজ্ কিছুতেই তেজনারায়ণের চোখে চোখ মিলায় না। তার চোখ-মুখ যেন নির্‌মোহী (উদাসীন)। ফৈয়াজ্ বলল, "জনাব! মাফ্ করবেন। আজ জেনানার দঙ্গল। এর মধ্যে বসে তম্বুরা নিয়ে ঝগড়া করে গান গাইলে আমার বদ্‌নামী হবে। মাফ্ করুন। অন্য কোনও দিন সুযোগ পেলে দেখা যাবে।" এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, ছোকরা ভয় পায়নি ত? কিন্তু তার চেহারায় ভয় দেখলাম না। আর ভয় পেলে ত তাকে দিয়ে কাজই হবে না।

তেজনারায়ণের হৃদয়ে এসেছিল অনুভব, আর সাত্ত্বিক বুদ্ধি। ভগবান্‌ও বোধ হয় মজা দেখবার ইচ্ছা করে তাঁর মাথার মধ্যে নূতন এক চক্‌কর বুদ্ধি ঘুরিয়ে দিলেন। মনের আবেগে তেজনারায়ণ বললেন, "নিজের বদ্‌নামী বড়, না কি ঘরের বদ্‌নামীটা বড়? আর, এও ত একটু খেয়াল করো, ভাই, একটু বুঝে দেখ, মাল্‌কার প্রাণে কি রকম দহ্‌ন, কষ্ট হচ্ছে! ছেলেমানুষ বই ত নয় সে!" তেজনারায়ণ যেখানে ঘা দিলেন, সেটা অন্তরের সবচেয়ে গোপন কুঠ্‌রী, সবচেয়ে নরম জায়গা। ইজ্জতের কথা সেখানে তুচ্ছ কথা।

সত্যকারের মরদ্‌ই ছিল ফৈয়াজ্। ঐ এক ঘায়ে তার শিরদাঁড়া সোজা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল; তার ছাতি ভরে উঠ্‌ল এক নিঃশ্বাসে। মজ্‌বুৎ নজর দিয়ে তেজনারায়ণের চোখের দিকে চাইল সে। দম্ নিয়ে থাকল মুহূর্তের জন্য। পরেই বলল, "অব্ যো কুছ্‌ভি হো ময় পরবা না করুঙ্গা! জনাব! আপ-লোগোকে হিফাজ্‌তমে মেরা ইজ্জত্‌কো ছোড়্ দেতা হুঁ। মগর্ বাত্ ত এক হ্যায়, জনাব! আপ্ ঔর আপ্" বলে শ্যামলাল আর তেজনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপ্‌লোগ ইল্‌তিমাস্ (অনুরোধ) করেঙ্গে, ঔর ফর্‌মায়েঙ্গে ত ময় গানে বৈঠেঙ্গে; ন তো, ঔর্ কিসীকি খাতির ন করুঙ্গা, ইয়েভি ময় কহ্ দেতাহুঁ।" অর্থাৎ মাইফেলের মধ্যে সকলের সামনে শ্যামলাল আর তেজনারায়ণ, এঁরা দুজন তাকে অনুরোধ করলে সে গাইতে বস্‌বে, না হ'লে নয়। অন্যে অনুরোধ করলে খাতির নেই।

ইজ্জতের কথাটা জোর করে দাবিয়ে যখন ফৈয়াজ্ ভারি গলায় ঐ কথাগুলি

বলল, তখন তার মুখ থেকে সেই উদাস ভাব চলে গিয়েছে। এমন একটা ভাব এসেছে, যা বর্ণনা করা যায় না ; কিন্তু একবার দেখলে চিরকাল মনে থাকে। অবাক্ হয়ে সেই মুখের দিকে, সেই চোখের দিকে চেয়ে ছিলাম আমি। বিশ-বাইশ বছরের তেজি দিল্। তার মধ্যে চলছিল লড়াই ! এক-দিকে মান-ইজ্জত্ বলতে যা কিছু ; আর অন্য দিকে সচ্চা আশ্ক (বিশুদ্ধ প্রেম) বা শিভাল্রি যাই বলুন। সেই লড়াইয়ের আগুন ঝলক্ দিচ্ছিল তার চোখে মুখে। তখনও ভিতরকার সেই খেল্ মিটেনি। শ্যামলাল আর তেজনারায়ণই সেই রোশ্নিতে ধরা পড়েছিলেন, আমরা নই। এই একটু আগে মাল্কার বাড়ীতে ফৈয়াজ্ প্রথমে আমায় চিন্‌তে পারেননি ; তার কারণ, সেই সেদিনকার ফৈয়াজের চোখের আলোয় আমি ছিলাম না। সে জন্যই ত আমি তেজনারায়ণের জবানী সেই ঝাণ্ডা তোলার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেখছিলাম, সেদিনের সে সব কথা তার মনে পড়ে কি না ; সেই ফৈয়াজ্ এখনও আছে কি না। দেখলাম, সেই ফৈয়াজ্ই আছে আজও, আর আছে বলেই আমার পুরানা ইয়াদ্ ছবির মত দেখতে পাচ্ছি।

ফৈয়াজের কথা শুনে তেজনারায়ণ খুব খুশী হয়ে বললেন, "এই ত পুরুষের মত কথা ; ন্যায্য কথা। তাই হবে। যাও, এখন বসোগে নিজের জায়গায়" ; বলে একটি পান তুলে দিলেন তার হাতে।

যাদুবন্দির মত ফৈয়াজ্ কিছুক্ষণ ছিল পান হাতে করে। পরে আদাব করেছিল। দেখি, তার চোখ-মুখে একটা নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার ভাব এসে পড়েছে ; হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গিয়েছে যেন। সেই যে একটা শের (কবিতা) আছে—

ইস্ ইশ্কৃকে মথ্তব্মে মিল্তা হ্যায় সবখ্ পহলে।
গর্ বস্ল্‌কি খ্বায়িশ্ হো তো হস্তীকো ফনা কর না॥

তার চোখের মুখের রেখার মধ্যে যেন ঐ কথার জলন্ত নক্শা দেখলাম। যার মানে, "প্রেমের এই পাঠশালাতে সর্বপ্রথম পাঠ এই নিতে হবে যে, যদি মিলনের প্রত্যাশা করো, তবে নিজের বলতে যা কিছু অস্তিত্ব, মমত্ব, সব কিছু মিটিয়ে দিতে হবে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে"—বলে তন্নুলালজী একটু চুপ করলেন।

তন্নুলালজীর শেষের কথাগুলি আমার মনের গহনে গিয়ে ফিরে এল কতকগুলি সংশয়ের প্রতিধ্বনি নিয়ে। গ্রে-স্টার্লিং প্রভৃতি এনাটমি-ফিজিও-লজির ব্যাস-বাল্মীকিরা যে চোখের কথা বলেছেন, তারই মধ্যে জ্বলে ওঠে সচ্চা আশকের আলো! আমরা ঐ ব্যাস-বাল্মীকির শ্রোতা তখন। কই! এঁরা ত সে রকম শিখা বা জ্যোতির কথা বলেন না! অবশ্য একরকম জ্বালানি-পোড়ানির তত্ত্বকথা এঁরা বলেন বটে। আহার-বিহার-মৈথুনের আগুনে দেহে এনাবলিজম্-কেটাবলিজম্ হচ্ছে; সরল ভাষায়, এটা শরীরের পোড়ার দশা; কিন্তু গালাগাল নয়। ধোঁয়ার কথাও আছে; সত্য কথা বলতে, প্রায় সবই ধোঁয়া! কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের আগুন বা আলোর কথা ত তাঁরা বলেন না! তবে কি আগুনের রকমভেদ আছে! জ্বালানি-পোড়ানিরও রকমভেদ আছে? চোখের মধ্যে যদি তার আলো দেখা দেয়, তা হলে বলতে হবে—রক্তমাংসের চোখটা খুবই অদ্ভুত! বিজ্ঞানের ধোঁয়ার জ্বালায় আমরা তখন নিজেরাই ধোঁয়া দেখছি, আর চোখ রগড়াচ্ছি! আমরা কোন্ চোখে ঐ আলোর সন্ধান পাব? এই মশা-মাছি সর্বনাশ করা গোয়ালে ধোঁয়ার হাত থেকে নিজেরা নিষ্কৃতি পেলে হয় ত বা ওরকমের আলো আমাদের চোখে পড়তে পারে…।

তন্নুলালজীর গলার আওয়াজ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল কল্পনালোক থেকে বাস্তবে। তিনি বলতে লাগলেন—

"পান হাতে করেই ফিরে গেল ফৈয়াজ্ নিজের জায়গায়। তার হাত থেকে পানটি কখন্ পড়ে গিয়েছে কেউ জানেনি। দেখলাম, সে স্থাণুর মত বসে আছে। জোয়ান বয়সে কখনও কখনও এমন হয়!

গহ্‌রের গান হয়ে গেল; তারিফের পালাও শেষ হল। ওটা নূতন নয় গহ্‌রের পক্ষে। আসর তখনও চঞ্চল; গুণ্‌গুণ্ করছে। এমন সময়ে তেজনারায়ণ দাঁড়িয়ে উঠে পরিষ্কার গলায় ফৈয়াজ্‌কে গান করতে অনুরোধ করলেন; রাগের আলাপ দিয়ে আরম্ভ করতে বললেন। শ্যামলালও সেই মত অনুরোধ করল। সিংজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপ্‌লোগ্ জেরা ঔর বৈঠ্ জাইয়ে, মজেমে। কুছ শের্‌কি খেল্ কুদ্‌ভি হোনি চাহিয়ে, কম্‌সে কম্। তেজনারায়ণজীনে আচ্ছি খবর উড়ায়ি, অব্ দেখিয়ে ক্যা হোতা হ্যায়!" আপনারা আর একটু বসুন, মৌজ্ করে। কম্‌সে কম্

বাঘের খেলাও ত হওয়া চাই! তেজনারায়ণজী ভাল খবর উড়িয়েছেন! দেখুন ত কি হয়!"

মজলিসের চোখ-কান খুবই সজাগ, তখনও। খুব উৎসুক হয়েছে সকলে। কেবল গহ্‌রের মা হুঁসিয়ার হয়ে একগাল পান চিবুতে চিবুতে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগলেন। যেমন বাঘ্‌নি এদিক্ ওদিক্ তাকায় ঘুরে ফিরে বাচ্ছাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করার জন্য।

তেজনারায়ণ, শ্যামলাল আর আসরের প্রধান লোকদের প্রতি আদাব জানিয়ে ফৈয়াজ্ উঠে গিয়ে বসলেন গাইয়ের আসনে। আশেপাশে এগিয়ে বসল সঙ্গতীরা। মাল্‌কার তম্বুরাটি নিয়ে দু'চার মোচড় কষে ফৈয়াজ্ সুর বেঁধে নিলেন; কি সুরে বাঁধলেন মনে নেই। তবে শ্যামলাল বলেছিল, খুব চড়া সুরেই বাঁধা হল, শেষ রক্ষা হলে হয়! সঙ্গতীরা সুর বেঁধে নিল।

ফৈয়াজ্ যখন আলাপের তোম্‌ তায় নোম্ আরম্ভ করল, তখন রাত দু'টা বেজে গিয়েছে; বেশ মনে আছে—কারণ, মিয়াকি-মল্লার আরম্ভ করতেই আমি ঘড়ি দেখেছিলাম। আরে না, পাঁচুবাবু, না! রাগের বখ্‌ত বন্দো-বস্তী হিসাবের জন্য নয়; কখন থামবে, তার একটা হিসাব রাখার জন্য। আমরা তখন ভুক্তভোগী। আলাবন্দেজাকরুদ্দিনের আলাপ শুনে আমার একটা ধারণা ছিল, আলাপের গুণীপনার বিচার হবে, কে কতক্ষণ চালাতে পারে, আর সমঝ্‌দারির পরীক্ষা হবে, কে কতক্ষণ বসে বসে সহ্য করতে পারে। প্রথম ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন বন্দে আলী খাঁ বীণকার, আর দ্বিতীয় বার ভুল ভেঙ্গেছিল—এই ফৈয়াজের আলাপ শুনে। আপনি ত ইমদাদ্‌ খাঁর আলাপ শুনেছেন; মনে রাখবেন, তিনি বন্দেআলি খাঁ সাহেবেরই শাগিরদ্‌।

সাবাস দিতে বাধ্য হয়েছিলাম এই ফৈয়াজ্‌কে। জন্মে অবধি সুর কানে ধরে বনিয়াদী রঙ্গিলা ঘরের তালিম পেয়েছিল এই কুড়ি বাইশ বছরের নওজোয়ান। মনে করুন সেই পাকা আওয়াজ, ঘণ্টার মত স্পষ্ট আর রেশ্-দার! সুর লাগতেই ত মজলিস্‌ভর লোক সন্নাটা (বিস্মিত) হয়ে শুনতে লাগল। তার উপর মনে করুন, সেই মেজাজ্ আর তবিয়ৎ আর ঠাহ্‌রান (ক্ষণিক বিরতির কলা-কৌশল), যার কিছু নমুনা আপনি শুনে থাক্‌বেন হয় ত সেদিন। আসরের লোক মজে সুরে আর মেজাজে। তার পরে কেউ

হয় ত মিঁয়াকি-মল্লারের দো-নিখাদের কার্‌চোবি আর মেহনত্ বুঝল; কেউ বা বুঝল না। তাতে কী আর এল গেল। মোট কথা, ফৈয়াজ্ যখন রাগের লহর তুলতে আরম্ভ করেছে, তখন সুরের যাদুও শুরু হয়ে গিয়েছে; এর হাত থেকে নিস্তার নেই, এই সুরের যাদু! এইখানেই সকলে বুঝল, গহ্‌রের সব রং ধুয়ে গিয়েছে। ধার আর ভার একসঙ্গে থাকলে খেলোয়াড়ের হাতে তলোয়ারের চোট কি রকম হয়, আন্দাজ করতে পারেন।

তারপর শুরু হল যোড় আর লড়ী আর ঠোকের বর্‌সাতি! আর থেকে থেকে সুরের চম্‌ক আর গমকের গম্ভীর গর্জন! মনে হচ্ছিল, যেন সুরের আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে মাইফেলের উপর। মাত্র দু'টি সারেঙ্গী আর একটি তম্বুরার আওয়াজে কি সেই হাঁক-ডাকের সঙ্গত্ হয়! এর পরে যখন কয়েকটি আখেরী, চম্‌কিলী তানের বাহার দিয়ে ফৈয়াজ্ আলাপ শেষ করে নিয়ে আসতে থাকল, তখন মনে হল, সত্য সত্যই মেঘের জাল গুটিয়ে নিয়ে মল্লার চলে যাচ্ছে দূরের আস্‌মানে; আর দিগন্ত থেকে দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কিছু রোশ্‌নি আর বিজ্‌লির খেল্! রাগের গর্জন সব থেমে গিয়েছে; তার জায়গায় হাওয়াই বোল্ ঘুরে ফিরে যাচ্ছে যেন সুম্ সননন ফুকার দিয়ে আর মাঝে মাঝে কানে আসছে তম্বুরার রুম্‌ঝুম্! বর্‌থা যেতে না যেতেই যেন ঝিঙ্গরের বোল! পাঁচু-বাবু! আর্ট ত একটা 'এফেক্ট', আর সেই এফেক্ট বজায় থাকে পরি-বেশনের কায়দায়। আলাপ বলুন আর গানই বলুন—কায়দার শেষ কথা হল, কি ভাবে খাতেমী (শেষের) বাহার খুলে দিতে হয়—সেলাম জানিয়ে বিদায় দিতে হয়। তারিফের আওয়াজে যদি গায়কিই চাপা পড়ে যায়, আর গাওয়াইয়া যদি সুর ছেড়ে দিয়ে তারিফের টুকরা জমা করতে মন দেয় ত আমি বুঝব, সে লোকটা কমা দরের। মুখের আলাপ শুনেছি অনেক; কলাবন্ত্‌দের কারিগরীও শুনেছি ঢের। তবে—প্রায় মনে হয়েছে—আবা-হনের কায়দা জানা আছে ত বিসর্জনের লুৎফ হারিয়ে ফেলেছে মাইফেলের খবর্‌দারী করতে করতে। ফৈয়াজের মুখে সে দিন সেই আলাপ আর আখেরী কায়দা দু-চারটা শুনে মনে হল, একজন সাচ্চা কারিগরই বটে। মিলন আর বিদায়, দু'টি ব্যাপারেরই রহস্য আর অনুভব দিয়ে এর হৃদয় ভরা। সত্য কথা, মুখে মিঁয়াকি-মল্লার রাগের এমন আলাপ আমি আর শুনিনি।

আমরা, বিশেষ করে তেজনারায়ণের বন্ধুরা বলাবলি করছিলাম, ফৈয়াজের হাতে ঘরের ঝাণ্ডা উঁচু হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। পরে শ্যামলাল বলেছিল, অবশ্য ঐ ঠোক্‌দার বোল আর লড়ীর তানগুলি বীণ আর রবাবের বাজ থেকে উদ্ধার করা; ফৈয়াজের নিজের বুদ্ধি আর কারিগরী আর সাফাইৎ (পরিমার্জনা) সেগুলি। শ্যামলাল এ সকল বাজের ব্যাপারে আমার থেকে ভাল খবর রাখত।

যাই বলুন, পাঁচুবাবু! "জেনানার মিঠি আওয়াজে চাঁদনি খুলে যেতে পারে, ফুল ফুটতে পারে, কোয়েলও কুহক্ দিয়ে যেতে পারে, সব স্বীকার। কিন্তু বর্‌খার ঘটাকারি, তার রোম্-ঝোম্, তার মেঘগর্জন, এসব ফলাও করতে হলে চাই সুর আর মেজাজ, আর তৈয়ারি পুরুষের গলা। আর পুরুষের গলা ত চাই ঐ ফৈয়াজের মত" বলে তন্নুলালজী থামলেন।

পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে—"কতো রকমের মল্লারের খবর রাখেন?"

কিছু শোনা-কথা আর কিছু পড়া-কথার নজিরে ভর করে কতকগুলি গালভরা নাম বলতে আরম্ভ করেছি মাত্র; আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "আরে না, না! আপনার রামদাসী-হরদাসী, সুরট-রূপমঞ্জরী ও গায়রা নামটাম রেখে দিন। ও তো রামশ্যাম, যদু-মধুর ফিরিস্তি! আমি বলছি কতো রকমের মল্লার। বুঝলেন কি?"

ঠিক বুঝতে না পেরে কয়েকটা ঠাটের ফর্দ আরম্ভ করলাম, যার আভাস পেয়েছিলাম ওস্তাদ্‌দের মুখে মুখে। তিনি বললেন, "তাও নয়। ওসব ত ফুলের ফ্লোরাল্ ফর্‌মুলা! ওতে খোশবুর খবর আর মজার সন্ধান আছে কি?—যাক্। শুনুন তবে।

মল্লারের কতকগুলিতে পাবেন হাওয়া আর ঝড়-তুফানের সুম্ সননন। বারিস্ (বর্ষণ) পাবেন খুব কম। কতকগুলিতে পাবেন বর্‌খার রুম্‌ঝুম্ আর মোরের বোল্ আর দাদরের শোর, খাস করে। আর কতকগুলিতে পাবেন ভিজা, ঠাণ্ডা হাওয়ার মধুরাই, আর শুনবেন ছোটো বড়ো বুন্দের (ফোটার) টপক্। আর কতকগুলিতে পাবেন আপনি মেঘের ঘটাকারি, বিজ্‌লির চমক্, আর করক আর গড়গড়াহট্ (গড়গড়ধ্বনি)। বর্‌খা পাবেন ত অল্প, অওচক্ থেকে থেকে হঠাৎ। এসব হল অনুভবের সাক্ষাৎ চমৎ-

কারী; কাব্য নয়, কল্পনা নয়। আর একমাত্র পয়লা দর্জার (শ্রেণীর) গুণীরাই এসব প্রত্যক্ষ করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তাজা তাজা যে অনুভব করল না, সে ঠকল। তারপর বাড়ী গিয়ে সে যদি ঠাট আর নাম আর আরোহ-অওরোহ নিয়ে মাথা লড়াই করে ত আমি বল্‌ব, অবশ্যই এ থেকে অন্য বাজে কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করা যায়। তবে যেটা আসল কাজ, অর্থাৎ গান বা আলাপ শুনে তখনি অনুভব করা, সেটা বাদ দিলে বাকি সবই বাজে। অনুভবের ডালিতে অনুভব ভরে না নিয়ে জ্ঞান দিয়ে ভরে নেওয়ার মানে ফুলের ডালিতে তরী-তরকারী ভরে নিয়ে বাজার করে ফেরা। বাড়ীর লোক মেনে নেবে ত গিন্নী মানবে না; আর গিন্নীও খুশী হতে পারে, তবু ভিতরের দেওতা খুশী হন না কখনই।

আপনার মিঁয়াকি-মল্লার হল ঐ শেষ রকমের মল্‌লার। এর ইলম্ (বিদ্যা-সিদ্ধি) বড় কঠিন। আর খাস এক রকমের গলাতেই এর শোভা, এর হুনর্‌মন্দি জাহির হতে পারে; সব গলায় নয়।" 'হুনরমন্দি' বল্‌তে কলা-চাতুর্যই সাধারণত বুঝায়। কিন্তু তন্নুলালজীর বলার ঢংই একটু বিচিত্র হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, প্রতিটি বিশিষ্ট রাগের বিশেষ এক রকম বিকাশ-মনোহারিত্বের প্রভাবেই শিল্পীর নৈপুণ্য বিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়; যাকে আমরা শিল্পীর প্রতিভা বলে ধরে নেই, সেটা তাঁর মতে সেই রাগেরই যেন বিশিষ্ট কারুনিপুণতার পরিচয়। সেই মূর্তিটি শিল্পীর ধ্যানস্থ বা হৃদয়স্থ না হলে—যাকে আমরা শিল্পীর কলাচাতুর্য বলি, সেটা কৌশল আর সাধনার রূপেই ফুটে ওঠে, কিন্তু অনুভবের বিশিষ্ট উন্মেষের রূপে ফুটে ওঠে না। বিনা ফুলে পাতার বাহারের মতোই সেটা মনে করতে হবে।

আমি হাঁ করে তন্নুলালজীর কথা শুনে যাচ্ছিলাম; উদরসাৎ করে যাচ্ছিলাম, যেমন সন্ধ্যাকালে চরানে গরু দ্রুতগ্রাসে পেট ভরিয়ে নেয়, এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে। অবশ্য সেগুলি ভাল কথা, নূতন কথা, মজার কথা, ভাববার কথাই ছিল। রোমন্থনের কাজটা পরেই করেছি, তখন নয়। তন্নুলালজী বলে যেতে লাগলেন—

"আলাপ শেষ করে মুহূর্তের বিশ্রাম না নিয়েই ফৈয়াজ্ ধরে দিয়েছে মিঁয়াকি-মল্লারের ধামার। খুলে গেল গানের বলিহারি রূপ, আর লচাও আর লয়কারি! সুর আর বোলের মধ্যেই যেন এসে পড়ল ফাগ আর কুঙ্কুমের ছটা;

ফুটে উঠল হোরির চমক, পিচকারির তক্‌তক্ বাণ, রংএর ফুহার (ফোয়ারা) ; আর গোয়ালনন্দের হৈ-হল্লা, আর বিছুবা (স্ত্রীলোকের পায়ের আঙুলের অলঙ্কার, চুট্‌কি) আর কঙ্কণের বিচিত্র ঝনৎকারি ! এক-একটা বাঁট আর তান, আর একসঙ্গে শুন্‌নেওয়ালাদের মুখে তারিফ ! ধামারের দোলে সকলে সম্ দিচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। তেজনারায়ণ থেকে থেকে বলে উঠেছেন—সাবাস ! বেটা সাবাস ! গহ্‌র, মাল্‌কা আর অন্যেরা বিহ্বল হয়ে চমৎকারির স্বাদ নিতে আরম্ভ করেছে ! এরকমের আনন্দ আর হিল্লোড় খুবই ছোঁয়াচে ; একজনকে ধরতে যা দেরি !

কখন কী যে হয়ে গেল, বুঝবার আগেই দেখি, ফৈয়াজ্ ধরে দিয়েছে চল্‌তা লয়ের গান আর আরম্ভ করেছে ছোট ছোট রঙ্গিলা ফিকরবন্দী তান আর ফিরতের খেলা ; সেই একই মিঁয়াকি-মল্লারে।

তখনই শ্যামলাল, তেজনারায়ণ আর আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, ফৈয়াজ্ মস্ত্ হয়ে গিয়েছে, ও এখন যা খুশি, তাই করতে পারে ; গানের রাজ্যে ওর পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু থাকল না। আহা হা ! সেই ফৈয়াজ্, সেই চেহারা, সেই মস্তির লগ্‌ন ! পাঁচুবাবু ! আপনিও ত এখনকার ফৈয়াজ্‌কে দেখলেন। কিন্তু যতই দেখুন, সে দিনের ফৈয়াজ্‌কে আন্দাজে ধরতে পারবেন না। সেটা একটা ক্ষণ, একটা লগন, যা আমার চোখের সামনে ঝক্‌মক্ করছে।

আমাদের মুখের কথা স্তব্ধ হয়ে গেল, একটি সপাট্ হলক্ তানের হুঙ্কারে ; আসরের মাথা নাড়াও বন্ধ হয়ে গেল সেই তানের বুলন্দিতে (উচ্চতা ; এখানে তার-সপ্তকের পাল্লা বরাবর উচ্চতা) ! এই সপাট আর হলকের মত এমন চমকদার কাজও আর নেই, যদি হয় সচ্চা সুরের দানা দিয়ে। আর অমন থাক্‌ও ছাইও আর নেই, যদি সুরের ওজনে কমবেশি হয়। গানের পদের কথা বলছেন ? কোন্ গান বা পদ শুনেছিলাম, কিছু মনে পড়ে না, হয় ত শুনিইনি ; হয় ত কেউ-ই শোনে নি ! রাগের মূর্তি কায়েম হয়ে গেলে শ্রোতারা রাগেরই আরতি করে। গোড়া থেকেই ফৈয়াজ্ মিঁয়াকি-মল্লার কায়েম করে দিয়েছে ; তখন পর্যন্ত সেই এক মিঁয়াকি-মল্লারই চলছে। অথচ মনে হচ্ছিল যেন রাগের দরিয়া ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সুরের তুফান আর ঝটকায়। যেন ঢেউগুলি একটির পর একটি করে এসে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

তাজ্জুব (বিস্ময়) দিয়ে তারিফের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ; কারণ, ন-মালুম মুম্‌কিন্ (অজানার সম্ভাবনা) চমক্ দিয়ে যাচ্ছে হর্‌দম্। হরেক তানের সঙ্গে বাহার নিয়ে এসে পড়ছিল ঠোক্ আর ছোট ছোট বোল-তান ; আর মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল সেই হলক্ তান। কত রকমের কায়দা দিয়ে কতক্ষণ এরকম চলেছিল মনে নেই ; ফৈয়াজ্ বেদম হয়নি, আমরাও কিছু মাত্র ক্লান্ত হইনি। শেষে কয়েকটি পর পর বোল-তানের বাহার এসে ক্রমশ মোলায়েম হয়ে দেখা দিল জম্‌জমার মালা। আর জম্‌জমাও মিলিয়ে যেতে থাকল মীড় আর সূতের বারিক্ (মিহি) কারিগরীর মধ্যে। আসর চমকে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

ফৈয়াজ্ থেমে গিয়েছে। তার চোখ তখনও ঝক্‌ঝক্ করছে সুরের উন্মাদনায়। মাইফেল যখন সত্য সত্যই বুঝল, ফৈয়াজ্ শান্ত হয়েছে, তখন আরম্ভ হল প্রশংসা আর কোলাহল। যথার্থই মনে হয়েছিল আমার, আগেকার গহ্‌র-মাল্‌কার খেলা যেন ছিল পুতুলের নাচের মত। সে সব যে চমৎকার আর মজাদার, খুবই সন্দেহ নেই। কিন্তু রাগের এমন জীবন্ত পরিচয় তার মধ্যে ছিল না।

ফৈয়াজ্ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে, কোনও কথা না বলে, কোনও দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। সকলের চোখ তার দিকে ; তার নজর তেজনারায়ণ আর শ্যামলালের দিকে। ফৈয়াজের মুখ থেকে লাল আভা বেরিয়ে আসছে তখনও ; প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মেহনতের ফল, আমরা বুঝলাম। শ্যামলাল আর তেজনারায়ণের সামনে এসে আদাব করে ফৈয়াজ্ পূর্বের মতই পরিষ্কার গলায় বলল, "জনাব! ঘরের ঝাণ্ডা উঁচা থাকল কি ? এও ত বলুন মেহেরবানি করে! আমি ত বাঃ-জি-বাঃ আর সাবাস উসুল করবার জন্য গান করিনি।" দেখলাম, তার সেই আগের কথায় যেমন একটু ছেলেমানুষী আর হঠকারি প্রকাশ পেয়েছিল, অথচ সেটা তার পক্ষে আমরা বে-আদবী মনে করিনি—সে ভাব আর নেই।

তেজনারায়ণ আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর কত কি মধুর বচনে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "তুমি যখনই গান করবে, তখনই এরকম ইজ্জত আর তারিফের পরোয়া না করে, উমিদ্ না করে গান করবে। বেটা! তোমার হাতের

ঝাণ্ডা কখনও নীচু হবে না, কখনও নয়। মনে রেখো এ কথা।" অন্তরের প্রসাদ দিয়ে মাখান আরও কত কি বললেন, তার নামে আর গোলাম আব্বাস খাঁর নাম করে। সে সব কথা সকলের কানে গিয়ে সকলের মুখে ফিরে আসছিল।

চারিদিক্ থেকে নিজের আর ঘরের তারিফ শুনতে শুনতে তার চোখ-মুখ শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। তেজনারায়ণের কথা শুনে সে হঠাৎ বলে উঠল, "জনাব! তা হ'লে আমার ইজ্জত্ ফিরিয়ে দেন এখন।" স্কুলের ছেলেরা প্রাইজ নিতে গিয়ে যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেইরকমভাবে সে দাঁড়িয়েছিল উৎফুল্ল হয়ে; যেন অঞ্জলি ভরে ইজ্জত্ ফিরিয়ে নিয়ে সে বাড়ী যাবে!

তার কথা শুনেই শ্যামলাল বলল, "সে কেমন করে হবে, ভাই! তুমি ত তমাম্ ইজ্জত্ সদ্কা করে ছেড়ে দিয়েছিলে! সে সব দুনিয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছে। সে কি আর ফিরে যায়?"

শ্যামলালের জবাব শুনে কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে গেল ফৈয়াজ্। তার চোখের পাতা ভারি নরম হয়ে নেমে এসেছে; বুঝি বা মনের গোপন কথা কিছু ঢেকে রাখতে চায়। বলিহারি শ্যামলাল আর তার কথার ইশারাকে! লাখ্ রূপেয়া দিলেও ত তার দাম হয় না। ফৈয়াজের চোখের পাতা অমন করে গুটিয়ে আসত না। অমন করে নিজের মনের গোপন কথায় নিজেই মোহিত হ'ত না। পাঁচুবাবু! টাকাতে পেট ভরে ত দিল ভরে না। দিল ভরে হমদর্দির (সহৃদয় জনের) মুখের ছোট ছোট প্রাণের কথা দিয়ে," বলে তন্নুলালজী একটু চুপ করলেন।

শ্যামলালজীর কথার অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারিনি তখন। তন্নু-লালজীকে সে কথা বলতে তন্নুলালজী বললেন—

"বুঝিয়ে দিচ্ছি। অন্য কোনও জনের কিছু ভালাই প্রার্থনা করে বা আকাঙ্ক্ষা করে কোনও প্রিয়বস্তুকে ত্যাগ বা উৎসর্গ করাকে সদ্কা বলে। ফৈয়াজের কাছে নিজের ইজ্জত্টাই প্রিয় ছিল; যেটা খুবই স্বাভাবিক। নিজের ইজ্জত্কেও ত্যাগ করা যায়, ঘরের ইজ্জতের ভালাইয়ের জন্য। তবুও তার দুশ্চিন্তা ছিল, জেনানা লোকের আসনে বসে দঙ্গল করে গান করলে ঘরের ইজ্জত্ও নষ্ট হয়ে যায়। ঘরের ইজ্জত্ই তখন প্রিয় হয়ে দেখা দিল। একে উৎসর্গ করতে তার মন রাজি হচ্ছিল না; গান করতে আপত্তি

করছিল। তারপর তেজনারায়ণ যখন মাল্কার মনের দহনের, তার অপমানের কষ্টের কথা তুলে ফৈয়াজ্কে উস্কে দিলেন, তখন চোট্ লাগল তার হৃদয়ে। মনের দ্বন্দ্বের শেষ আগুন নূতন করে জ্বলে উঠল। ঘরের ইজ্জত্কেও বুঝি সেই আগুনে আহুতি দিতে হয়, হৃদয়ের সত্য অনুভবের ভালাইএর জন্য! আহা হা! তা না করলে কি আর কখনও হৃদয়ের সত্য অনুভব জেগে উঠবে? কখনও নয়। হৃদয়ের অনুভবকে সামনে এনে যে একবার তাকে ছোট করে, বেইমানি করে, তাকে ফিরিয়ে দেয়, তার হৃদয়ের কপাট আর খোলে না কখনও। ফৈয়াজের কাছে সেই অদ্ভুত অনুভবেরই জিত হল; তখনই ত ঘরের ইজ্জত্কে সদ্কা করে দেওয়া হয়ে গেল। তখনই তার হৃদয়, তার মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলি বলিয়ে দিল, সে কোনও কিছুর পর্বা করবে না, সমস্ত কিছুই সে ত্যাগ করতে তৈয়ার; হৃদয়ের যা সত্য অনুভব, তার ভলাইএর জন্য। ঐখানেই হয়ে গেল সদ্কার চরম। শ্যামলালের কথার পেঁচের মধ্যে এইটেই হ'ল সবচেয়ে তীব্র সত্য কথা।

সদ্কা করে দিলে সেটা ত আর ফিরে আসে না; ফিরে চাওয়াও যায় না তাকে আর। গলা থেকে সুর বেরিয়ে গেলে সেটা যেমন ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, সেটা যেমন জগতের মধ্যে গিয়ে জগতের সম্পত্তি হয়ে গেল, তেমনি ফৈয়াজ্ যে ইজ্জতের চিন্তাকে সদ্কা করে দিল, সে চিন্তা সে আর ফিরে চাইতে পারে না। সে চিন্তা সেই মুহূর্ত থেকে জগতের কাছে আর পরমেশ্বরের কাছে জমা হয়ে গেল। আখেরে পরমাত্মাই এর গুণাগুণ বিচার করবেন, এই হ'ল শ্যামলালের কথা।

গান শেষ হয়ে গেলেও ফৈয়াজের হৃদয়ে একটা জখম থেকে গিয়েছিল। গানশেষের পর তেজনারায়ণের মধুর কথাতেও সেই জখমি দিল্ শান্তি পায়নি; বরং সেই ঝাণ্ডা আর ইজ্জতের কথায় জখমের জায়গায় আবার হাত লাগ্ল! বেচারা ইজ্জত ফিরে চেয়েছিল জখমের জ্বালায়। এটা কিন্তু হৃদয়ের সেই চরম গোপন কথা নয়। শ্যামলালের কথাগুলি যেন তার হৃদয়ের তন্ত্রীর উপরেই হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল, সেই পোষিদা (গোপন) সুর-গুলি ঠিক ঠিক বাজে কি না দেখার ছলে। জখমও ঠাণ্ডা হয়ে গেল, যখন ফৈয়াজ্ আর একবার অনুভব করল সেই মর্মের গুঞ্জনগুলি। দরদ্ আর জখমের মধ্যে দরদ্টাই বড়ো কথা যখন অনুভবে ধরা দেয়! তখন জখমটা

মনে হয় যেন অমৃত! আর যেখানে দরদের সুর বেজে ওঠে না অনুভবের মধ্যে, তখনই জখমী জায়গাটা মনে হয়, যেন বিষের কাঁটা দিয়ে বেঁধা আছে। একে চিকিৎসা করতে হয় সান্ত্বনা দিয়ে। দর্‌দের চিকিৎসাই করতে হয় না; ওটা রোগই নয়, পাঁচুবাবু! ওটা হ'ল সৌভাগ্যের উদয়; কখন্ যে দেখা দেবে, তার ঠিক নেই। কিন্তু তৈরী হয়ে থাকতে হবে ঐ সৌভাগ্যের জন্য।

ভেবে দেখুন, গাওয়াইয়াদের অভিমানের থলিটাই আমরা বড়ো করে দেই টাকা আর সম্মান দিয়ে; নয় কি? কিন্তু, তাদের পক্ষে ও সব ত আমদানী মাল; উৎসর্গের কথা ত নেই! আমদানীর আশায় গুণী যদি ছেড়ে দেন গান আর সুর, তা হ'লে সেই গান আর সুর কি তার হৃদয়ের চরম উৎসর্গ হ'ল? সেটা হল কারবার। কারবারী মন আছে, কারবারী লুৎফও আছে; গুণীদের যেমন আছে, সমঝ্‌দারেরও তেমনি আছে। কিন্তু যথার্থ গুণীর অন্য একটা গুণ আছে, অন্য মন আছে, অন্য রকমের অনুভব আছে। এই দুস্‌রা রকমের মন কারবারে চরম তৃপ্তি পায় না; কারণ, কারবারের মধ্যে নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার তৃপ্তি একেবারেই নেই: থাকতে পারে না; সর্বদাই ভয়—কারবারে লোকসান হ'ল না ত!

হৃদয়ের সত্যকে অনুভব করেই ত ফৈয়াজ্ সে দিন গান করতে বসেছিল। আপন অনুভবের উত্তেজনায়, আপন মাধুরীর স্বাদ নিয়ে সে দিন মস্ত্ হয়ে গান করেছিল। গান বেশীক্ষণ হয়নি, জোর দু' ঘণ্টা হবে। কিন্তু মস্তীর ওজন ত ঘণ্টার হিসাবে হয় না। এক যুগের কারবারী লুৎফ এক পলকের মস্তীর সামিল হয় না।

এই পরশু দিন মাত্র আপনাদের কথায় ফৈয়াজ্ খাঁ সাহেব গান করে ফেললেন। কিছু আমদানির প্রত্যাশা ছিল কি? তা হলে প্রেরণা এল কোথা থেকে! অবশ্যই এসেছিল হৃদয় থেকে, অনুভবের রাস্তায় আর দর্‌দ সঙ্গে নিয়ে। হ'তে পারে সেটা ক্ষণিকের। কিন্তু তবুও সেটা অন্তরেরই প্রেরণা; ওরকম ব্যাপার তম্বুরা-জোড়ীর অপেক্ষা করে না। আমি বলব, সেই মুহূর্তে ফৈয়াজের নিজের দর্‌দ বা সৌভাগ্যের উদয় হয়েছিল, আগে। আর আপনাদের পক্ষে তাঁর গান শোনার সৌভাগ্যটা এসেছিল সেই দর্‌দের নোকর-চাকর হয়ে, পরে।"

তন্নুলালজী থামলেন। তাঁর কথার অন্তর্নিহিত সত্য এমন একটা সরল

স্বয়ংপ্রকাশ মূর্তিতে আমার মনে প্রতিফলিত হচ্ছিল যে, তখনকার তখন—তার 'ক্রিডেনশ্যাল' অর্থাৎ যুক্তির ছাড়পত্র পরীক্ষাই করিনি। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলাম—"তারপর কি হলো বলুন।" তন্নুলালজী বল্লেন—

"কী আর হবে! জলসা শেষ হয়ে গেল। মাল্কার জীবনের মোড় ফিরে গিয়েছিল, অবশ্য সেদিনকার ঘটনার কারণে। সে কথা আর একদিন হবে, মাল্কারই সামনে, আজ নয়। আসল কথা—পরের দিন আলোচনা করা হ'ল, বিশেষ করে ফৈয়াজ্কে পৃথক্ এক রাত্রির জল্সা দেওয়া উচিত হয় কি না এবং কবে। আর ভৈরবীর মাইফেলও ত বাকি রয়েছে।

মজ্লিসের লোকেদের মধ্যে তা নিয়ে খুব কথাকাটাকাটি হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা সকলেই মেনে নিয়েছিল, গহ্র মার খেয়েছে। সিংজী বল্লেন, "ভৈরবীর মাইফেল আর রাত্রের ইনিংসের খেল্ ফৈয়াজ্কে দিতেই হয়। কিন্তু নূতন করে ইনিংস দিতে হ'লে গহ্রকেও গাইতে দিতে হবে, কম্সে-কম্! না হ'লে গহ্রের প্রতি বে-ইন্সাফি (অবিচার) করা হয়। গহ্রও ধামার জানে, বিলম্পদ জানে। সে দিন সে গায়নি; তার কারণ, সে প্রয়োজন মনে করেনি।"

কথাগুলি তেজনারায়ণের মনে লেগেছিল। তিনি নির্বিবাদে রাজী হলেন। লড়াই দেখার জন্য নয়; গহ্র সেকালের ভারি মালগুলি কি রকমে খালাস্ করে, এটাও ত দেখা উচিত। আমিও রাজি ছিলাম অন্য কারণে; অর্থাৎ ঐ ফৈয়াজের মুখে ঠুমরী আর গজল কেমন শোনায়, এটাও ত দেখা উচিত।

কিন্তু বাদ সাধলেন শ্যামলাল। বল্লেন, লড়াই করিয়ে দিয়ে জলসা হতে পারে। কিন্তু গান হয় না। লড়াইয়ে হার-জিত্ অনিশ্চিত। কিন্তু দুঃখ আর মন-কষাকষি একেবারেই সুনিশ্চিত! তিনি ভুক্তভোগী। তিনি সেটা সহ্য করবেন না। আর গহ্র ত হেরেই গিয়েছে; বেচারাকে দু'বার করে চোট্ খাওয়ান'র' কোনও ফয়দা হয় না, মানে হয় না। তিনি এর মধ্যে নেই! বরং ফৈয়াজের একলার জন্য এক জলসা দেওয়াই উচিত।

শ্যামলালের কথা আমি আর তেজনারায়ণ স্বীকার করে নিলেও সিংজীর বৈঠকী ইয়ারেরা বলল,—"এমন কী কথা আছে যে, গহ্র একদিন মার সহ্য করেছে ব'লে, দুস্রা দিনও মার খাবে! আর তাই যদি ভয় থাকে ত

বেনারস্ থেকে মৌজ্‌দিন্‌কেও তার দিয়ে আনিয়ে নেওয়া যাক্। এক দিকে মাল্‌কা আর ফৈয়াজ্, অন্য দিকে গহ্‌র বেচারী একা খেলেছে। এতে কি ন্যায়বিচার হয়?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা দেখলাম, কুরুক্ষেত্রের ভূতই বুঝি ঘাড়ে চাপল। শ্যামলাল আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন; বল্‌লেন, "আপনারা যো খুশী করুন। আমি কাল সকালেই রওয়ানা হয়ে যাব কাশীতে। তিতির-বটেরের লড়াই আমি দেখব না!" শ্যামলালের কথায় আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। শ্যামলাল রাগলে কি রকম মূর্তি ধরেন, তা ত আপনারা জানেন না। যাই হ'ক—শ্যামলাল থাকবেন না আর আমরা জল্‌সার মজা লুটব, এ ত হতেই পারে না।

আমি বল্‌লাম, "তা হ'লে কেবল ফৈয়াজেরই গানা হ'ক, অন্ততঃ এক রাত্রির জন্য, খাস্ করে।" সিংজীর তরফের অর্থাৎ গহ্‌রের তরফের বন্ধুরা বলল, "নিহায়েৎ অবিচার করা হবে গহ্‌রের উপর। তারও একটা হক্ আছে, ইজ্জত্ আছে" ইত্যাদি। আমি তখন বললাম, "আচ্ছা, ফৈয়াজের খাতির রাখা যাক্ ভৈরবীর মাইফেল দিয়ে, আলাদা করে। আর গহ্‌রের ধামার বিলম্পদ হ'ক রাতের জলসায়, খাস গহ্‌রেরই খাতিরে, বস্।" কিন্তু তাতেও ফঁয়স্‌লা হ'ল না। ইয়ারের দল বল্‌লেন, "তা হ'তে পারে না। এক জিয়াফতে (নিমন্ত্রণ) যখন দু'জনকে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন দুস্‌রা পাল্‌টা জিয়াফতে ঐ দু'জনকেই গাওয়ান উচিত। আগে ফৈয়াজ্ গাইবে, তার পরেই গহ্‌র গাইবে।" ফলে কোন মীমাংসাই হল না। জল্‌সাই মুলতুবী থাক্‌ল। পাঁচুবাবু! গাইয়ে-বাজিয়েদের সুখদুঃখের কথা ভুলে যান! কেবল তামাসা দেখুন সমঝ্‌দারের আর শুননেওয়ালাদের মনের মিথ্যা জিদ্-জখমের লড়াইএর! ফুলের লেন-দেন হয় ভঁওরার সঙ্গে; আর কাঁটা একলাই থেকে যায় আপন অভিমানে মজবুৎ হয়ে। ফুল ঝরে যায় ত কাঁটা নড়ে না, হেলে না।

সে সব কথা যাক্। একটা কথা মনে হয়। সেই-নওজোয়ান্ ফৈয়াজের মনে একটা দুষ্‌মনির কাঁটা পয়দা হয়ে গিয়েছিল গহ্‌রের প্রতি। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, সেই আসরে গহ্‌র এক ফুঁ দিয়ে মাল্‌কার রোশ্‌নি নিভিয়ে দিয়েছিল। সেই আক্রোশ ফৈয়াজ্ কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। বিদ্বেষের কাঁটা কদাচিৎ থেকেও যায় আমরণ! রক্তমাংসের মানুষ কতো

দিকে কতো লড়াই করবে বলুন ত! তাই ব'লে, ওরকম দু'একটা কাঁটা যদি থেকেই যায়, তাতে কি জীবন ব্যর্থ হয়? না, সাধনা ব্যর্থ হয়, গুণীদের?"

খুব সত্য, বাস্তব কথাই বললেন তন্নুলাল। মনের কাঁটা মাত্র দুঃখই দিতে পারে, আর আক্রোশ মুখে করে জেগেও থাকে, কিন্তু জীবনকে ব্যর্থ করতে পারে না। বাইরের আঘাত বা ভিতরের প্রতিঘাত কোনও শিল্পীর প্রেরণাকে বাধা দিতে পারেনি, ব্যর্থ করতে পারেনি। ফুল যখন ফোটে, তখন কাঁটা থাকলেও ফোটে। যখন ফোটে না, তখন কাঁটা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি!

'আফ্‌তাব-এ-মৌসিকী' অর্থাৎ সঙ্গীতের সূর্য ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেব তক্‌দির পুরা করে দিয়ে কলিকাতাবাসী সঙ্গীতামোদী সর্বসাধারণের হৃদয় হরণ করে নিয়েছেন; একবার নয়, প্রতি বৎসর ও বারম্বার। কাল তাঁকে ঘিরে ফেলেছে প্রৌঢ়ত্বের আবরণ দিয়ে। তবুও আবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে সেই প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা বেরিয়ে এসেছে, বর্তমান দৃশ্য ও পটভূমিকাকে অপূর্ব অভিনব মাহাত্ম্য দিয়ে মণ্ডিত করে। বর্তমান অর্থাৎ নিকট অতীতের স্মৃতিও নিজস্ব পুষ্পসম্ভার নিয়ে অপেক্ষা করে আছে, বিভিন্ন হৃদয়ের মধ্যে, বিভিন্ন রকমের আবেশে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। সকলের মনের কথা ত আমি জানি না; জানবার স্পর্ধাও রাখিনে। আমি জানি মাত্র আমার মনের কথা, বুঝি মাত্র নিজের অনুভবের সুখ-স্মৃতি।

যতক্ষণ, যে মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রৌঢ় রসিকের সঙ্গীত উপভোগ করেছি, সুরের ইন্দ্রজালের মধ্যে বন্দী হয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতীত আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি, বর্তমানের পরিবেশ থেকে। বন্দীদশার অবসরে মনেও হয়েছে বর্তমানের যা কিছু রমণীয়, বরণীয়, মাত্র সেইগুলিই ত অতীত গ্রন্থের স্মরণীয় হয়ে থাকবে; অতএব বর্তমানের কোনও মুহূর্তকেই অবহেলা করব না, অপমানিত করব না, অতীতের কিছুর সঙ্গ তুলনা করে।

যত বার গান শেষ হয়েছে, তত বারই আমার সমালোচক মনটি স্থৈর্য সঞ্চয় করে উপসংহারের দিগন্তের পানে তাকিয়ে বলেছে—আব্‌বাস্‌ খাঁর ঘরের কুলপ্রদীপ এই ফৈয়াজ্‌ খাঁ সাহেবকে অনাদিনিধন কাল বহন করে

নিয়ে এসেছে মাত্র এ কারণে যে, কাল একে অবলুপ্ত করতে পারে নি। মাত্র বহন করার জন্য সেই কালস্রোত গর্ব করতে পারে না। এই দীপশিখার কি বিচিত্র জ্যোতি, কি অদ্ভুত মহিমা যে, দেশকালের উদ্‌ভ্রান্ত বর্তনাকে উপেক্ষা করে, অতিক্রম করে, অবহেলা করেই চলেছে যুগান্তরের পথকে সমুজ্জ্বল করে। যুগে যুগে সঙ্গীতের সাধক, সঙ্গীতের পূজারী প্রতীক্ষা করে থাকেন তাঁদের প্রদীপ হাতে নিয়ে, অগ্নিসংগ্রহের অপেক্ষায়; কেউ বা সম্প্রদায়ের শিষ্য হয়ে, কেউ বা অসাম্প্রদায়িক সমালোচকের রূপে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—ঐ মহান্ তেজঃপুঞ্জ পুরুষটি কতো দিকে, কতো রকমের প্রদীপেই না অগ্নিসঞ্চার করে গিয়েছেন অকাতরে অবলীলাক্রমে। শিল্প-কলার তীর্থে অপরিমেয় জনসমাগম আর অনিয়ত কলরবের মধ্যে হয় ত আমরা নিজ নিজ ঋণ স্বীকার করতে ভুলে যাই। তবুও সেই ঋণ জমা হয়ে থাকে, যাত্রাপথের প্রতি পদচিহ্নের মধ্যে। কীর্তিমানের কীর্তি আর গুণমুগ্ধদের কৃতজ্ঞতা দিয়ে প্রীণিত, আস্তীর্ণ সেই অনন্ত ছায়াপথ। আমরা যদি কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ঋণ স্বীকার করতে ভুলেও যাই, তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ—ঐ ছায়াপথের অলৌকিক মাধুর্য যে একবার মাত্র অনুভব করে, সে সেই মুহূর্তেই চিরন্তন নির্বিশেষ ভাবে ঋণ স্বীকার করে ফেলেছে।

জাপানী হিড়িকের আগে কলকাতা থেকে চলে আসবার সময় মনে হল—খাঁ সাহেবকে দর্শন করে শেষ আদাব জানিয়ে চলে যাই। গোঁসাই অর্থাৎ জ্ঞান গোঁসাই বলল—সঙ্গীতের জলসার মধ্যে কোনও এক সন্ধ্যায় ভূপেনবাবুর বাড়ীতে খাঁ সাহেবকে একটু নিভৃতে দর্শন করা যেতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে অল্পক্ষণ জলসায় কাটিয়ে উঠে পড়তেই মনে হয়ে গেল, খালি হাতে ত যাওয়া যায় না; আগেকার হারানো দিনের কুসুমাঞ্জলির কথা সব এক মুহূর্তে এসে দাঁড়াল আমার মনের দ্বারে ভিড় করে।

নানারকম চিন্তা করতে করতে শ্যামবাজার থেকে গ্লোব নার্শারী গিয়েছি, গোলাপ ফুলের দু'টি তোড়া নিয়েছি, আর চলে গিয়েছি পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে। দু'টি তোড়ার অর্থ—একটি বর্তমানের, অন্যটি অতীতের স্মারক।

উপরে উঠে খাঁ সাহেবের বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে যাওয়ার অভিমুখে ঈষৎ

আলোকিত প্রতিপথে চলার সময়ে দেখি, একজন পশ্চিম-দেশীয় মুসলমান ব্যক্তি ঢাকা প্লেট আর পানীয়সম্ভার নিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেই ঘরের দিকে। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল; তবে কি অসময়ে,—খাঁ সাহেবের নাস্তার সময়ে উপস্থিত হলাম? কিন্তু যেতেই হবে।

উপরের ঘর সব জনশূন্য। এগিয়ে মোড় ফিরতেই দেখি, খাঁ সাহেবের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে কমলা রংয়ের স্তিমিত আলোক বাইরে আভাস দিচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, খাঁ সাহেব নিদ্রিতের অবস্থায় শুয়ে; পায়ের দিক্‌টা পাতলা র‍্যাপারে ঢাকা। ঘরের মধ্যে একটি টেবলল্যাম্প জ্বলছে; কমলা রংয়ের মিহি কারুকার্য-করা ঝালর দিয়ে ঘেরা সেটা। গোঁসাই, খাঁ সাহেবের পিঠের দিকে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মাথার পিছনে অদূরে সেই আলো খাঁ সাহেবের মুখে ছায়া রচনা করেছে মাত্র। কিন্তু গোঁসাইয়ের মুখে রক্তিম আভা; চোখ দু'টি ঢল-ঢল যেন ভাবের আবেগে। অল্প দূরে একটি টেবিলের উপর ভোজ্য পানীয়ের আয়োজন; খাঁ সাহেব অসুস্থ নয়। কিন্তু তিনি ক্লান্ত; গোঁসাই ইসারায় জানিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বলল।

খাঁ সাহেবের সেই স্বপ্নালু মুখখানি ভাল করে দেখলাম; পূবের সঙ্গে তুলনা করার জন্য নয়, বর্তমানেরই সমাদর করার বাসনায়। যৌবন চলে গিয়েছে, একটির পর একটি রেখাপাত করে। নিদ্রিতের ধীর মন্থর শ্বাসের অনুক্রমেই সেই রেখাগুলি একবার দেখা দিচ্ছিল, আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল ছায়ার মধ্যে। প্রৌঢ়ত্বের যে গম্ভীর পরিপাটী, যে কালোচিত কাঠিন্য অপর দর্শক ব্যক্তির মনে স্বতঃই সম্ভ্রমকে জাগিয়ে রাখে, সেই পরিপাটী, সেই সংযম শিথিল অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; ক্লান্তির আবেশে? নাকি সুখ-বিশ্রান্তির আলিঙ্গনে? লাল আলো ও অস্বাভাবিক ছায়াপাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল অদ্ভুত, অবর্ণনীয় রূপ গ্রহণ করেছে; তিনি যখন গান করেন, তখন ত এরূপ দেখা যায় না।

তিনি কি সুষুপ্ত? না কি তন্দ্রা ও স্বপ্নের অলৌকিক সমাধি রচনা করে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছেন? বর্তমান গৌরবের শিখরে উঠে তিনি ক্লান্ত, কাতর, নিঃসঙ্গ। কিন্তু অতীতের গভীরে তাঁর আপনার বলতে সব কিছুই, কতো কিছুই না আছে!

মনে পড়ে গেল একটি ছত্র—

"অব্ তো সোনে দেও চয়ন্‌সে,
পঢ়ো না তল্কিঁ, লহদ্‌সে যাও"

অতীতের পুঞ্জীকৃত সুখ-স্বপ্নের সমাধি রচনা করে যেন এই ব্যক্তি তার মধ্যে শায়িত রয়েছেন। আজীবনের প্রেমাস্পদ যশঃসুন্দরী জাগ্রতের ধ্রুব-তারা হয়ে এঁর চেতন মহাপ্রাণকে আমরণ পরিচালিত করে এসেছে। কত যত্ন, কত শ্রম স্বীকার করেই না সেই সুন্দরীর সাধনা ও মনস্তুষ্টি করে এসে-ছেন এই খ্যাতিমান্ পুরুষ! জীবনের অপরাহ্নে তিনি ক্ষণিকের বিরতি আর নির্দ্বন্দ্ব বিশ্রাম কামনা করেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছে বাইরের জগতে; মুখরিত হচ্ছে আপামর সাধারণের সাধুবাণীর মধ্যে দিয়ে। কর্ণামৃতরসায়নের গোপন রূপেই সেই যশঃসুন্দরী এঁকে বিশ্রাম করতে দেয় না। সেই সুন্দরীই এর নিকটে এসে বার বার বলছে, "আমাকে মনে আছে ত? আমাকে যেন ভুলো না কখনো।" স্বপ্নবিহ্বল প্রতিভার পক্ষে এ থেকেও মহাস্মরণ তল্কিঁর আর কী পাঠভেদ হতে পারে! তাইতেই ত এই শ্লথ শিথিল মূর্তি বলছে, "মনে আছে, মনে আছে। কিন্তু দোহাই তোমার! এখন অন্তত আমাকে সুখনিদ্রা ভোগ করতে দেও। মরাপচা দেহের আশ্রয়ভূমি এই যে কবর, এটা অশুচি। এ স্থান থেকে সরে যাও, দূরে যাও, হে মানসীসুন্দরি! তোমাকে তল্কিঁর স্মারক মন্ত্র পাঠ করতে হবে না এই গলিত-মৃতের বেদীতে।"

যথার্থই! অতীতের আর বর্তমানের তুচ্ছ অকিঞ্চন স্মরণমন্ত্রের মত যে তোড়া দু'টি নিয়ে এসেছি, তা দিয়ে কি আমি এই শান্তিকামী চিত্তের স্বপ্নভেদ ঘটাতে পারি? আমার স্মৃতির অতীত দিয়ে তাঁর স্মৃতিকে আলো-ড়িত করে বর্তমানের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে গেলে এক রকমের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাই হবে। আর কী জন্য, কী এমন সুখ অবশিষ্ট আছে, যার লোভে তিনি জেগে উঠবেন তাঁর অতীতকে সঙ্গে নিয়ে, আমার সামান্য তৃপ্তির খাতিরে? কিছুই নয়।

এমন সময়ে তিনি পাশ ফিরে শোওয়ার ছলেই যেন চোখ খুলে চাই-লেন অর্ধজাগ্রত হয়ে। তন্দ্রাজড়িত চোখে অল্পক্ষণ চেয়েছিলেন আমার দিকে। আমি সেই মুহূর্তের অবসরেই তাঁকে ঐ তোড়া দু'টি অর্পণ করার

চেষ্টা করলে তিনি দু'চার সেকেণ্ডের জন্য হাত বাড়িয়ে একটি তোড়া হাতে নিলেন; গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্নেরই ঘোরে বিড়্বিড়্ করে বললেন, "সুন্দর! এই গুল্‌দস্ত!" কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরেই তাঁর হাত আল্‌গা হয়ে গিয়েছে; গভীর নিশ্চিন্ত একটি শ্বাস নিয়ে তিনি আবার স্বপ্নের রহস্যলোকে চলে গেলেন। পাশে, নিকটেই সেই তোড়াটি পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। বুঝলাম না, তিনি তন্দ্রার ঘোরে কোন্‌টিকে স্পর্শ করেছিলেন; অতীত, না বর্তমান?

অতি সন্তর্পণে আমার হাতের তোড়াটি সেই তোড়ার পাশে রেখে দিলাম। সেই ঘুমন্ত মূর্তির উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কৃতি নিবেদন করে যখন বেরিয়ে এসেছি, তখনও গোঁসাই বসে আছে প্রহরীর মতো অবিচল।

স্মৃতির অতলে কালে খাঁ

গুরুদেব শ্যামলালজী আর খলিফা বদল্ খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওজী ও মহিমবাবুর মুখের উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ-ধামার গান শুনে ধ্রুপদের কান তৈরী হয়ে গিয়েছিল। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ-ধামার বলতে আমার স্মৃতি আলোড়িত হয়ে ওঠে ওস্তাদ বিশ্বনাথজী, চন্দন চোবেজী, রাধিকামোহন গোস্বামী, মহিমবাবু, ওস্তাদ লছ্মীপ্রসাদ মিশ্র, ভূতনাথবাবু, এণ্টালির হরিবাবু প্রভৃতি কলাবিদ্ গুণীদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যের স্মরণে। এঁদের কণ্ঠের গান স্মরণ করলেই মনে হয়, সারস্বত পারাবারে স্বর-শ্রুতির তরঙ্গলীলার কী অপূর্ব ভঙ্গীই না প্রত্যক্ষ করেছি! আমার মনের তটভূমিতে সেই উদ্বেলতার কী অনির্বচনীয় অনুভবই আস্বাদ করেছি! শ্রবণাভিরাম উদ্দীপনার গভীরে কতো বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে না নিমগ্ন হয়েছি ক্ষণে ক্ষণে! কথা, সুর ও ছন্দের উত্তাল বিক্ষোভের অন্তরে কী অদ্ভুত ধীরোদাত্ত সংযমের পরিচয় পেয়েছি। সঙ্গীত-বস্তুর অন্য সমস্ত গুণের কথা ত্যাগ করে মাত্র গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য গুণের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করলে মনে হয়—ধ্রুপদ-ধামারেই যেন গীত-রূপের পরাকাষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। ধ্রুপদ-ধামারই ভারতীয় গীতরূপের চরম গৌরব।

মাধুর্যের আবেশ দিয়ে মণ্ডিত সে সব অতীত মুহূর্তের স্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে মনে হয়, যেন গয়ার মৌজুদ্দীনের স্মৃতি দূর দিগন্তের অবগুণ্ঠনে বিদ্যুল্লেখার মত বিলীয়মান হয়ে চলেছে মনের নেপথ্যে। বিশ্বনাথজী আর মহিমবাবুর দীপ্তিমান্ আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্মৃতির আকাশ। ধ্রুপদ-ধামারের সে সব স্মৃতি আমাকে নিয়ে চলে বিশেষ করে মহারাজ নাটোরের ভবনে সঙ্গীতের মজলিসে।

এমন সময়ে একদিন শ্যামলালজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। অভিনব পরিবেশ থেকে নূতন অভিজ্ঞতার সম্পদ্ সঞ্চয় করার সৌভাগ্যকে তুচ্ছ করিনি। অবিলম্বেই আমার হৃদয় আমাকে জানিয়ে দিল—ধ্রুপদ-ধামারই একমাত্র সম্মোহনকারী গীতরূপ নয়; সেই রূপগুলি একমাত্র রূপসজ্জা নয় রাগ-রাগিণীর; বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উপভোগও বুঝি সঙ্গীতের একমাত্র বা

চরম উপভোগ নয়, আমার শ্রবণ ও মনের পক্ষে। সঙ্গীতের বস্তুরূপের বৈচিত্র্য সেই এক অনির্বচনীয় আনন্দেরই বিচিত্র বার্তা বহন করে নিয়ে আসে হৃদয়ের সমীপে; আমার সমস্ত সুরতৃষ্ণা, সমস্ত রস-রুচিকে পরিতৃপ্ত করার যোগ্যতা নেই ধ্রুপদ-ধামার গানে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের প্রমাণ-সম্বলিত টীকাও একটি যোগ করে দিয়েছিল আমার মন; যথা—খেয়াল-ঠুমরী, গজল্-দাদ্‌রা প্রভৃতি অন্য সকল গীতি-কল্পলতিকার মনোহারিত্ব প্রত্যক্ষ করতে থাকলেও তা দিয়ে ধ্রুপদ-ধামারের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না অথবা সে রকম আকাঙ্ক্ষার অবলোপ ঘটে না।

এ সময় থেকে এমন একটি সুলগ্ন আমার জীবনের পূর্ব-গগনে উদিত হয়েছিল, যার প্রভাবে আমার মন-প্রাণ আনন্দ-ভ্রমরের মধুব্রত নিয়ে নানাদিকে নানারকমের গীত-কুসুমের সন্ধানে অভিসার করে ছুটেছে; আর ফিরে এসেছে বাণী, সুর ও ছন্দের মকরন্দ আহরণ করে, নিভৃতে মানসের মধুচক্র রচনা করবে বলে। বার বার কানে বেজে উঠেছে তানসেনের ধ্রুব-বাণী "নাদ ঈশ্বররূপী অমৃত রস, যিত্‌না যাকো মিলে উত্‌নাহি পীজিয়ে।" শ্রুতি-সঞ্জীবনী এই অমৃত রসধারার, এই সুরের সুরধুনীর বিচিত্র রূপ, বিচিত্রতর গতি, বিচিত্রতম পরিণতি। দেশকাল-পাত্রের পরিচ্ছিন্ন আধারের মধ্যে সুনিবদ্ধ রূপই হ'ক, অথবা আনন্দসাগর-সঙ্গমের অভিমুখে এদের উচ্ছল উন্মুক্ত প্রবাহের রূপই হ'ক, অনুভবের সৌন্দর্যই এদের প্রাণতরঙ্গ, অনুভবের চমৎকৃতিই এদের সাক্ষাৎ সার্থকতা। সুন্দরতার মূলে অন্য কিছু আছে কি না, অথবা সাক্ষাৎ চমৎকারিত্বের পরেও কোনও কিছু প্রত্যাশা থাকে কি না, তানসেনের কথায় বুঝা যায় না। ভালই হয়েছে আমার পক্ষে। দার্শনিক তত্ত্বের জালে আমি ধরা দেইনি। আমি মনে করেছি, আমার হৃদয়ের সচ্ছিদ্র অঞ্জলিসম্পুটে অমৃতধারার যে কয়টি বিন্দু যখনই ধারণ করি আর পান করি, তাই আমার ভাগ্য, তখনই আমি চরিতার্থ। এ থেকেও অন্য কিছু, বেশী কিছু আশা করি নি।

সঙ্গীতের বস্তু আর রূপ, এরাই ত সেই অমৃতরসের আধার। বস্তু-রূপগত তারতম্য আমাকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু পীড়িত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইনি আমি। সরল সহজ ভাবেই মনে হয়েছে—বস্তুরূপের নানারকম তারতম্য স্বীকার করেও, তা দিয়ে বড়-ছোট, উচ্চাঙ্গ-নিম্নাঙ্গ মার্গ-দেশী

প্রভৃতি শ্রেণীকরণ কার্যটি হ'ল অকাজ; আসল কথা, অনুভবের কষ্টিপাথরে অভিজ্ঞতা সোনার পরখ। রক্তকমল গোলাপ ফুলের চাইতেও বড়; গোলাপ ফুল উদ্ভট কাঁঠালী চাঁপার থেকেও বড় ও সুসম্বদ্ধ। তবে কি মাত্র রক্তকমলেরই প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা স্বীকার করতে হবে! আমি সেটা মনে করতে পারিনি।

তরুণ বয়সে সজাগ মনের ওরকম আন্দোলনের অবস্থার মধ্যেই অকস্মাৎ খেয়ালী কালে খাঁ সাহেবের কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম। তা থেকেও বড় কথা ছিল তাঁর অদ্ভুত, এমন কি—উদ্ভট কলাচাতুর্য। অনুভবের পরখে খাঁটি সোনাই বুঝেছিলাম। সেই কারণেই ত তাঁর চরিত্র নিরালা, উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার স্মৃতিতে।

কালে খাঁ সাহেবকে সাক্ষাৎ করার পূর্বসূচনা ছিল শ্যামলালজীর বৈঠকে। সে বৎসর, অর্থাৎ ইং ১৯১৪ সালের বর্ষার এক সন্ধ্যা; শ্যামলালজী ও আমরা অল্প কয়জন বসে; মনে পড়ছে বাবুজী, তন্নুলালজী ও চিরঞ্জীবকে মাত্র। বাবুজী ফরাস ছেড়ে পৃথক্ আসনে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছেন। তাকিয়া-কোলে তন্নুলালজী বাবুজীকে সাময়িক সংবাদ গোচর করাচ্ছেন। চিরঞ্জীব তার পোষা হারমোনিয়ামটি নিয়ে, হাত সাধবার আগে পান ও কিমাম ব্যবহার করতে লেগেছে। বদল্ খাঁ সাহেব অনুপস্থিত, বর্ষণের কারণে। গিরিজাবাবু (প্রসিদ্ধ গায়ক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী) বার হয়ে গেলেন বর্ষা মাথায় করে।

এমন সময়ে ভিজে গায়ে এসে উপস্থিত হ'ল ঠাণ্ডীরাম। তার দু'গালে পান বোঝাই করা। কথা বলার উপায় নেই তার; কথা বললেই বিপদ্; অমৃতবিন্দু মুখ থেকে ছিটকে পড়বে, বাবুজীর তিরস্কার শুনতে হবে। নিঃশব্দে নমস্কার জানিয়ে ঠাণ্ডীরাম উবু হয়ে বস্‌ল ফরাসের উপর; ঐ রকমই ছিল তার আসন পরিগ্রহ করার কায়দা। তার দু'গালে দু'হাত, মুখে কিছু দুশ্চিন্তা, মনে হয় ত অস্বস্তি।

ঠাণ্ডীরাম ব্যবসায়ী লোক; বয়স বছর চল্লিশ আন্দাজ। দীর্ঘ কর্মঠ দেহ, অত্যন্ত জোর গলা, অদম্য উৎসাহ, আর জবরদস্ত রসিকতা তার বাইরের পরিচয়। ভিতরের মানুষটি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, রস-ক্ষেপা। সব রকমের সঙ্গীত আর গান, এমন কি, আমাদের আগমনী, কীর্তন ও রবীন্দ্রগীতি শুনেও সে হায় হায় করে; আবেগটা বেশী হ'লে সে যে রকম 'হোয়্ হোয়্' করত,

তার আওয়াজে ফুটপাথের লোক দাঁড়িয়ে যেত! তার সর্ব চেয়ে প্রিয় সুর ছিল মাঢ় রাগিণী; বল্‌ত সে, "পাঁচুবাবু, আমাদের দেশে (যোধপুর অঞ্চলে) সুখা মাটি, রুখা পাহাড়, আর পাথরের ইমারতের উপর যখন চাঁদনি ফুটে ওঠে, তখন যদি আপনি 'মাঢ়' শোনেন, তবেই বুঝবেন এর সওয়াল্‌-জবাব্‌। কল্‌কত্তা শহরের ওস্তাদেরা এর কি জানে! এক রত্তিও জানে না।" আমি যোধপুরে যাইনি। কিন্তু তার দরদ-মাখান কথার সত্যটা বিশ্বাস করেছিলাম।

মুখর ঠাণ্ডীরামের গালে হাত, মুখে দুশ্চিন্তার ভাব দেখে বাবুজী জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাণ্ডীরাম, বাড়ীর খবর ভাল ত? ছেলে ভাল আছে ত?"

বাবুজী বা অন্য কেউ ঠাণ্ডীরামকে তার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমার মনে ত্রাসের সঞ্চার হত। ঠাণ্ডীরামের চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা ছিল তার ছেলের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে অকারণ দুশ্চিন্তা। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে। বাবুজীর কাছে ছেলের অসুখের বর্ণনা করতে গিয়ে ঠাণ্ডীরাম হাঁচি-হেঁচকি প্রভৃতি করে নানারকম উপদ্রবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত গোচর করছিল। আমি তখন গিয়ে সবে উপস্থিত হয়েছি মাত্র। অতিষ্ঠ হয়ে বাবুজী বললেন, "এই নেও ঠাণ্ডীরাম! এই পাঁচুবাবু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এঁকে সব কথা বল"; বলে আমাকে চোখ টিপে ইশারা করলেন,—যার মানে, কিছু মজা আছে। ঠাণ্ডীরাম আমার দিকে ঘুরপাক খেয়েই গোড়া বেঁধে বর্ণনা আরম্ভ করল। অপরাধের মধ্যে আমি তাকে বাধা দিয়ে বলেছি, 'একটু সবুর করুন মহারাজ! দম্‌ নিতে দিন আমাকে, অত দৌড়-ধুপ করার কি আছে।' আর যাই কোথা! ঠাণ্ডীরাম তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুটি করে বলতে আরম্ভ করল, "অরে বাপ্‌! মিটিয়া (মেডিক্যাল) কলেজে পড়তে পড়তেই এই! এর পরে ডাক্‌টর হয়ে আঠ্‌ আঠ্‌ রূপেয়ার গাঁট কেটে হাওয়া-গাড়ির পিছনে ধুঁয়া ঔর বদ্‌গন্ধি ছাড়তে ছাড়তে যখন চলে যাবেন, তখন মেজাজ্‌ না জানি"—; আমি তাকে আর অগ্রসর হ'তে দিলাম না। করজোড়ে বল্‌লাম, "ভাই, থামো, খুব হয়েছে। তোমার ছেলের কি হয়েছে বল।" তার ছেলের কথা শুনে ঠাণ্ডীরাম একেবারে জল। সমস্ত কথা শুনতে হ'ল; সাবধানে মন্তব্য করতে হ'ল, অভয় দিতে হ'ল। ঠাণ্ডীরাম তবে খুশী হয়েছে। বাবুজীর দিকে ফিরে বলল, "বাবুজী! আপ্‌নার সভায় এই পাঁচুবাবু হ'ল আঠ রতনের উপর নও রতন্‌। তবে একটু রচ্‌না-বনানার দরকার আছে। এর হির্‌দেয়মে থোড়া ঘব্‌ড়হাট আছে; ত দু'-

চার বার ঘা খেলে ঠিক হয়ে যাবে!" খুব হাসি তামাশার মধ্যে পরিচয় হলেও—তার ছেলের কথা আমাকেই শুন্‌তে হ'ত; সব কথা ফেলে। যাই হ'ক—ঠাণ্ডীরাম আমাদের সকলেরই প্রিয় ছিল। বিশেষ করে আমার কাছে সে শ্রদ্ধার পাত্রও ছিল অন্য কারণে। আপাততঃ ঠাণ্ডীরামই এমন একটি যোগ-সূত্র এনেছিল, যেটা আমার করায়ত্ত না হ'লে কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখাই হ'ত না।

বাবুজীর প্রশ্নের উত্তরে ঠাণ্ডীরাম মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—সব ভাল। তন্নুলালজী জিজ্ঞাসা করলেন, চড়ি-মন্দীতে কিছু লোকসান গিয়েছে কিনা। সে জানাল, ওসব কিছু নয়। চিরঞ্জীব একটু ঠাট্টার স্বরে বল্‌ল, "ঠাণ্ডীরামের গাঁঠ্‌ কাটা গিয়েছে। ক'টা পয়সা খোয়া গেল ভাই?"

চিরঞ্জীবের কথা শেষ হ'তে না হতেই ঠাণ্ডীরাম লাফ দিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে পিক্‌ ফেলে এসে বলল, "বাবুজী! আজ বড় বোকা বনে গিয়েছি। সিঁদুরিয়াপট্টির মোড়ে পানের দোকানে পান নিতে গিয়ে পাশে নজর করে দেখি, বাবুজী! কালে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে! তাকে বললাম, 'অরে! কালে খাঁ সাহেব কোথা থেকে?' সে আমার দিকে আঁখ্‌ বানিয়ে 'অন্ধা' 'বেহুদা' বলে গালিগালাজ করল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক জওয়ান 'কি হল' 'কি হয়েছে' বল্‌তে বল্‌তে এসে হাজির। আমি দম ধরে থাকলাম; পানওয়ালা খুব কায়দা করে তাদের বুঝিয়ে দিল যে, কিছু হয়নি এমন। পান নিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। আর কিছু নয় বাবুজী, একটা ভাল জবাব মুখে এসে-ছিল, কিন্তু ভয়ে বলতে পারলাম না" ইত্যাদি করে ঠাণ্ডীরাম অস্ফুট স্বরে আরও দু'চারটে কথা বলল, যেটা লিখতে আমারও ভয় করে।

বাবুজী বললেন, "ঠিকই হয়েছে। বে-আক্কিল আর বদমায়েশ, এদের মুলাকাত্‌ হলে ঐ রকমই হয়! আর তুমিই বা কোন্‌ নজর দিয়ে পথে ঘাটে বর্‌থার আঁধেরায় কালে খাঁকে দেখতে পেলে! কাকে দেখতে কাকে বুঝেছ, তার ঠিক নেই।"

ঠাণ্ডীরাম বলল, "না বাবুজী! আমি ঠিক দেখলাম সেই কালে খাঁ! অমন বদ্‌সুরত ত আর দু'টি নেই। কি জানি, কেন তার মতিচ্ছন্ন হ'ল, আমাকে গালি দিল।" বাবুজী বললেন, "অরে না ভাই, না। কালে খাঁ কল্‌কাতায় এলে দুলীচাঁদ কি আমি খবর পেতাম না? আচ্ছা, তুমি যে কালে

খাঁকে চিনলে, তার বাঁ হাতের আঙ্গুলে মোটা মোটা মেজ্‌রাব দেখেছিলে কি ?" ঠাণ্ডীরাম বল্‌ল, "না বাবুজী ! তা ত নজর করার সময় পাইনি। তার মুখ, আর মোচ্‌ আর দেহটাই নজর করেছিলাম। মনে করলাম, হয় কালে খাঁ, না হয় তার ভূত।"

এর পরে চিরঞ্জীব আর ঠাণ্ডীরামের মধ্যে বচসা চল্‌তে থাকে। চিরঞ্জীব আজ ঠাণ্ডীরামকে বাগে পেয়েছে, সহজে ছাড়বে না ; বলল, "তোমাকে বেহুদা বলেছে, ঠিক করেছে। তুমি আগে একটা আদাবও জানাওনি তোমার কালে খাঁকে !" ঠাণ্ডীরাম বলল, "আগে ভাগে লোকটার পহ্‌চান না নিয়ে আদাব জানাবার মত বোকা আমি নই। আদাবটা বরবাদ করব, আমি ঠাণ্ডীরাম !" চিরঞ্জীব বল্‌ল, "তুমি আজ দু'বার বোকা বনেছ। একবার পানের দোকানে, আর একবার এখানে তোমার বোকামির কথা জারি করে" ইত্যাদি করে শেষে চিরঞ্জীব একটা তৈরী পান আর কিমাম দিয়ে নাছোড়বান্দা ঠাণ্ডীরামের মুখ বন্ধ করে দিল।

কালে খাঁর নাম এর পূর্বে মাত্র একবার শুনেছিলাম ওস্তাদ বিশ্বনাথজীর মুখে ; মহারাজ নাটোরের বাড়ীতে বসে। বিশ্বনাথজী স্বল্পভাষী ছিলেন। একদিন কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "খেয়ালী ত রয়মৎ (রহমৎ) খাঁ সাহেব আর কালে খাঁ সাহেব।" চপলমতি আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, ওঁদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট। বিশ্বনাথজী তেমনি গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, কে বড়, কে ছোট, তার মাপ নেইনি। তাঁদের মধ্যে তফাৎ এই যে, রয়মৎ খাঁ কবরে, আর কালে খাঁ কবরের বাইরে। আমার চপলতা দূর হয়ে গেল ঐ রকমের কথা শুনে। সেদিনকার মত আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন ঐ গম্ভীর, রাশভারী, মহানুভব ব্যক্তির স্বরূপের পরিচয় পাইনি। বিশ্বনাথজীর কথাই বলছি।

যাই হ'ক—সে ত গাইয়ে কালে খাঁ। আর আজ যার কথা উঠল, সে কালে খাঁর আঙ্গুলে মোটা মোটা মেজ্‌রাব। অবশ্য মাত্র মেজ্‌রাব দিয়ে যথার্থ পরিচয় হয় না। শ্যামলালজীর বৈঠকে সেরা সেরা পালোয়ান এসে বসত। তাদের দু'একজনের হাতে মেজ্‌রাব দেখেছি। উত্তর-ভারতের একজন অদ্বিতীয় দাবাখেলোয়াড় মাঝে মাঝে এসে দেখা দিতেন বৈঠকে ; তাঁর হাতের আঙ্গুলেও মেজ্‌রাব দেখেছি। নূরজাহান বাঈজীর সঙ্গতী সারেঙ্গিয়া

মিঁঠ্ঠু খাঁর আঙ্গুলেও মেজ্‌রাব দেখেছি। শেষ কথা, দিল্লী থেকে একজন বিশিষ্ট আতর-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এসে বাবুজী আর দুলীচাঁদজীর আতর সরবরাহ করে গেলেন; তাঁর হাতেও ত মেজ্‌রাব দেখলাম। অতএব—?

বাবুজীকেই জিজ্ঞাসা করলাম এই কালে খাঁর কথা; কারণ, তিনিই ত মেজ্‌রাবের কথা তুলেছেন। গড়গড়া সেবনের অবকাশে বাবুজীর মুখে, আর তাকিয়া-কোলে তন্নুলালজীর মুখে কালে খাঁর সম্বন্ধে যা মন্তব্য শুনলাম, তার সংক্ষিপ্ত সার, যথা—কালে খাঁ সাহেব পাঞ্জাবের লোক। ধুঁয়াধার (সমুজ্জ্বল প্রতিভাবান্‌) খেয়ালী; জোড়া নেই ওর। লোকটা কিছু পাগলা, খামখেয়ালী রকমের। দুনিয়াভর সমঝ্‌দার জানে, ঠিক তার মত খেয়াল-গাইয়ে আর নেই; অথচ কালে খাঁর ধারণা, তার মত বীণ্‌কার আর কেউ নেই। তার সামনে অন্য কোনও খেয়ালিয়ার তারিফ করলে অত্যন্ত উদার মনে কালে খাঁ সে কথায় সায় দিয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি কোনও বীণ্‌কার বা স্থরবাহার বাজিয়ের তারিফ করে, তা হ'লে আর রক্ষা নেই; খাঁ সাহেবের মুখখিস্তির চোট খেতেই হবে। হাঁ, চেহারাটা কিছু বে-ঢং বটে। কালো রঙ, লাল ডগ্‌ডগে চোখ, আর তার নীচেই বে-দুরন্ত এক জোড়া মোচ্‌। কালে খাঁর মনটি খুবই ভাল, সরল, খাঁটি। কিন্তু আরও দু'টা বাতিক আছে তার। প্রথম—গহ্‌র নাকি তার জন্য দিওয়ানা। দ্বিতীয়—সে গহ্‌রকে অত্যন্ত ভয় করে, মনে করে—গহ্‌র যাদুগর্‌ণী, ডাইনি, গহ্‌র যার উপর নজর দেয়, সে শুকিয়ে মরে যায়। অবশ্য গোলাম পালোয়ানেরও ঐ রকম অদ্ভুত ধারণা ছিল; বেচারা! আবার কেউ যদি খাঁ সাহেবকে বলে, গহ্‌র যে আপনার জন্য ফকিরী নিল, আপনার গান শুনে পাগল, তা হলে খাঁ সাহেবের মুখ রঙ্গীন হয়ে উঠে। অনেক বড় বড় মাইফেলের শের (শার্দূল) এই কালে খাঁ সাহেব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও গহ্‌র তাকে নিজের বাড়ীর মাইফেলে নিয়ে যেতে পারেনি। মোট কথা, সর্বই ভাল, কেবল ভাগ্য-দেবতা বিরূপ হয়ে ওর মাথায় ছিট্‌ লাগিয়ে দিয়েছে। তা হ'ক, কিন্তু ওর জোড়া নেই।

বৃত্তান্ত শুনেই মনে পড়ে গেল বিশ্বনাথজীর কথা; সেটা বল্‌লাম বাবুজীকে। বাবুজী বল্‌লেন, খুব ঠিক কথা বলেছেন বিশ্বনাথজী। তবে,

রয়মৎ খাঁকে পারা যেত না, খাতির করেই হ'ক বা টাকার লোভ দেখিয়ে হ'ক। রয়মৎ খাঁ ছিল আস্ত পাগল। আর কালে খাঁকে খাতির ক'রে, মিষ্ট কথা দিয়ে পারা যায়, অর্থাৎ গান করাতে পারা যায়। আর ভাল করে খাওয়াতে পারলে কালে খাঁ সাহেব খুব খুশী। টাকার কথা! হায় হায়! বড় বড় গুণীরা সব চিরদরিদ্র। আর কিছু না হ'ক—তারা বেহিসাবী, খরচিলা। টাকা হাতে থাকতে চায় না।

কথায় কথা উঠে প্রসঙ্গ বদলে যায়। এর পর দু'মাস কেটে গিয়েছে। বাবুজী চলে গিয়েছেন তাঁর জন্মস্থান মথুরায়; যাওয়ার সময় বলে গেলেন, সম্ভব হলে চন্দনকে (ধ্রুপদী চন্দন চোবেজী) সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।

কলেজের ছুটি এসে পড়ল; ৺পূজা প্রত্যাসন্ন। বাবা তখন মৈমনসিংহের সিভিল্ সারজন্। একখানি পত্রে লিখেছেন, মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমিদার শ্রীজগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে বজ্‌রং মিশ্র ওস্তাদের ধ্রুপদ গান আর প্রসন্ন বণিক্ ও মৌলবীরাম বাদ্যবিশারদযুগলের সঙ্গত শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আমার জন্য পূর্ব থেকেই নিমন্ত্রণ করা আছে; ইত্যাদি। চিঠি পড়েই, হিতোপদেশের শৃগালের মত ভাবলাম, অহো ভাগ্য! আমার সাম্‌নে ত মহৎ ভোজ্য উপস্থিত! এখন, আপাততঃ দু'চার দিন 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' করেই কাটাতে হয় বুঝি!

এরই মধ্যে একদিন নিকুন্ (আমার সম্পর্কে পিস্‌তুত ভাই, ভাল নাম শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মৈত্র, সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে সংসারসমুদ্রে সাঁতার দিতে খুব ব্যস্ত) আমাকে বলল, "পাঁচ্‌দা, এখন ত সময় আছে। চলুন একদিন ব্যাঁট্‌রায় আমাদের বাড়ী। সকালে যাব, সন্ধ্যায় ফিরব।" আমি বল্‌লাম, "বেশ কথা। চলো যাওয়া যাক্।" নিকুন্ বড় ভাল ছেলে, আর গানপাগলা। তার উপর, সে নিজে যেমন খাইয়ে, পরের খাওয়া দাওয়া তদারক করতেও অগ্রণী। অথচ সে বয়সে সিগারেট পর্যন্ত খেত না; অন্তত আমি যতদূর জান্‌তাম।

পরদিন সকাল আন্দাজ সাতটার সময়ে (রিষ্টওয়াচ হাতে না দিয়েই আমরা সময়ের অপব্যবহার করতাম তখন) নিকুন্ আর আমি আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে হাওড়ামুখো ট্রামে চেপে বসলাম; ট্রামের মাঝামাঝি একটা সারিতে। ভিড় নেই বল্‌লেই হয়, প্রথম শ্রেণীতে। সকাল বেলার হলুদ

রংএর আলো আর আমাদের নবীন মন প্রাণ; কী করি, কীই বা না করি রকমের খাপছাড়া নিরুদ্দিষ্ট উৎসাহে আমরা সর্বক্ষণ সজাগ।

উঠেই লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভারের নিকটে প্রথম সারিতে জানালা ঘেঁসে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বসে; ড্রাইভারের দিকে মুখ করে জানালার মধ্যে দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল সামনের পথের দিকে। সেটা কিছু নয়। আসল কথা, সামনে খাড়া-করা মাপসই একটা লাঠির হাতলের উপর তাঁর দু'হাতের পাঞ্জা ভর করে আছে। এটাও কিছু নয়। সত্যকারের আসল কথা, তাঁর হাতের মোটা মোটা বেঁটে আঙ্গুল, আর বাঁ হাতের অনামিকাকে জড়িয়ে রয়েছে বিলক্ষণ মোটা তারের গোটা দুই মেজ্‌রাব্‌! বিদ্যুতের গতিতে মনে পড়ে গেল—বাবুজী-ঠাণ্ডীরামের মুখে কালে খাঁ সাহেবের বিষয়ে কৌতুক প্রসঙ্গ।

তাও কি হয়! অসম্ভব। কিন্তু ঐ মোটা আঙ্গুলের মোটা মেজ্‌রাব্‌? একেবারে ন-স্যাৎ করেও ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু নেড়েচেড়ে দেখতেই হয়; লোকটা যে সেতার বাজায়, কম পক্ষে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি সেই কালে খাঁ-ই হয়! আমার বুকের ভিতর একবার ধড়াস্‌ করে উঠল। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠিক করলাম—তলিয়ে দেখতে হচ্ছে। এইটাই বোধ হয় অভ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ!

নিকুন্‌কে বললাম, "দ্যাখ্‌, ঐ লোকটি গুণ্ডার সর্দার একজন। কিন্তু খুব ভাল লোক। সেতার বাজায়। চল্‌, ওর সামনে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্‌। তবে, তুই কোনও কথা বলিস্‌নে যেন!" বলেই সেখান থেকে উঠে টপ্‌কে গিয়ে প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। নিকুন্‌ নির্বাক্‌ হয়ে আমার পাশে বস্‌ল। দুর্গা বলে মিথ্যার বেসাতি মাথায় করে নিয়েছি; নিকুন্‌ আমার কথায় বিশ্বাস করেছিল।

ভদ্রলোকটি ঠিক সেইরকমে বসে আছেন। লোকটির চেহারায় প্রৌঢ়ত্ব এসে গিয়েছে, যদিও টুপীর পাশে চুলে সুফেদী পাকধরা দেখা দেয়নি তখনও। একটু কায়দা করে নজর করলাম তার মুখের দিকে; দেখলাম শুধু বড় বড় মোচ্‌, আর পুরুষ্টু ঘাড় গরদান। মাথায় পাত্‌লা ময়লা টুপী। গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবীর উপর পুরান মল্‌মলের মের্‌জাই বা ঐ রকমের একটা ব্যাপার।

এমন সময়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসলেন, আমাদের সাম্‌নাসামনি নজরে।

তখন দেখি, প্রায় চাঁদের মত গোলগাল মুখ ; তবে কৃষ্ণচন্দ্র ; কলঙ্ক বুঝবার উপায় নেই। বড় বড় লাল ড্যাব্-ডেবে চোখের মধ্যে দিয়ে নাকটি নেমে এসে মিলিয়ে গিয়েছে বে-বন্দোবস্ত গোঁফঝাড়ের মধ্যে। ঠোঁট বুঝতেই পারলাম না। চোখের দৃষ্টি যেন একটু বিহ্বল উদাস ; পরিবেশের মধ্যে খুব সচেতন বলে মনে হল না।

আর দেরী নয়। যেন এইমাত্র নজরে এসেছে, এমন ভাবভঙ্গি করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আঃ হা! আদাব্ রজ্ খাঁ সাহেব! আপনি! আপনি ওদিক্ দিয়ে কোথা থেকে আসছেন ?" যেন তাঁকে চিনি, দেখলেই কৃতার্থ হয়ে যাই, আর তাঁর গতিবিধি সবই যেন আমার নখাগ্রে! সেই উদাস মুখে টাকায় ছ'আনা আন্দাজ চেতনার ভাব দেখা গেল ; বুঝলাম, তাঁর চোখের পলক্ নড়ায়। গোঁফে জড়ান কথায় তিনি উত্তর দিলেন, "আদাব্। কাল রাতে রাজাবাজারে দাওত্ ছিল। ফিরছি এখন ডেরায়।" দাওত্ অর্থ নিমন্ত্রণ। রাজাবাজারে কি ধরণের রাজারা বাজার করে, নিকুন্ জান্ত। গম্ভীর হয়ে বসে থাকল সে।

লোকটির চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, আমার বা আমাদের সম্বন্ধে তিলমাত্রও সন্দেহ বা কৌতূহল জাগেনি তাঁর মনে। তিনি আমাকে জানেন না। আমিও তাঁকে জানিনে, চিনিনে, অথচ গোড়াতেই ভাণ করেছি তিনি আমার পরিচিত। এরকম অবস্থায় অতি সন্তর্পণেই ধাপ্পাবাজি চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য,—বৈঠকী আব্-হাওয়ার মধ্যে কিছু গুণী ও ওস্তাদ্ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে অতিরঞ্জিত বিশেষণের কল-কৌশল অল্প-স্বল্প রপ্ত করেছিলাম। তা হলেও লোকটি কোন্ গুণের গুণী, আর কি কর্মের ওস্তাদ, কিছুই জানিনে। যাই হ'ক, আমার মূলধন কল্পনা, আর কারবার হ'ল কথার ফিকির। অগত্যা মিথ্যা বচনের সম্ভার ঘাড়ে করেই এগিয়ে যেতে হবে। বিপদ্ এই যে, লোকটা কথা বলতে চায় না। মুখের ভাবও উৎসাহজনক নয়। বার'বার তাকাই তাঁর আঙুলের মেজরাবের দিকে ; কিন্তু তাতেও তাঁর উত্তেজনা হয় না। এতক্ষণে ট্রাম কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসেছে।

আমিই আরম্ভ করলাম, "হায় হায়, খাঁ সাহেব! কী জলসাই হয়েছিল শেঠজীর বাড়ীতে। হপ্তাভর্ সারা কল্কত্তায় হল্লা উঠে গিয়েছিল। খাঁ সাহেব, সে রকমের কদর্দান আর কি আছে এখন!" অবশ্য কিসের জল্সা,

কার মাইফেল, কার নামে হল্লা এবং কবেই বা ঘটনা ঘটেছে—এ সকল জেরার অবকাশই থাকে না এ রকমের কথাবার্তায়। দেখছিলাম "শেঠজী" নাম শুনে ভদ্রলোকটির ঔৎসুক্য প্রকাশ হয় কি না। শেঠজী অর্থাৎ দুলীচাঁদ শেঠজী।

আমার কথায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ছোট্ট একটি প্রশ্নসূচক 'হাঁ ?' উচ্চারণ করে আমার মুখের দিকে চাইলেন। সেই উচ্চারণভঙ্গির মধ্যে কি পরিমাণ তাচ্ছিল্য, কণ্ঠস্বরের মধ্যে কতখানি অবিশ্বাস, আর দৃষ্টির মধ্যে কতটুকু অবজ্ঞা ভরা ছিল, বুঝতে পারলাম না। মাত্র এইটুকু বুঝলাম, আমার বাণটি ব্যর্থ হয়েছে। দুশ্চিন্তা হ'ল, লোকটি কি সন্দেহ করেন আমি ধাপ্‌পা দিয়ে যাচ্ছি।

মুহূর্তে ভাবলাম, নিজের ভুল-চুক স্বীকার করে বিনীত হয়ে নামধাম জিজ্ঞাসা করলেই ত আপদ্ চুকে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে করলাম, অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি মিথ্যার বেসাতি নিয়ে; এখন পিছিয়ে গেলে নিজের মান রক্ষা হয় না। আর নিকুন্‌ই বা কি ভাববে! ভাবছিলাম, এদিক্ ওদিক্ সাঁতার কেটে জল ঘোলা করব? না কি ডুব দিয়ে দেখব? নিকুন্‌কে, বেশ একটু পরিষ্কার গলায় যাতে ভদ্রলোকটি শুনতে পান, বললাম, "দেখেছিস্ কি! কাজের মস্ত খলিফা ইনি!" নিকুন্ আমার কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়েছে মাত্র। খলিফা বলতে নিকুন্ দরজি, কি নাপিত, কিংবা আর কিছু মনে করেছিল ভগবান্‌ই জানেন।

এমন সময়ে ভদ্রলোকটি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি অস্ত্র ছাড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, "সেই সেবারকার চৌধুরাণের জলসায় আপনি ছিলেন কি ?"

সর্বনাশ! ধনুকের ছিলে নিয়ে টানাটানি করছিলাম, এতক্ষণে বুঝি বাণটি ছিটকে ঘায়েল করল আমাকে। ভদ্রলোকটি কি ধাপ্‌পা দিয়ে আমার ধাপ্‌পাবাজি পরীক্ষা করছেন? তা হলে ত বড়ই বিপদ্! 'সে বার' বলতে কোন্ বার, কোথায়? 'চৌধুরাণ' নামটি জীবনে প্রথম শুনলাম; গোঁফে জড়ান অস্পষ্ট উচ্চারণ, তা হলেও সেটা সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকেরই নাম বা বাঈজীর নাম। কিন্তু—কোন্ জল্‌সা, কিসের জল্‌সা, গানের, না সেতারের, না বিবাহের, কিছুই ত জানিনে। গলদ্‌ঘর্ম হলাম আমি; কারণ,

জ্ঞান-পাপী নিজে। যাই হ'ক, তৎক্ষণাৎ ট্রামের জানলার গরাদের মধ্যে দিয়ে নাক ঝাড়ি, আর রুমাল দিয়ে নাক মুখ মুছি, আবার নাক ঝাড়ি বার কতক। ঐ অছিলায় যেটুকু সময় পেলাম, তার মধ্যেই ঠিক করে নিলাম—হৃদয়-ভেদী বাণ দিয়ে ঐ শব্দ-ভেদী বাণের প্রতিরোধ করতে হয়; নইলে মান-ইজ্জত্ কিছুই থাকে না। রুমাল দিয়ে বেশ করে নাক মুখ মুছতে মুছতেই অস্ত্রটি জিভের আগায় শানিয়ে নিয়েছি।

অস্ত্র ত্যাগ করলাম, অর্থাৎ বল্লাম, খুব আশ্চর্যের ভাব করে—"কি বল্লেন খাঁ সাহেব, চৌধুরাণের জলসা? সে জলসার কথা আর বলবেন না! দোহাই আপনার ইয়াদ্‌গারির! শ্যামলালজী কত কথাই না বললেন! আর গহ্‌র কি গম্‌দিদাই না হয়েছিল, বেচারা!"

'ইয়াদ্‌গারি' অর্থাৎ স্মৃতির অভিজ্ঞান বা নিশানা। 'গম্‌দিদা' অর্থ মহা-দুঃখী। শব্দের অর্থ যাই হ'ক—বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, অস্ত্র বিফলে যায়নি।

দেখি—তিনি তাঁর আসনে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বিড়্‌বিড়্ করে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, আর একবার বাঁ হাতের দিকে, একবার করে ডান হাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'একটা ফুৎকারও ত্যাগ করছেন। তাঁর চোখ মুখের উদাস ভাব কেটে গিয়েছে; সরস চেতনা ও উত্তেজনা উপস্থিত হয়েছে সেই রক্তবর্ণ চোখে, আর গোঁফের ঝাড়ে। মাত্র গহ্‌রের নামেই যে ঐ ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম; এ পক্ষে বাজী ধরতে পারতাম।

সত্য জিনিসটা স্বয়ংসিদ্ধ। অল্পস্বল্প মিথ্যা দিয়ে সত্য আবৃত থাকে বলেই ভাষ্য টীকা করে সেই আবরণ ভেদ করতে হয়। কিন্তু মিথ্যার আবরণেরও একটা সৌন্দর্য, একটা সার্থকতা আছে; নইলে কাব্যের বা অলঙ্কারের প্রয়োজনই ছিল না। ভদ্রলোকটির প্রশ্নের মধ্যে কতটুকু সত্য ছিল আমি জানতাম না; কিন্তু আমার অজ্ঞতার পক্ষে সেইটুকুই ছিল মারাত্মক। মাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই আমি শ্যামলালজী আর গহ্‌রকে জড়িত করে পরিপূর্ণ মিথ্যার একটা বাক্যজাল রচনা করেছিলাম। ঐ অজ্ঞাতকুলশীল লোকটি সেই মিথ্যার জালে পড়ে নিজেই প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনিই কালে খাঁ সাহেব,—যিনি গহ্‌রের নাম শুনলেই অতিমাত্রায় ত্রস্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। আমি বাঁচলাম। কিন্তু—সেই ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন, আমাদের সামনে, ট্রামে বসে! তার স্থানে দেখলাম, কালে খাঁ সাহেব বসে আছেন! এইটুকুই

হ'ল মিথ্যার আবরণের সৌন্দর্য, যেটা সত্যের উদ্‌ভাসকে আরও চমৎকার ক'রে তুলে ধরে আমাদের দৃষ্টিতে। মাত্র এরই জন্য এই সামান্য টীকার প্রয়োজন মনে করেছি। যাঁরা মিথ্যার সুন্দরতার দিক্‌টা না বুঝে কেবল তার কুখ্যাতি করে, আমার মনে হয়, তারা সত্যের প্রতি নির্বিচারে পক্ষপাতগ্রস্ত। তাদের সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। আমি যদি বলি—মিথ্যাও সুন্দর হয়, তারা বলে—সুন্দর-অসুন্দর সমস্ত কিছুই মিথ্যা! আগেভাগে মিথ্যাকে নিন্দিত করে, পরে জগৎকে মিথ্যা ব'লে তারা আর যাই প্রমাণ করুক, তারা যে বিশ্বনিন্দুক, এই সত্যটাই প্রমাণ করে ফেলে। এই বিশ্বনিন্দুকদের আমি বড় ভয় করি। ঐ ভয়টাই আমার একমাত্র ভরসা।

সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল হিন্দুস্থানী ভাষায়। নিকুন্‌ এ ধরণের ভাষা শুনতে অভ্যস্ত ছিল না বলেই নির্বাক্‌ হয়ে বসেছিল। বুঝলে হয় ত অবাক্‌ হ'ত।

খাঁ সাহেবের, এখন থেকে খাঁ সাহেবই বলব, আত্মরক্ষার মন্ত্র আওড়ান শেষ হ'ল। আমারও একটু চৈতন্য হ'ল যে, ট্রাম চিৎপুরের মোড়ে পৌঁছেছে, আর আমাদের সারিতে বেশ একটু ভিড় হয়েছে। খাঁ সাহেব আমাকে তাঁর ঠিক পাশেই খালি জায়গায় উঠে বসতে বললেন। আমি যে একজন বুঝ্‌দার লোক, এ বিষয়ে ত সন্দেহই নেই। নিকুন্‌ সামনে বসে আমাদের মুখভঙ্গী দেখে যাচ্ছিল। বেচারাকে একটু কৃতার্থ করে দিলাম চোখের ইশারা করে। ইশারা বুঝবার মত আক্কেল ছিল তার যথেষ্ট। নির্বাক্‌ নিস্পন্দ হয়ে থাকার মত যে বুদ্ধি আর সংযমের সে পরিচয় দিয়েছিল, তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম সে দিন।

চিৎপুরের মোড় ছাড়িয়ে ট্রাম যখন চলতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়ে খাঁ সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে খিশ্‌খিশে আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁ, হাঁ, ত শ্যামলালবাবু কোন্‌ সে কথা বয়ান্‌ করলেন?"

আমি একটু বিব্রত হলাম এবার। এই মাত্র সঙ্কল্প করেছি যে, মিথ্যার জালটা গুটিয়ে নেই; কারণ, মস্ত বড় একটা সত্যের মাছ ধরা পড়েছে। কিন্তু দেখছি, সেই মাছটি ঐ জালে জড়ীভূত হয়ে থাকতে চায় আরও কিছুক্ষণ! ফলে খাঁ সাহেবের জিজ্ঞাসার তুষ্টি বিধান করতে গিয়ে মিথ্যার জালটা আর একটু প্রসারিত করতে হ'ল; জালের উপরে জুয়াচুরির নক্সা, এ এমন বেশি কথা কি!

জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। কারণ, তখন আমি কলির কল্পলতা দেবী প্রতারণার এক উদ্ভট ও অদ্বিতীয় বার্তাবাহক। জেরা করে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, এমন লোক সেখানে ছিল না।

আমি বিনিয়ে বিনিয়ে বললাম, "শ্যামলালবাবু যে কত কথাই বললেন, সে আর আপনাকে বলে আপনার সুরিলা কানের উপর আফৎ (আপদ্) চড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে না" বলে থেমে গেলাম। এখানে মিটে গেলেও ত রক্ষা পাই।

কিন্তু সেই সরলপ্রাণ খাঁ সাহেব—ভগবান্ তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন, তাঁর শ্রবণ-মননের তৃষ্ণা অত সহজে মেটে না! তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, "না, না, তাতে কিছুমাত্র রন্‌জিদা (দুঃখিত) হওয়ার কথা নেই, কিছু হর্‌জা নেই, বাবু সাব! যা হ'ক কিছু ত বলুন।"

কথায় আছে, মাত্র উপরোধেই ঢেঁকি গেলা যায়। আর আমি অনু-রোধের খাতিরে দু-চারটি বাড়তি মিথ্যা বলতে পারব না!

মৃদুস্বরে আর খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, "তা হলে শুনুন খাঁ সাহেব! কিন্তু আমি কসম্ নিতে পারব না, গুণাহ্ হতে পারে। শ্যামলালজী বল-ছিলেন, গহ্‌র সাত দিন সাত রাত জল পর্যন্ত ছোঁয়নি। চার-চারটে ডাক্-টর ঔর হাকিম এসে ইলাজ করেছে, সুই লাগিয়েছে, কত কী করেছে। লেকিন, খাঁ সাহেব! আপনিই বলুন, জখ্‌মি জিগরের (ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের) উপর কি মরা লোহার সুই আসর করতে পারে? হুশ-বেহুশ গহ্‌র হর্‌দম্ আপনার নাম ক'রে পুকার্ (চীৎকার) দিয়ে উঠেছিল সে কয়দিন। সে আর বয়ান্ করা চলে না।

বর্ণনার মুখে হয় ত আরও কিছু বিভীষিকার সৃষ্টি করা যেতে পারত। কিন্তু প্রয়োজন হয়নি। দেখলাম, এতক্ষণ পরে সেই চাঁদের মত গোলগাল মুখে অল্প হাসির ভাব দেখা দিয়েছে; বদনমণ্ডল ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েছে; নীচের পাটির দু-চারটি বীচি বীচি দাঁতও গোচর হয়েছে। তদবস্থ হয়েই তিনি বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, আপনার সবই জানা আছে বাবু সাব!"

আমি তৎক্ষণাৎ তার একটু চড়িয়ে বেঁধে অর্থাৎ না ছিঁড়ে যতদূর চড়ান যায়—বললাম, "কী বলছেন খাঁ সাহেব, আপনি! দুনিয়াভর লোকের মালুম হয়ে গিয়েছিল সে সব কথা! অখ্‌বারওয়ালারা সে সব খবর জাহির

করতে পারেনি; কারণ, গহ্‌র হুঁশিয়ারি ক'রে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, বেয়াদবী করলে হুরমতের দাবীতে নালিশ করে দেবে। ফের এও ত খেয়াল করুন, বশর্‌তে (কোনও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী) আপনার ইজ্জৎকে ত গহ্‌র প্রাণ গেলেও ছোট করতে দেবে না। কত সম্মান করে আপনাকে ঐ গহ্‌র! আপনি ত দেখছি কিছুই খবর রাখেন না তার!"

কথাগুলি শুনে খাঁ সাহেবের মুখ আবার উদাস, গম্ভীর হ'য়ে গেল! একটা মোলায়েম দীর্ঘ নিঃশ্বাসেরও আমেজ পেয়েছিলাম। এক রকমের তারের যন্ত্র আছে, যাতে মিহি তার জড়িয়ে বাঁধলে ভাল সাস্‌ (শ্বাস, যন্ত্রে সুরের রেশ) দেয়; কিন্তু মোটা তার চড়ালে আওয়াজ খোলতাই হলেও সেই মধুর রেশ আর মোলায়েম সাস্‌ থাকে না। খাঁ সাহেব বোধ হ'ল এই রকমেরই একটি যন্ত্র! কত রকমের মজার যন্ত্রই না তৈরি করে পাঠিয়েছেন বিশ্বকর্মা! বাইরের কাঠ-চামড়া দেখে ভিতরকার খবর পাওয়া যায় না। ঠিকমত তার চড়িয়ে একটু বাজিয়ে দেখলে তবে কিছু রেশ আর সাসের মজাটা বোঝা যায়। আর যে যন্ত্রের ধ্বনির মধ্যে রেশ নেই, সাস্‌ নেই, সেটা ত মরা কাঠ আর শুখন্‌ চামড়া দিয়ে তৈরি-করা ঘর-সাজান আস্‌বাব মাত্র।

সেই গোঁফে-জড়ান সুরে খাঁ সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "হাঁ হাঁ, নিশ্চয়। খুব সহি কথা বলেছেন আপনি"; বলে থেমে গিয়েই বাইরের জগতে রাস্তার দিকে নজর করলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি আর থাকতে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে সরল সশ্রদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বলে ফেললাম, "খাঁ সাহেব! আমরা হাওড়ার তরফে জানেওয়ালা ছিলাম। কিন্তু আপনার মত গুণী লোকের দর্‌শন পাওয়া ত নেহাৎ কিস্‌মতের (অতিশয় সৌভাগ্যের) কথা। যাই হ'ক, আমরা এখন আপনার খিদ্‌মতে হাজির। আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করব। যদি অনুমতি করেন, আমরা আপনার সঙ্গে আপনার ডেরায় যেতে তৈয়ার আছি।"

এ কথা অসন্দিগ্ধ সত্য যে, নিকুনের প্রস্তাবমত কাজটা, অর্থাৎ আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে হাওড়াগামী ট্রামে চড়ে বসার কাজটা পাঁচ মিনিট এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'লে খাঁ সাহেবের সঙ্গে সে দিন দেখাই হ'ত না; এ জীবনেই হ'ত না।

কারণ, এ থেকে কয়েক দিন পরে খাঁ সাহেবের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম, তিনি ঢাকায় চলে গিয়েছেন; আর সেখান থেকে ফিরে আসার খবর পাইনি আমি। শেষ কথা, ঠাণ্ডীরাম যদি একটি ক্ষীণ সূত্র কুড়িয়ে না নিয়ে আসত, তা হলে শ্যামলালজী-তন্নুলালজী প্রসঙ্গই করতেন না। আর আমরা ট্রামে বসে ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে হয় ত আলাপ করতাম না।

আমার কথা শুনে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "তা হলে চলুন আমার সঙ্গে", বলে আস্তে আস্তে ট্রাম থেকে নামলেন। আমরাও নামলাম তাঁর পেছু পেছু। বন্‌ফিল্ডস লেনের নিকটে একটি সরু গলির মধ্যে দিয়ে আমরা যখন তাঁর অনুগমন করছি, দেখি—মাঝে-মাঝে পথ চলতি দু-পাঁচ জন লোক খাঁ সাহেবকে 'বন্দগি' জানিয়ে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আপন আপন কাজে চলে গেল।

সে গলির এমন গড়ন-পেটন যে, মনে হল—সূর্য কখনও তাকে বে-আবরু করতে পারে না। এতক্ষণে নিকুনের মুখ ফুটল; জিজ্ঞাসা করল, "পাঁচ্‌দা! ব্যাপার কি? কিছুই ত বুঝছিনে।" তার গলার আওয়াজের মধ্যে ভয়ের খাদ ছিল।

আমি গম্ভীর দৃষ্টিতে নিকুনের পায়ের দিকে তাকালাম। তার পায়ে নূতন চক্‌চকে 'সু' জুতা। নিকুন্‌ ও তার জুতার মধ্যে পরস্পর গোলামী সম্বন্ধ ছিল চিরকাল। জুতার সেবা করতে নিকুনের মত লোক দেখিনি; নিকুনের জুতার মত অমন নিত্যসহচর গোলামও দেখিনি। নিকুন্‌কে বললাম, "জুতার ফিতে আল্‌গা করে ফ্যাল; যত শিগ্‌গির পারিস।" বিস্মিত হয়ে সে বলল, "কেন? তার মানে?"

আমি চুপে-চাপে বললাম, "বলা যায় না ত কি হয়। যদি দৌড় ধরতে হয়, চট্‌পট জুতা খুলে নিয়ে হাতে করে দৌড়তে পারবি। জুতার মায়াটা তোর বেশী কি না, তাই বলছি। আমার পুরান এলবার্ট স্লিপার, ফেলে দিয়েই দৌড়ব। বুঝলি কি না।"

নিকুন্‌ থমকে গেল। বলল, "কী যে বলছেন আপনি তার ঠিক নেই। এতক্ষণ গহ্‌র-টহর্‌ কত কী নাম করে গেলেন। আবার এখন বলছেন সাবধান হতে! কাজে কাজ নেই পাঁচদা! ফিরে যাওয়া যাক", বলে হাত চেপে ধরে আমার! নিকুন সত্য সত্যই ভয়ে ইতস্তত করছে দেখে

আমি খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলাম। তখন সে আশ্বস্ত হয়ে চলতে লাগল। অবশ্য নিকুন্ যে বিলক্ষণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিল, এ কথা তার শত্রুরাও স্বীকার করত।

খাঁ সাহেব একটি বাড়ীর দরজায় থামলেন। বাড়ীর নম্বর বুঝবার উপায় ছিল না; আমাদের পকেটে দেশলাই থাকত না। কিন্তু আমার চোখ বেঁধে দিলেও সে বাড়ী ঠাহর করে নিতে পারতাম তখন। সে গলিতে খোলা চোখ আর বাঁধা চোখ দুই-ই সমান। দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে দু দিকের বাড়ীর দেওয়াল ছুঁয়ে চলা যায়। এমনি সুন্দর ব্যবস্থা সে গলির।

দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। খাঁ সাহেব এমন ভাবে আমাদের চলে আসতে বললেন, যেন সেটা তাঁর নিজেরই বাড়ী। দুর্গানাম স্মরণ করে খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলাম; পুরান ঢংএ খিলান-করা ঘুট-ঘুটে প্রবেশপথ দিয়ে। অল্প অগ্রসর হয়ে মোড় ফিরতেই একটি দেড়-মহল্লা বাড়ীর খোলা উঠান দেখা গেল। লোকজনের নাম-গন্ধ নেই। একটা তেলাপোকা নেই, টিকটিকিও নেই!

ডান দিকে ঘুরে খাঁ সাহেব বাঁহির-বাড়ীর সংলগ্ন একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন; আমরাও মহাজনের পদানুসরণ করলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে একটা দেয়ালের ব্যবধানে অনতিদূরে একটি ছোট চত্বর দেখলাম; তার পাশেই একটি শূন্য চণ্ডীমণ্ডপও প্রকাশ পেল। সে জায়-গাটা পায়রাদের অবাধ লীলাভূমি হয়ে অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়ে আছে। অপরিষ্কার চণ্ডীমণ্ডপ দেখে নিকুন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বাড়ীটা তা হলে হিন্দুরই নিশ্চয়।

সিঁড়ির শেষে উপরে অপ্রশস্ত বারান্দায় উঠে খাঁ সাহেব ঘুন্সিতে বাঁধা একটি চাবি দিয়ে খুব কায়দা করে ডান দিকে একটি ঘরের তালা খুলে ফেললেন; দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে আমাদেরও আসতে বললেন নিঃসঙ্কোচে। ঘরের মধ্যে উপস্থিত হলাম আমরা। দেখলাম, জারুল কাঠের উলঙ্গ তক্তাপোষ; কোণে একটি জড়ান মাদুর, ঠেশ দেওয়া; তার পাশে মেঝেতে একটি বদনা; একটা লম্বালম্বি দড়িতে ময়লা গেঞ্জি, লুঙ্গি, ল্যাঙ্গোট আর একটি ধূসরবর্ণের গামছা টাঙ্গান রয়েছে। এর অতিরিক্ত আর কোনও আসবাব বা ছবি সে ঘরে ছিল না। পাশেও একটি ঘর আছে, কিন্তু

তালা লাগান। ঘরের দু'টি জানালা; একটি খাঁ সাহেব নিজহাতে খুলে দিলেন। এরকম রিক্ত পরিবেশের মধ্যে অমন একজন নামজাদা গুণী কি করে থাকেন, ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তাঁর কোনও সাথী বা সঙ্গী সেখানে বাস করে, এমনও ত লক্ষণ বুঝলাম না।

খাঁ সাহেব ঐ ছ-পায়া তক্তা দেখিয়ে দিয়ে আমাদের বললেন, "আপনারা বসুন, আরাম করুন", বলে গায়ের মেরজাইটা খুলে দড়িতে টাঙ্গিয়ে দিলেন, লাঠিটা এক কোণে ঠেশ দিয়ে এলেন, আর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি রুমাল বার করলেন। খাঁ সাহেব আসন না নিলে আমরা বসতে পারিনে। তিনি ঝপ করে বসলেন তক্তার একদিকে। ডবল সাইজের তক্তা সেটা। খাঁ সাহেবের বসার সঙ্গে সঙ্গে তক্তার একটি পায়া আওয়াজ দিল 'ঠিক্'। বুঝলাম—সেটা খাঁ সাহেবের গুরুত্বের প্রতি সেলামী নিশানা। আমি একটু ব্যবধান করে সাবধানে বসে পড়তেই তক্তাটি বলে উঠল 'ঠিক্'। অদ্ভুত! আমরা অতিথি; এটা বোধ হয় অতিথির সেলামী। নিকুন্ ভয়ে ভয়ে আমার পাশে বসতেই তক্তা আওয়াজ দিল 'ঠি-ঠিক্'। নিকুন্ অবাক্।

রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাঁ সাহেব হাওয়া খেতে লাগলেন। এরই মধ্যে বোধ হয়, ঐ তক্তাপোশের স্বভাব-চরিত্র পরীক্ষার ছলে নিকুন্ একটু ঝুঁকে তক্তার নীচের দিক্‌টা দেখে নিল। বেচারা ছেলেমানুষ! কখনও মেসে থাকেনি। জারুল কাঠের তক্তার জাতিধর্মের কথা বুঝতো না সে। তার অজ্ঞতা দেখে দুঃখ হল; আবার তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি দেখে আনন্দও হল। তাকে একটু জ্ঞান দিলাম তখুনি। বল্‌লাম, "কল-কব্জা-জোড়ের ব্যাপার নয় রে; ওর কারণ আলাদা।" চোখ-ভরা জিজ্ঞাসা দিয়ে সে তাকায় আমার পানে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম, "ওর মধ্যে কারিগরী নেই, ওটা হল পূর্বজন্মের স্বভাব। পূর্বজন্ম মানিস ত?" নিকুন্ হাঁ করে থাকে। বললাম তাকে, "এক রকমের লোক আছে, যারা রক্ত-মাংসের মানুষের মুখে গুরু-গৌরবের কথা শুনেই 'ঠিক্ ঠিক্' করে, বিচার করে দেখে না একটুও। সে সব লোক মরে জারুল কাঠের তক্তা হয়ে জন্মায়। অল্প ভার বা গুরুত্বের ছোঁয়াচ পেলেই পূর্বজন্মের স্বভাববশে বলে ওঠে 'ঠিক্ ঠিক্'। স্বভাব যায় না ম'লে, এটা ত জানিস!" আমার জ্ঞানের বহর দেখে নিকুন্ স্তম্ভিত হয়ে যায়। নিকুন্ ত সোনার ছেলে! কত বড় বড়

নাস্তিকদের ঘাল করে দিয়েছি ঐ জারুলের তক্তার তত্ত্বকথা বলে। জন্মান্তরবাদের সপক্ষে অতবড় প্রমাণও আর নেই ঐ জারুলের তক্তার মতো। তা হলেও সুধী পাঠককে একটা কথা বলে রাখি। এরকমের কথা যাঁরা পরীক্ষা-বিচার না করেই মনে মনে 'ঠিক্' বলবেন, তাঁদেরও নিদারুণ দারুময় জারুলের তক্তা হয়ে জন্মান্তর পরিগ্রহের সম্ভাবনা থাকল! অনুপ্রাসটা মাত্র প্রসঙ্গের বশেই এসেছে; ওটা কিছু নয়।

বেশি ক্ষণ চুপ করে থেকে লাভ নেই। খাঁ সাহেবকে বল্লাম, "কিছু হুকুম ফরমায়েশ করুন মেহেরবানি করে।" খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, "আপনার কাছে সিগারেট আছে?" আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। বল্লাম, "এক মিনিটের মধ্যে আনিয়ে দিচ্ছি"; বলেই, নিকুন্‌কে বললাম পান-সিগারেট-জরদা নিয়ে আসতে বড় রাস্তার সেই মোড়ের দোকান থেকে। নিকুন্ নড়েছে কি তক্তার আওয়াজ হ'ল 'ঠিক্'! হঠাৎ একটা খেয়াল হ'ল। খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু নিম্‌কি মিঠাই আনিয়ে নেব কি?" নিম্‌কি অর্থ যে কোনও নোন্‌তা খাবার। কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লৌকিকতা না করে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, কুছ্ পুরি-জিলেবিভি মঙ্গাইয়ে। ক্যা হরজ্?" অর্থাৎ সেই আসন্ন শরতের প্রাতে যদি দোকানীর দোকান থেকে পান-সিগারেট সমেত পুরি-জিলিপি প্রভৃতি কিছু বস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাতে জগতের কার কী এমন ক্ষতি বা আপত্তি হতে পারে! বাস্তবিক কথা, ক্ষতি আমার নয়, খাঁ সাহেবের নয়, দোকানীর ত নয়ই। আর নিকুন্‌ও আপত্তি করতে পারে না; কারণ, ট্রামে উঠবার আগে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যাওয়া-আসার সমস্ত খরচ, মায় রাস্তায় (ভগবান্ না করুন) কোনও অপঘাত হলে টিংচার আওডিন ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতির সমস্ত খরচ, অধিকন্তু সাময়িক জল-যোগের খরচ—ইত্যাদি করে সমস্ত রকমের সম্ভাবনার জন্য সে প্রস্তুত; এতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে সে আমাকে। অতএব নিকুন্‌কে বললাম, "টাকা-খানেকের মতো কচুরি জিলিপি নিয়ে আসবি; পুরিও নিয়ে আসবি, যদি পাস; হালুয়া আর তরকারি ফাউ নিবি বেশি করে। তা ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেট, একটা দেশলাই বাক্‌স, পান আর জরদাও নিয়ে আসবি। মিঠা পান, মনে থাকে যেন!" নিকুন্ ভাল-মানুষের মতো তক্তা ছেড়ে উঠেছে কি আওয়াজ হল 'ঠিক্-ঠিক্'। নিকুন্ চলে গেল।

গম্ভীর হয়ে খাঁ সাহেবকে বললাম, "খাঁ সাহেব! খুব হুশিয়ার আর আজব্ তখ্ত (সিংহাসন) এইটে আপনার! এর আদমিয়তি (মানবতা) এসে গিয়েছে, মানুষের মতো জবাব দিচ্ছে! দু'চার রোজ বাদে হয় ত রেখব-গান্ধারও বলতে থাকবে মনে হচ্ছে; আপনার মতো গুণীর সঙ্গত্-সুহবত্ (সঙ্গ ও মিলন) পেলে কী না হতে পারে!" খাঁ সাহেব সম্ভবত হাসবার চেষ্টা করেছিলেন; তাঁর চোখ বুজে গেল, গোঁফজোড়া উঁচু হ'ল, মুখব্যাদানও হ'ল। কিন্তু হাসি এতই গভীরে ছিল যে, বাইরে প্রকাশ হল না। মাত্র বললেন, "আপ দিল্লগি কর্ রহে হ্যায়।" অর্থাৎ আপনি বুঝি ঠাট্টা করছেন। বুঝলাম, খাঁ সাহেব ও-ধরণের কথার রস গ্রহণ করলেন না।

প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "খাঁ সাহেব, আপনার সাজ্ (বাদ্যযন্ত্র) কোথায় রেখে এসেছেন?" অর্থাৎ আমি তাঁর বীণার কথাই তুললাম। তিনি যথেষ্ট সপ্রতিভ হয়ে বললেন, "লাহোরে রেখে এসেছি তাকে, মেরামতের জন্য। তুম্বার যোড়ী বিগড়ে গিয়েছে তার।" তুম্বার যোড়ী অর্থাৎ বীণার লাউ বা বংশের যুগল।

প্রসঙ্গত কিছু বলতে হচ্ছে, যা পরে জেনেছিলাম। কলকাতার মান্যগণ্য গুণী ও গুণগ্রাহকেরা, যথা—বিশ্বনাথজী, বদল্ খাঁ সাহেব, শ্যামলালজী প্রভৃতিরা কেউ চর্মচক্ষে কালে খাঁ সাহেবের বীণা দেখেন নি। তবুও তাঁরা বলতেন, কালে খাঁ সাহেব বীণা বাজাতেন। আমার ধারণা, খাঁ সাহেবের বীণা একটা ছিল নিশ্চয়ই। পরে অর্থাৎ ইং ১৯১৯-২০ সালে ইন্দোরের প্রসিদ্ধ বীণ্‌কার মজিদ্ খাঁ সাহেবের বীণাবাদনে বিশিষ্ট একরকমের কারিগরী শুনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, কালে খাঁ সাহেব বীণা শুধু বাজাতেন নয়, ভালই বাজাতেন; কিন্তু এ সব কথা পরে হবে।

তখনকার প্রসঙ্গে মনে হয়েছে—কালে খাঁ সাহেব কিছুদিনের খেয়ালে বীণা বাজিয়ে সেটা ত্যাগ করেছিলেন; মেরামতের অজুহাতে? বীণ্ বাজান বা পুষে রাখার কাজে এত ঝঞ্ঝাট যে, এর মোহ কাটান খুবই সহজ। তিনি যে বললেন, সেটা মেরামত করতে দিয়ে এসেছেন, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি। তবে, ঐ ঘটনাটি সম্প্রতি না হয়ে সম্ভবত বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঘটেছে। হয় ত সেই মেরামতী বীণ লাহোরে কোনও দোকানঘরে নিভৃতে ঘুণ সঞ্চয় করে মিথ্যা

প্রপঞ্চের মায়া ভেদ করছে। হয় ত বা সেই দোকানঘরটিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে; অথবা দোকানের মালিক নির্বংশ হয়ে গিয়েছে। তবুও খাঁ সাহেবের মনে সেই বীণাটি যেমন-কে-তেমনই আছে। কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে বুঝেছিলাম, তাঁর অন্তঃকরণ হীরকের মতই স্বচ্ছ। সেই হীরার বনাই, যাকে বলে "কাটিং" একটু এলোমেলো, অসমান। অন্ধকারের মধ্যে একটু বে-কায়দায় নাড়াচাড়া হলেই অতীত ও বর্তমানের সঙ্গতি অসঙ্গতি সব এক-সঙ্গে ঠিক্‌রে পড়ত তাঁর হৃদয় থেকে। কিন্তু যখনই সেই হৃদয়ে সুরের আলো জ্বলে উঠেছে, তখনই সেই অদ্ভুত প্রতিভা আর প্রভাবের মধ্যে অবলীন হয়ে গিয়েছে সমস্ত বিরূপতা বিসদৃশতা। মিথ্যা প্রবঞ্চনার অতীত ছিল সেই আত্মা, যে গহ্‌র বাঈজীকে ডাইনী মনে করে শিউরে উঠত, আর নিজেকে সবচেয়ে বড় বীণ্‌কার মনে করে নিরীহ রকমের আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন হ'ত মাঝে মাঝে। গহ্‌র ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। বিধির বিচিত্র বিধানে একটি নিন্দার কালিমা তাঁর জীবনকে ছায়ার মত অনু-সরণ করেছিল, যদিও সেই জ্যোতির খর্বতাসাধন করতে পারেনি; কেউ বলত—তিনি যাদুগর্‌ণী, ডাইনী, কেউ বা বলত—তিনি বিষকন্যা, যার সংস্রবই মারাত্মক! সত্য বা মিথ্যা যাই হোক—কালে খাঁ সাহেব ঐ খ্যাতি এবং নিন্দার সমস্তটাই বিশ্বাস করতেন সরল মনে। আর নিজেকে বীণ্‌কার মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করাটাই বা কি এমন বিচিত্র কথা, যখন দেখি—বেসুরা গান গেয়ে, বেতালা বেকায়দায় নেচে শত শত লোক আত্মবিমূঢ়! পরপীড়ন হচ্ছে কি না, জ্ঞান নেই ধ্যান নেই ধারণা নেই এদের! বরং আমি মনে করি, কালে খাঁ সাহেবই ভাল। তিনি মনে মনে মনোবীণা বাজাতেন; মেজ্‌রাব দু'টি বাঁ-হাতের আঙুল ছেড়ে ডান-হাতের আঙুলে চড়ে বসত না। পরপীড়নের প্রশ্নই উঠে না তাঁর পক্ষে।

কথায় ফিরে যাই। খাঁ সাহেবের শরীর মেজাজ ভাল আছে কি না, জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানালেন, মন-মেজাজ ভাল নেই তাঁর; ছ' মাস কেটে গেল, একটাও মাইফেল রোজগার হ'ল না; যার বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সে বেচারা সেবা-খবরদারি করতে জানে না ওস্তাদ মুরশিদ্ (গুরু) লোকের। আর তবিয়ৎ ভাল থাকা? কি করে ভাল থাকবে! বলেই তিনি টুপী আর গায়ের পাঞ্জাবী খুলে ফেললেন। এতক্ষণে বুঝলাম, তিনি

সেই মেরজাইটা ভিতরে পরেননি কেন। তাঁর বুক-পিঠ দাদের মত চর্মরোগে ছেয়ে ফেলেছে। তিনি কখনও গোসল করেন বলে মনে হ'ল না। বুক-পিঠ চুলকাতে চুলকাতে তিনি বল্লেন, রাতে ঘুমই হয় না, এতে কি তবিয়ত ঠিক থাকে বাবুসাব? দেখে শুনে আমার মন বিষাদে ভরে গেল। যত বার তাঁর সেই উদাস দৃষ্টির ছবি আমার মনে জেগে উঠে, তত বারই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, এখনও পর্যন্ত। ছলনা আর মিথ্যা কথা দিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করেছিলাম, এতে আমার মনে অপরাধ বোধ হয়নি, হয় না। কিন্তু ঐ যে সামান্য ছ'পায়া সিংহাসনের কথা দিয়ে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করে-ছিলাম, সেটা যে নির্মম হয়ে আমার অজ্ঞাতসারে তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষপাত হয়ে থাকবে—এ কথা মনে ক'রে আমি অনুতপ্ত হয়েছি; এখনও অনুতাপ করি। তিনি যে রসিকতা বুঝতেন না, এমন ধারণা নেই। কিন্তু সেই চপলতার বশে রসিকতা তাঁর পক্ষে শেলসম মনে হয়েছিল, এই চিন্তাটাই আমাকে পীড়িত, লজ্জিত করে এখনও।

জিজ্ঞাসা করলাম, "খাঁ সাহেব, আপনি শ্যামলালজী দুলীচাঁদজীর মত মুরুব্‌বী লোকদের খবরাখবর নিলেন না কেন? তাঁরা যে আপনার গুণে মুগ্ধ।"

অকুণ্ঠিতচিত্তে খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন, "কেমন করে তা হবে বাবুসাব! একটি সাফা মুরেঠা আর এক জোড়া সাফা কুরতা-পায়জামা ব্যবহার করিনে। কারণ, একদিনের ব্যবহারে ময়লা-কুচ্‌লা হয়ে যাবে। রইস্ (সম্ভ্রান্ত) লোকদের বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি করতে হলে হর্‌বখ্‌ত্ সাফ কাপ্‌ড়া-লত্তার দরকার" বলে থেমে গেলেন। ফের বললেন, "খএর, না গেলাম ত নাই বা গেলাম। খোদা যে দিন আমার মাথায় মুরেঠা চড়িয়ে দেওয়ার মর্জি করবেন, সেই দিনই চড়বে, নয় ত নয়।"

অদ্ভুত, অতুলনীয় সেই অভিমানের কথা আর সুর আমার কানে লেগে রয়েছে। ক্ষোভের মুরেঠা অভিমানের বাক্সে বন্ধ করে খাঁ সাহেব নিবেদন করে রেখে দিয়েছিলেন খোদার মর্জির উদ্দেশ্যে! মাত্র এক রাত্রির মাইফেলে তাঁর মাথায় রক্তজবা রং-এর মুরেঠা দেখেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, অমন অপূর্ব রং আর শোভা ত আর দেখিনি। খাঁ সাহেবের অন্তর্ধানের পরে বার বার মনে হয়েছে, ও-রকমের মুরেঠা উত্তর-ভারতের দোকানে হাজার হাজার পাওয়া যাবে নিশ্চয়; আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফেটিয়ে নিয়ে

মাথাটাও ভারী আর জমকাল করা যেতে পারে। কিন্তু সেই রাত্রির সেই অপূর্ব রাগরঞ্জিত শিরশ্চালন, আর আত্মভোলা আবেদন ত দোকান থেকে পাওয়া যায় না।

এমন সময়ে নিকুন্ রসদ নিয়ে ফিরে এল। বলতে নেই, তখনকার দিনের হিন্দুস্থানী হালুইকরদের তৈরী এক টাকার পুরী, কচুরি, জিলিপি, মায় হালুয়া আর তরকারী! খাঁ সাহেব বাক্যব্যয় না করে অনায়াসে উদরসাৎ করলেন। খাঁ সাহেব প্রায় শেষ করে এনেছেন দেখে বল্লাম, 'খাবার জল আনিয়ে দিই?' মিথ্যা কথা বলব না; পাত্রের মধ্যে মাত্র একটি বদ্না। সেটা আমি কিছুতেই ছুঁতে পারতাম না। কিন্তু তাঁর যৎসামান্য সেবা করতে কুণ্ঠিত ছিলাম না মোটেই। তিনি হুকুম দিলে যেন তেন প্রকারেণ, অন্তত দোকানের মেটে শরবতী খুরি করেও জল এনে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যাই হোক, তিনি ঠিক সেই মুহূর্তে গুটিকয়েক কচুরী আর খান-দু'ই জিলিপি একসঙ্গে চর্বণ-পেষণের কার্যে রত ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি বাঁ হাতখানি ঊর্ধ্বে উঠিয়ে এমন করে নেতিবাচক সঙ্কেত করলেন, যাতে করে মনে হ'ল, তাঁর পক্ষে জল খাওয়াও যা, বিষ খাওয়াও তাই। খাওয়া শেষ হ'লে পাতাগুলি উঠিয়ে নিয়ে আর বদনাটি নিয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন মুখ হাত ধুতে।

নিকুন্‌কে আমি বললাম, "তবু ত কাল রাত্রিতে খাঁ সাহেবের নিমন্ত্রণ ছিল—"; আর বলতে হ'ল না। নিকুন্ হাসি চাপতে গিয়ে গলায় বিষম লাগে, আর যত বার কাসতে যায়, তত বার তক্তাপোশটি বিরক্তির আওয়াজ করে শাসিয়ে দেয় নিকুন্‌কে।

আমাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল, খাঁ সাহেবকে একটা মুজ্‌রা পাইয়ে দিতে হয়। শেষে আমি বল্লাম, "দাঁড়া, আগে একটু গলার সুর শুনে নিই, তার পর সে চিন্তা।" নিকুন্ বলল, "ইনি কি সহজে গাইবেন?" আমি বললাম, "দেখাই যাক না একটু চেষ্টা করে; ক্ষতি কি।"

খাঁ সাহেব বদ্না হাতে উঠে এলেন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে; গামছায় মুখ-হাত মুছে নিলেন। পরে তক্তাপোশের এক ধার ঘেঁসে এমন করে চিৎ হয়ে শুলেন, যাতে আমাদের অসুবিধা না হয়; যেন সকাল বেলার সব কাজ মিটে গিয়েছে; বাকি শুধু আরাম করা। আমি বললাম,

"খাঁ সাহেব, পান খান, সিগারেটও মজুদ রয়েছে আপনার জন্য।" তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, ঠিক কথা। ওটা আমার খেয়াল থেকে উত্‌রে গিয়েছিল"; বলেই উঠে বসলেন। পান মুখে পুরলেন। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেট ধরিয়ে বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল আর তর্জনীর গোড়ার মধ্যে তাকে কয়েদ করে লম্বা লম্বা টান দিতে থাকলেন। দেখলাম, মুখে আবার সেই উদাস ভাব এসেছে, চোখের দৃষ্টি দূরে চলে গিয়েছে।

বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "গোস্তাকি মাফ করেন ত একটা আরজ্ করি খাঁ সাহেব!" তিনি অবিচলিতভাবেই বল্‌লেন, "হাঁ হাঁ, কহিয়ে বাবুসাব।" আমি বললাম, "আপনার গলার একটু সুর একটু ছেড়্-ছাড় শুনতে পাব কি?" ঠিক করেছিলাম সরল মানুষটির সঙ্গে সরলভাবেই কথা চালিয়ে যাব এখন থেকে।

তিনি ছোট্ট একটি হাই তুলে বললেন, "এখন বখ্‌ত নয়, মেজাজও আসছে না", বলে একটু থেমে বোধ হয় করুণা করেই বললেন, "খএর মওকা মিলনে পর কভি সুনাউঙ্গা", অর্থাৎ যাই হ'ক, সুযোগ হলে কোনও না কোন দিন শোনাব'। প্রশ্নের খুব সরল জবাব। অবশ্য এ ছাড়া আর কী হতে পারে! সামান্য কচুরি-জিলিপির ভোগ দিয়ে যদি কালে খাঁ সাহেবের মত লোকের মন ভিজান যেত, তা হ'লে ত ভাবনাই ছিল না।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। ভাবছিলাম, খাঁ সাহেব আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কি জন্য, কি উদ্দেশ্যে। আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাতঃকালীন 'নাস্তা'টা (জলযোগ) সেরে নেওয়ার জন্যে নয় নিশ্চয়ই; সে মানুষই নন খাঁ সাহেব। তবে কি জন্যে? তখন ভেবে ঠিক করতে পারিনি। এই নির্জন আবাসে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গলাভ করা? মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য? কি জানি!

পরে ভাবলাম, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না। অথচ এক কলসি ঘি সামনে রয়েছে। একটু নমুনা দেখবার চেষ্টা করতেই হবে। আমি যে কত বড় বেহায়া, খাঁ সাহেব ত স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

আবার বললাম, "খাঁ সাহেব! এই বে-শরম না-লায়েক আপনার সামনে আর একটি আরজ্ পেশ করতে ইচ্ছা করে, যদি আপনার ইজাজত

(অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি) পাই।" তিনি নির্বিকার চিত্তে বললেন, "হাঁ হাঁ, কহিয়ে আপ।" তখন আমি বললাম, "খাঁ সাহেব, একখানা উত্‌রি রেখব-ওয়ালা (কোমল রেখব দেওয়া) আসাওরির চিজ্ (জিনিষ, গান) পেয়েছি। কিন্তু অল্প একটু বাঢ়ত্ ফিরত্ করতে গেলে উত্‌রি রেখবের ইজ্জত্ থাকছে না। যাই হ'ক, রাগের শকল্ (চেহারা) ঠিক আছে কি না, যদি কৃপা করে"—বলেই বদ্ধাঞ্জলি হলাম। অর্থাৎ এই না-লায়েক নির্লজ্জ পাঁচু সাণ্ডেল কালে খাঁ সাহেবকে আসাওরির এক কলি শুনাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ; তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করছে।

আমার এই দুঃসাহসের নিবেদন শুনে তিনি যেন বর্তমানের বাস্তবে নেমে এলেন। কিন্তু তিনি 'নার্‌ভাস্ শক্' পাননি ; খাঁ সাহেবের কলেজা সিংহের কলেজা! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "অচ্ছা! আপনি গানও করেন! খুব আশ্চর্য কথা! আপ দিল্‌লগীভি করতে হ্যাঁয়, ঔর গানাভি গা লেতে হ্যাঁয়! ক্যা কহ্ না!" বলে এমনভাবে নীচের দিকে তাকালেন, যার অর্থ—যে ঠাট্টা তামাশা করে, তার পক্ষে গান করাটা খুবই অদ্ভুত। যাই হ'ক, খাঁ সাহেবের কথা শুনে আমি হপ্‌কে গেলাম। চুপ করে থাকলাম।

দেখলাম, তিনিও যেন কি ভাবছেন। মনে করলাম, কী আর ভাব-বেন! তিনি নিশ্চয়ই তাঁর দুর্বিষহ জীবনকে ধিক্‌কার দিচ্ছেন, আর মনে মনে বলছেন, তোর পোড়া কপালে এতও ছিল! হা ভগবান্! একটা ফচ্‌কে ছোঁড়ার মুখে গান শুনতে হবে। আপদ্‌গুলো বিদায় হ'লে যে বাঁচি···।

কিন্তু তিনি হঠাৎ বললেন, "অচ্ছা, অচ্ছা, শুনাইয়ে বাবুসাব্!" বলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন, মাথার নীচে দু'খানি হাত রেখে। তক্তাটা সে বার অত্যন্ত অপমানসূচক সুরে 'ঠিক্-ঠিক্' বলেছিল। দেখি, খাঁ সাহেবের চক্ষু দু'টি মুদ্রিত প্রায়, দেহ শিথিল ; শ্বাস উঠছে আর পড়ছে।

নিকুন্ ফিস্-ফিস্ করে আমার কানে বলল, "আর কেন পাঁচ্‌দা! এবার যাওয়া যাক!" আমি লজ্জাটা গায়ে না মেখে গম্ভীর মৃদু স্বরে বললাম, "দাঁড়া। আগে নাক ডাকুক। গান শুনি না শুনি, নাক ডাকার সুরটাও ত শুনতে পাব!" কথাটা শুনে তরলমতি নিকুন্ যেমনি হাসি চাপতে গিয়েছে, অমনি

তক্তাপোশ 'ঠিক' করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, "গাইয়ে বাবুসাব্, গাইয়ে। শর্‌মাইয়ে মত্।"

খাঁ সাহেবের অভিমান হ'তে পারে, আর আমার বুঝি অভিমান হতে পারে না? বললাম, "খাঁ সাহেব, আপনি এখন সুস্ত্ (ক্লান্ত) হয়েছেন, আপনাকে আর দিক্ করতে চাইনে।" খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন। বললেন, "নহি, নহি বাবুসাব, আমি ত একটু আরাম করছিলাম মাত্র। আপনি গান করুন।" বুঝলাম, এবার খাঁ সাহেব দুঃসহ অথচ অনিবার্য ভবিতব্যকে সহ্য করে নেওয়ার মত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েই যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন! আর সেই তক্তাটাও যেন সমর্থন করল তাঁর মনের ভাব।

খুব বড়ো চোখ করে নিকুনের দিকে তাকালাম; সে বুঝুক, আর সাক্ষী থাকুক যে, স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব পাঁচু সাণ্ডেলকে দু-দুবার গান করতে বললেন। কিন্তু আমার পোড়া কপাল! নিকুন্ কথাটা তলিয়ে বুঝল না। বলল, "পাঁচ্‌দা! শিগ্‌গির ধরে দিন। নইলে আবার শুয়ে পড়বেন উনি। ধরুন ধরুন, আর দেরি করবেন না, পারা যাচ্ছে না।" বুঝলাম, নিকুনের পেটে খিদের আঁচ লেগেছে। তা হ'লেও নিকুন্ হয় ত খুব বাজে কথা বলেনি। আর একবার দুর্গা-নাম স্মরণ করে তাঁরই ভর্তার নামে গান ধরে দিলাম 'তুয়া চরণকমলপর মন-ভ্রমর ভালভান যঁউ চন্দ চকোর।'

কলিকাতার কোনও এক গায়কসম্প্রদায় এই মধুর গানটি চালু করে দিয়েছিলেন; শুনে শিখেছিলাম। বিশ্বনাথজীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে তিনি সুরের ভাঁজগুলি স্থানে স্থানে শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, এটা যেমন আছে, তেমনি গাইবেন, কারদানী করতে যাবেন না যেন। আরও বলেছিলেন, 'ভালভান' শব্দের 'ভান' হ'ল 'বহ্ন' অর্থাৎ বহ্নি শব্দের অপভ্রংশ; ভালভান্ অর্থ কপালে যার বহ্নি, অর্থাৎ মহাদেব। বিশ্বনাথজী মনে করতেন, এই আসাওরির পদটি ধ্রুপদের ঢংএ গান করেই এর মহিমা পরিস্ফুট করা যায়, আর রচয়িতাও ধ্রুপদ মনে করে রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণে প্রচলিত হওয়ার পর গায়কেরা একে খেয়ালের ছাঁচে ফেলে রূপান্তরিত করে ফেলেছে; যার ফলে গানের মধ্যে আসাওরির বিশুদ্ধতা রক্ষা হ'ত না। এ কথাটা তখনকার নাটোরমহা-রাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় এবং আমি বুঝে স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

কিন্তু অল্পস্বল্প কারদানী করার লোভটা ছিল আমাদের ; লোভের বশে পরীক্ষাও করতাম, আর বিপদ্ টেনে আনতাম। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ঐ বিপদের কথা বলি ; কারণ, ইচ্ছাকৃত বিপদের সঙ্গে কালে খাঁ সাহেবের বৃত্তান্ত জড়িত আছে।

খেয়ালের ঢংএ একটু এদিক্ ওদিক্ চলতে ফিরতে গেলেই ঐ গানটির মধ্যে ভৈরবী বা জৌনপুরীর ভেজাল এসে পড়ত। 'এলই বা!' বলে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় এটা। অথবা অজ্ঞাতসারে কোমল রেখবটি চড়ে গিয়ে তীব্র রেখব হত তখন। পরে বদল্ খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পরে দেখলাম, জবরদস্তি করে রেখবের কোমলত্ব সুরক্ষিত করলেও হয় বিলাসখানি না হয় খট্ ভৈরবীর (খুব চলতি দৃষ্টান্ত 'বিপদবারণ তুমি নারায়ণ লোকে বলে তোমায় করুণানিধান' গান) চেহারা এসে পড়ত এবং বদল্ খাঁ সাহেবের মুখের অভ্যস্ত বুলি স্মরণ করে বলতে হয়, আসাওরির 'হলাকৎ' (অপমৃত্যু) ঘটল। সম্ভবতঃ এ সকল কারণে খেয়ালীরা উত্‌রা রেখবকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তার স্থানে চড়ি রেখব কায়েম করেছিল ; একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারিনি—আমি ও শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ; তখনও নয়, এখনও নয়। কারণ, এতাবৎ দেখে আসছি, কলাবন্ত খেয়ালী (একজন বাদে বাকী নিরনব্বই জন) চড়ি রেখবের আসাওরি দেবীর ভোগ-রাগ সাজিয়ে মহানন্দে গানের পূজায় মেতে গিয়েছেন, খেয়ালের কল্পনাবিলাসে চোখ বুজে এসেছে। কিন্তু খেয়াল নেই যে, পিছনকার খিড়কি দিয়ে সুচতুরা সিন্ধু-ভৈরবী আর যাদুমণি জৌনপুরী এসে পূজারীর অজ্ঞাতসারে নৈবেদ্যগুলি নিজেদের ভোগে চড়িয়ে দিচ্ছেন বা বেমালুম লুটে নিয়ে যাচ্ছেন আর লোভে লোভে ফিরে আসছেন। এমনও মনে হয়েছে আমাদের যে, সিন্ধুভৈরবী আর জৌনপুরীকে আসাওরি থেকে পৃথক্, বিশিষ্ট করে জানার থেকে না জানার আনন্দটাই বেশী ; না জেনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গাওয়া যায়, সুর খেলান যায় ; কি মজা! কিন্তু জানা মানেই বিপদ্‌কে টেনে আনা! যাক্, প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

খাঁ সাহেব অর্ধনিমীলিত নয়নে বসে। আমি থামতেই বললেন, "ফির্ আগে বঢ়িয়ে" অর্থাৎ অন্তরাতে এগিয়ে চলুন। আমিও অন্তরাটি মাছিমারা রকমে শেষ করে নিছক আন্দাজে নূতন কায়দায় 'মুহরা' অর্থাৎ গানের

মুখটি সাজিয়ে গান করতেই তিনি বলে উঠলেন, "এয়সা মত কীজিয়ে বাবু-সাব! ইস্‌সে আস্তাইকা ডৌল বিগড় যাতা হ্যায়" অর্থাৎ ওরকম করলে গানটার মূলগত আস্থায়ীতে আসাওরির যে চেহারা, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। যাবেই ত! নইলে করলাম কেন! বললাম, "মেহেরবানি করে একটা নূতন কায়দার মুহ্‌রা বাতলান। আমি সারা জীবনভর সেইটে সাধ্‌না করব।"

তিনি আমার কথাটা কি ভাবে নিলেন জানিনে। বললেন, "ঠিক হ্যায়। মগর শুনিয়ে।" এর অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, তোমার সাধনার কথা রাখো, সে কথা যাক্। এখন শোন মন দিয়ে।

বলেই তিনি গুনগুন করে নিমেষের মধ্যে আমার সুরের খাদের পঞ্চমে নিজের সুর কায়েম করে নিলেন। আমার সুরটি ছিল বেশ চড়া। যাই হোক, খাঁ সাহেব নিজ কণ্ঠে গানের মুখটি ধরেই আছাড়! যেন একটা কুস্তির প্যাঁচ হয়ে গেল পলকের মধ্যে। এমন একটি অভাবনীয় অথচ সুন্দর মুহ্‌রা জাহির হ'ল, যেটা অতি চমৎকার, বিস্ময়জনক এবং নিরতিশয় কঠিনও বটে। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আমার মন, নিখুঁৎ সুরেলা কণ্ঠের সেই কারিগরী প্রত্যক্ষ করে। এর পরেই আরম্ভ হ'ল, অবশ্য যতদূর মনে পড়ে, একটির পর একটি করে নূতন মুহ্‌রা, আর তারই জমিতে একটির পর একটি বিস্তার আর বিরতির লহর। গানের আরম্ভের কথাগুলি যেন ভেসে যাচ্ছে এদিক্ ওদিক্, কখনও বা ঘূর্ণিপাক খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সুরের তরঙ্গে, তরঙ্গের গভীরে; কখনও বা সঙ্গীহারা হয়ে অকস্মাৎ দেখা দিচ্ছে তরঙ্গের চূড়ায়। ক্রমে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; বিস্তারের পর বিস্তারের বন্যা ব'য়ে যেতে আরম্ভ করল। কথা দিয়ে বাঁধা গানের তরী ওলট্-পালট্ খেতে খেতে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে, কে খবর রাখে! সুর-তরঙ্গের কলকল্লোলে ভেসে চলেছে আমার অনুভব। এর কি বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব! মাত্র গোড়ার দিকের একটা কথা স্মরণে আছে। সমস্ত কাজগুলি হচ্ছিল জম্‌জমার বুনানি দিয়ে, যার মধ্যে চমক দিয়ে উঠছিল ছোট্ ফিরতের ফুল-তোলা মনোহারী নক্‌শা। এর বর্ণনা হয় না, বিজ্ঞাপনা অসম্ভব। মাত্র অনুভবই সর্বক্ষণ উদগ্র থেকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল—আসাওরির, কোমল রেখবওয়ালা আসাওরির ধ্যানমূর্তি যত বা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়েছে, তত বা বিক্ষেপচঞ্চলা সুর-নর্তকীর আবেদন-

নিবেদন তীব্র হতে তীব্রতর আবেগে লুটিয়ে পড়ছে যেন, সেই নটরাজেরই চরণে। গানের ভাষা যেন ছিল মাত্র লোকাতীত অনুভবের একটা ইঙ্গিত। সেই অবর্ণনীয় অনুভবই যখন সংবিদে দেখা দিল, তখন আর ইঙ্গিতে প্রয়োজন কি! মিলনের পূর্বে চন্দ্র চন্দন কোকিলের উদ্দীপনার সার্থকতা আছে বুঝি। কিন্তু দেখা হ'লে এরা যেন মিলিয়ে যায় সেই মিলনের মধ্যে; তখন জ্যোৎস্নাই বা কি, সুগন্ধই বা কোথায়, আর কুহুধ্বনিই বা কিসের জন্য! তখন সব একাকার!

আরম্ভের দিকে মাত্র আর একটি কথা আবছায়ায় মনে পড়ে। যে স্বল্প-ক্ষণ পর্যন্ত আমার বস্তুগ্রাসী চেতনা সজাগ ছিল, বিস্তারগুলির বৈশিষ্ট্য আর চমৎকৃতি আমার জ্ঞানবৃত্তিকে উৎকূলিত করে দিয়েছিল, মাত্র সেই সময়েই আমি দু'একবার 'আহাঃ' উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু তারপর বহুক্ষণের কথা বিশেষ মনে নেই। নির্বিশেষে সুর আর নিরুপম অনুভব দিয়ে যেন সমস্ত ঘর, আকাশ, বাতাস ভরে গিয়েছে। অভিনব পরিচয়ের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বলতে সব কিছু লোপ পেয়ে গিয়েছে তখন।

সেই জ্ঞানহারা বহুক্ষণটি কতক্ষণ? এ প্রশ্নের সমাধান হয়েছে পরে, আমার আর নিকুনের আলোচনার ফলে। ট্রামে উঠেছিলাম বেলা সাতটায়, খাঁ সাহেবের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে শেষে তাঁর আবাসে পৌঁছিয়ে স্থির হয়ে বসে তাঁর জলযোগ শেষ হয়ে গান শুরু হ'তে বেশী পক্ষে বেলা আটটা হবে।

আমরা যখন সুরের লীলার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি, তারই মধ্যে কোনও এক সময়ে একটি অবান্তর ঘটনা ছায়ার মত দেখা দিয়েছিল আমাদের চেতনায়। দরজার সামনে লক্ষ্মীপ্রতিমার মত একটি বালিকা, আর তার পাশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক, খালি গায়ে আর মনে পড়ে—একছড়া সোনার চেন গলায় ছিল তাঁর—ভাসাভাসা-রূপে দেখা দিলেন। ঐ সময়ের সামান্য কিছু কথা মনে আছে। খাঁ সাহেব সুরের অপূর্ব ভঙ্গি দিয়ে অদ্ভুত রকমের বড় বড় পাল্লার গমক সৃষ্টি করে চলেছেন। এর মত ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। আর মনে পড়ে, খাঁ সাহেবের সেই সুরে হারিয়া যাওয়া চাহনি; আর মাঝে মাঝে তাঁর ডান হাতটি ডান কানের কাছে চলে যায়। আর বাঁ হাতটি একবার উঁচু হয়ে উঠে ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে এসে তক্তাটি

ছুঁয়ে যায়, আবার কী জানি কেন উঠে যায়। এ ত সে কালে খাঁ নয়! সে কালে খাঁ দেহ ও মনের রোগ, বাতিক, দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ মলিন উদাস ও উদ্বিগ্ন একটি মূর্তি। আর এই মুহূর্তের এই কালে খাঁ! সশ্রদ্ধ বিনতি জানিয়ে মন আমাকে বলে, তুমি এই জ্যোতির্ময় বিগ্রহ, এই শ্রুতিমন্ত্রের ধ্যানী সাধক, এই আসাওরি রসধারার অমৃত প্রস্রবণস্বরূপ সত্যকার কালে খাঁর বর্ণনা করতে চেষ্টা করো না; কারণ, পারবে না, পারবে না তুমি। তোমার কাজ শুধু এই হীরের টুকরাকে বাইরের আবরণ, ময়লামাটি থেকে মুক্ত পরিষ্কৃত করে তোমারই স্মরণের অঞ্জলিতে তুলে ধরা। একে যখন আবার স্মৃতির দেউলে রেখে দেবে, তখন বুঝবে—তুমি নিজেই গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছ, তোমার ক্লান্তি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে শ্রমের সার্থকতা দিয়ে, অনুভবের সুধা পান করে। এইটুকুই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। মনের কথা শুনে ক্ষান্ত হই আমি, আমি যে কত অক্ষম, তা আমি জানি আর আমার মনই জানে।

ঐ লক্ষ্মীমূর্তি আর ভদ্রলোকটিকে আমরা বসতে বলিনি, অভিবাদন করিনি। খাঁ সাহেব তাঁদের লক্ষ্যই করেননি সম্ভবত। এঁরা কখন্ চলে গিয়েছিলেন, তাও মনে নেই।

গান শেষ হতে না হতেই সেই ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, দ্বিতীয় বার। সর্বপ্রথমেই মনে পড়ছে, খাঁ সাহেব সেই তক্তাপোশের উপর ডান হাঁটু গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে তাতে অগ্নিসংকার করছেন। আমি ও নিকুন্ চুপ করে বসে তখনও। এমন সময়ে সেই মেয়েটি আবার উপস্থিত হয়ে ঐ ভদ্রলোকটিকে বলল, "বাবা, দশটা বাজতে দেরি নেই। মা বলল, তোমাকে চান করে নিতে।" দশটা বাজতে দেরি নেই! আমি আর নিকুন্ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বসে আমরা গান শুনেছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি—সময় কোথা দিয়ে চলে গিয়েছে!

খাঁ সাহেব সিগারেট টেনে চলেছেন নির্বিকারচিত্তে। আমি কথা বলতে গিয়ে দেখি, আমার গলা ভার হয়ে গিয়েছে, কি অশ্চর্য! খাঁ সাহেবকে উদ্দেশ করে বললাম, "ভগবান্ আপনাকে শত বৎসরের জিন্দগি (আয়ু) আর জান্দারি (সপ্রাণতা) দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।" ভগবানের নামে তিনি

মাথা নত করেছিলেন। একটু পরেই হাসিমুখে বললেন, "কেঁও বাবুসাব, আপ্ রাজি হুয়ে ত?" হায় হায়! আমার মত অর্বাচীনের রাজি হওয়ার প্রশ্ন ঐ লোকের মুখে! লজ্জিত হয়ে বললাম, "আমার চেয়ে কত বড় বড় সমঝ্দার আর কদরদান লোক আপনার তারিফ করে চুকেছেন। খাঁ সাহেব! আপনার গলার সুর আর লিয়াকতের (সুন্দর কারুকার্য) তারিফ করার যোগ্যতা কি আমার আছে? তবে জেনে রাখুন, আপনার মেহেরবানি আর সুর আমাদের হৃদয়ে ভরে থাকল, কখনও স্মরণ থেকে চলে যাবে না।"

কিন্তু আশ্চর্য এই কালে খাঁ সাহেব! তিনি যেন আমার কথায় সন্তুষ্ট: হতে পারেননি। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায় বাবুসাব! লেকিন্ আপ্ খুশি ত হুয়ে? ইয়েভি ত কহিয়ে।" ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করলে হবে না। রাজি হ'লেও হবে না। খোলাখুলিভাবে খুশি হ'তে হবে এবং সেই কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে! এমন খুশ-কাঙ্গাল ত দেখিনি! আর কেনই বা এত তার কাঙ্গালপনা, যে অমন সম্পদের মালিক হয়ে বসে আছে! এ জীবনে বুঝিনি আমি তার রহস্য। যাই হ'ক— উত্তর দিয়ে বললাম খোলসা করে, "খাঁ সাহেব! ও কথা ফজুল (অনর্থক) জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে! খুশী আমাদের দিল ভরে গিয়েছে। সেখানে অন্য কোনও লোকের আসাওরির যায়গা আর থাকল না। এর পরে কেউ যদি আমাকে আসাওরি শোনাতে চায় ত আমি তাকে বলব, কালে খাঁ সাহেবের আসাওরি কি শুনেছেন? যদি না শুনে থাকেন ত আগে সেই আসাওরি শুনে এসে, তারপর আপনার আসাওরি শোনাবেন!" আমার কথাটা দ্বিতীয় বার যাচিয়ে নিতে পারিনি, এত দিনেও। এত গান আর রাগ শুনলাম এ পর্যন্ত; কিন্তু কোনও খেয়ালীর মুখে উত্রি রেখবওয়ালা আসাওরি জাহির হ'তে দেখলাম না। চড়ি রেখবের আসাওরি অর্থাৎ জৌনপুরি, সিন্ধুভৈরবী, দেশী তোড়ীর ভেজাল দেওয়া আসাওরি শুনেছি অজস্র। যখনই শুনি, তখনই মনে হয়, কোথায় সেই বিশ্বনাথজীর ধ্রুপদের আসাওরি, সেই কালে খাঁ সাহেবের খেয়ালের আসাওরি!

আমার প্রাণখোলা কথায় খাঁ সাহেব খুশী হয়েছিলেন কি না জানিনে। ওরকম লোক বাস্তবিক কিসে খুশি হয়, কিসে হয় না, বুঝা দুষ্কর। কিন্তু আমার কথার শেষে একটা হুল ছিল; খাঁ সাহেব তাতে আপত্তি জানিয়ে

সরল, গম্ভীরভাবে বললেন, "নহি বাবুসাব্, এয়সা মত্ কহিয়ে। গুণীওমে একসে এক হ্যায়। আল্লাহি জানে, হরেক ইন্সান্‌কে দিমাগ্ কিস্ কদর্ লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। ফির্ হমারে আপ্‌কে কহ্‌নেমে ক্যা হক্ হ্যায়!" অর্থাৎ আমরা যে গুণীদের তুল্যমূল্য করে থাকি, সে কথায় হক্ অর্থাৎ সত্য নেই। কারণ, একের থেকে বড় আর গুণী আছে। একমাত্র ভগবান্‌ই জানেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কতখানি লায়েকি অর্থাৎ গুণ ও কর্মের যোগ্যতা আছে। ভগবানই সর্বজ্ঞ; কিন্তু আমি আপনি ত সর্বজ্ঞ নই! অতএব ও রকম কথা আমাদের মুখে সাজে না।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, খাঁ সাহেবের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যেমন প্রিয় আর বিচিত্র সত্য, তেমনি অপ্রিয় আর একঘেঁয়ে সত্য। আমি কি ভারতের সমস্ত গুণীর গান শুনেছি, না কি খবর রাখি? কখনও নয়। কিন্তু যাঁদের জানি শুনি, তাঁদের মধ্যে কেউ দরবারীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন ত খাম্বাজের বেলায় পারেন না; কেউ হয় ত তোড়ীতে সিদ্ধ, কিন্তু তিলককামোদে কাঁচা। এর মধ্যে ভগবানের হাত রয়েছে। এক একজন এক এক রকম; প্রত্যেককে ওজন করে তুলনা করতে যাওয়াটা অত্যন্ত অনধিকার স্পর্ধার কথা। বরং ভগবান্ কার মধ্যে কোন্ বিষয়ে কতখানি উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিটিয়ে দিয়েছেন, সেই প্রতিভার সাক্ষাৎ করা, সম্মান করাটাই হ'ল সেরা কাজ; কার মধ্যে কি নেই, এ রকমের অনুসন্ধিৎসা নির্বোধেরই কাজ। ময়ূরের শুঁড় নেই, হাতী পেখম ধরতে পারে না, এরকমের বিচার করা শিল্পকলার সমালোচনা নয়; ওটা কিছুই নয়, গালগল্প মাত্র।

সে-দিনকার মত মনে পড়ছে, খাঁ সাহেবের গম্ভীর মৃদু স্বরের বাহনে ঐ কথাগুলি কত সুন্দর সত্য ও যথার্থ বিনয়কে আমার হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এর পরেও ও-ধরণের কথা শুনেছি, যথার্থ গুণীদের মুখে। কিন্তু ও কথা প্রথম শুনেছিলাম কালে খাঁ সাহেবের মুখে; এত মিষ্ট লেগেছিল যে, তার স্বাদ এখনও ভুলতে পারিনি।

এর পরেই খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খাঁ সাহেব! বেআদবী মাফ্ করবেন। আপনার মাথায় সেই মুরেঠা চড়াতে কত নজ্‌রানা (দক্ষিণা) লাগে জান্‌তে ইচ্ছা করি।" তিনি তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন, "কাহে?" আমি

তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, ভগবানের অনুগ্রহ হলে হয় ত অবিলম্বে তাঁর জন্য একটা মুজরার বন্দোবস্ত করতে পারি। দেখি, মুজরার কথায় তিনি খুবই আগ্রহ করলেন। বল্‌লেন, "আমার মুজ্‌রা পঞ্চাশ টাকা। কোথায় মুজ্‌রা হবে?" এমন অকপট মন আর বালকের মত আগ্রহও ত দেখিনি!

বল্‌লাম তাঁকে, "কোথায় হবে, আমি আজ সন্ধ্যায় এসে খবর দিয়ে যাব। তার জন্য চিন্তা নেই। তবে একটা কথা আপনাকে বলি। যেখানে বন্দোবস্ত করব মনে করছি, সেখানে ভগবান্ শুধু পয়সাই দেননি, তার উপরে দিল্ দিয়েছেন আর রেখব-গান্ধারের সমঝ্‌ভি দিয়েছেন।" আমার কথা শুনে খাঁ সাহেবের আকুলতা, উৎফুল্লতা দেখে কে! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তরুণ মনে একসঙ্গে যে হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল, সে রকম আর হয়েছে কি না সন্দেহ।

খাঁ সাহেবকে বহুবার আদাব জানিয়ে আপ্লুত হৃদয়ে যখন আমরা উঠে তাঁর নিকট বিদায় প্রার্থনা করলাম, তখন সেই নগ্নদেহ বিগ্রহটি দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন! আর বল্‌লেন, "বাবুসাব! আপনি সন্ধ্যাবেলা আস্‌ছেন ত?" বলে এমন ভাবে তাকালেন আমার দিকে যে, আমি অনুভব করলাম, আমার কণ্ঠের মধ্যে কী যেন এসে আটকে গিয়েছে, আমি কথা বলতে পারছিনে; আমার চোখের জল ধরে রাখা কঠিন মনে হয়েছিল। কোনও রকমে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, মাত্র মাথা নেড়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, প্রতিশ্রুতি পালন করব। ভগবান্‌কে ডাকার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তখন আমি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—আমার মুখের কথাটা যেন রাখতে পারি। ভগবান্ সে প্রার্থনা শুনেছিলেন, মঞ্জুরও করেছিলেন।

আমরা যখন উপর থেকে নীচে নেমে এসেছি, তখন সেই ভদ্রলোকটি সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। বল্‌লেন, তিনি এই গরীবখানার মালিক। আমরা তাঁকে আগে খাতির করিনি বলে ক্ষমা চাইতে তিনি বললেন, "ও কথা বলতে হবে না। আপনারা তখন নেশায় ভরপুর" ইত্যাদি। বাদসাধ দিয়ে সংক্ষেপে বৃত্তান্ত বলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ছ-মাসের মধ্যে ওঁর গলা থেকে সুর বার করতে পারিনি, মশায়। সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে যান। সকালে বলেন, মেজাজ ঠিক নেই।

ভাগ্যি আপনারা এসেছিলেন।" দু'চারটি তুম্ তানা নানা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা।

গলি থেকে বার হয়ে আসার সময়ে আমাদের যেন স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। নিকুন্ই বলল, "পাঁচদা! ব্যাপারটা স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে, নয় কি?" আমি বললাম, "তুই আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিলি ভাই! আর সেই পয়মন্ত তক্তাপোশটা!"

নিকুন্ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হেসে নিল; বেচারা! আমি বললাম, "দেখ্ নিকুন্, ভদ্রলোকটিকে বলে কয়ে ঐ তক্তাপোশটা কিনে নিলে হয় না? অমন জামাই-ঠকানো জারুল কাঠের তক্তাপোশ বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না, কল্‌কাতায়!" নিকুন্ অতিশয় সরলপ্রাণ। বলল, "কী যে বলেন, তার ঠিক নেই! উনি হলেন খাঁ সাহেবের শাক্‌রেদ। উনি কি গুরুদেবের আসন বেচে দিতে পারেন! কখ্‌খনো নয়।" নিকুনের কথার গুরুত্বে তক্তাপোশটির লঘুত্ব কেটে গেল। সেই যাদুকর তক্তাপোশের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন আর ঘটেনি।

ঠিক করে ফেল্‌লাম, আর কোথাও না গিয়ে সোজা মহারাজভবনে যাওয়াই আবশ্যক। যে কথা, সেই কাজ। চললাম আমরা মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়ের সমীপে, দরবার করতে। ট্রামে করে এস্‌প্লানেড; তার পর ভাবানীপুরের ট্রামে চড়ে এল্‌গিন্ রোডের মোড়; সেখান থেকে পদব্রজে ৬ নং ল্যান্সডাউন রোডে রাজভবনে। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হলাম যখন, তখন বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি।

প্রথমেই আমরা অভিযান করলাম মহারাজের সকাশে। পশ্চিম দিকের অর্থাৎ বড় মহলের গাড়ীবারান্দার উপরের ঘরটি ছিল মহারাজের বিশ্রামকক্ষ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখি, মহারাজ অর্ধশায়িত অবস্থায় হাতে একখানি বই ধরে নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর আহারাদি শেষ হয়েছে, বুঝলাম। আমাদের গতিবিধি ছিল প্রায় অবাধ; কোনও গুণের কারণে নয়, মাত্র একটা সম্বন্ধের কারণে। মহারাজকুমার আমার খুড়তুত ভগ্নীকে অর্থাৎ ননীর সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। বঙ্গের অভিজাতবংশের কুলতিলক মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্র, গুণাবলীর কথা আমি আর কি বলব! আমরা শুধু জানতাম বুঝতাম তিনি অতিশয় স্নেহপ্রবণ,

কৌতুকপ্রিয়, আর সঙ্গীতপ্রাণ। তিনি যখন ওস্তাদ বিশ্বনাথজীর ধ্রুপদ গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন, তখন আমি এই ভেবে বিস্মিত হয়ে যেতাম যে—পাখাওজের বাজনা আর সঙ্গত অত মধুর হয় কি করে। তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে বুঝেছিলাম, অন্তরের স্নেহধারা মাত্র সজীব মনুষ্যকে কৃতার্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, নির্জীব বাদ্যযন্ত্রকেও স্নিগ্ধ সরস করেছে মনের মাধুর্য ও আহ্লাদ দিয়ে।

এখনকার স্মরণের আনন্দ দিয়ে উপলব্ধি করি তখনকার যোগাযোগের মাহাত্ম্য। আমার অকিঞ্চন জীবনলতা সৌভাগ্যলব্ধ সেই সম্বন্ধকে কেমন করে কত নিবিড় ভাবে আশ্রয় করেছিল; আর প্রতানিত হয়ে উঠেছিল মনোরম অভিজ্ঞতার কোরকসম্ভার নিয়ে। জীবনের একটি শাখা পল্লবিত হয়েছিল মহারাজ নাটোরের ভবনে স্নেহস্পর্শ পরিবেশের মধ্যে, মৈত্রী ও করুণার সুশীতল ছায়ায় অনুরাগ সঞ্চয় করে, সঙ্গীতের ভাস্বর জ্যোতির অপূর্ব আস্বাদ পেয়ে। অন্য একটি শাখা বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল শ্যামলালজীর সঙ্গীততীর্থের বিচিত্র আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে, গীত-বাদ্য-নৃত্যের নব নব হিল্লোলের প্রলোভনে, নব নব প্রত্যাশার আকর্ষণে। বর্তমানের ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে উন্মুখ যৌবনের সেই অতীত শুভ মুহূর্তগুলি; অনাবিল আনন্দে আপ্লুত এই হৃদয়কে যারা সহজেই জয় করে নিয়েছিল সঙ্গীতের বিচিত্র ধ্বনি আর রূপ দিয়ে; বিদায়ের কালে যারা উন্মেষিত করে গিয়েছিল আমার স্বল্পপরিসর জ্ঞানের মঞ্জুল কোরকগুলি; আমার অজ্ঞাতসারেই যারা আমার অন্তরকে সুপুষ্ট, সমৃদ্ধ করেছিল অনুভবের নিগূঢ় সম্পদ্ দিয়ে। জীবনের সেই অতীত মুহূর্তগুলির সন্ধান করে ফিরছি ব্যাকুল হয়ে, সঞ্চিত-লোভী কৃপণের মতো; স্মরণের প্রদীপ জেলে।

মাত্র এখন বুঝতে পারি অনুভবে, সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ-বাৎসল্যের কোন্ মধুর মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে মহামহিম মহারাজ ও মাতৃসমা মহারাণীমাতা আমার জীবনে প্রতিভাত হয়েছিলেন। মহারাজকুমার আমাকে চিরতরের জন্যই বন্ধন করেছিলেন অকৃত্রিম প্রীতি, অনলস সৌহার্দ্যের শৃঙ্খল দিয়ে। আত্মীয়স্বজনেরা আমার সমস্ত ত্রুটি অপরাধ ক্ষালন করে নিতেন অকৃপণ ভালবাসার পূত বারি দিয়ে। বাহ্যিক শিষ্টতা দেখে শিষ্ট হওয়ার শিক্ষা পেয়েছি; সৌজন্যের আশ্রয়েই সৌজন্যের মর্যাদা করতে শিখেছি, তার

মূল্য নির্ধারণ করতেও পেরেছি। কিন্তু সেই সুকৃতিলব্ধ স্নেহ-বাৎসল্যের গোপন উত্তরাধিকার, যা আজ বর্তমান অনুভবের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, সেই প্রীতি আর ভালবাসার নিগূঢ় সরিৎ-প্রবাহ, যা আজ স্মৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দ উৎসের আবেগ নিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে—তাদের আন্তরিক মূল্য তখন আমি বুঝিনি, তাদের মর্যাদা তখন আমি বিচার করিনি। এখন এই অমার্জিত লেখনী-কণ্টক মাত্র যৎকিঞ্চিৎ স্থূল ঘটনা-গুলিকে একটির পর একটি করে বিদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে; স্মৃতির অতল থেকে। এমন শক্তি, এমন যোগ্যতা আমার নেই, যা দিয়ে হৃদয়ের সেই অমূল্য রত্নাবলীর মান মূল্য মর্যাদা নিরূপণ করি। সকল দীনের শরণ যিনি, সেই দীননাথকেই এই হৃদয় জানিয়ে দিতে চায় প্রকাশের অক্ষমতা। স্নেহ-প্রীতি-বাৎসল্যের মুক্তাবলী আজ অকস্মাৎ অনুভবে আবির্ভূত হলেও তাদের মান মর্যাদা বিচার করা আমার পক্ষে বৃথা মনে হয়।

নির্ভয় অকুণ্ঠিত চিত্তে মহারাজের বিশ্রাম-কক্ষে উপস্থিত হয়েছিলাম আমরা দুজন। নিকটে যেতেই আমাদের দিকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-দৃষ্টি দিয়ে তিনি বললেন, "কে, পাঁচু নাকি; আরে, আয় আয়। ও কে! নিকুঞ্জ দেখছি! আয়, বস্।" তাঁকে প্রণাম করে আমরা সতরঞ্জির উপর বসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর বল্। দীননাথ দাদা, (আমার পিতৃদেব) ভাল আছেন? ছুটিতে যাচ্ছিস্ ত মৈমনসিংহে?" আমি সঠিক উত্তর দিয়ে চুপ করে থাকলাম। তিনি নিকুনের বাড়ীর হাল খবরও নিলেন। পরে বল্লেন, "নূতন কি খবর বল্।" আমি বলতে যাব, এমন সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অন্দর-বাড়ীতে গিয়েছিলি তোরা?" আমরা বল্লাম, "না, এখনও যাইনি। আপনার কাছেই প্রথম এলাম।" বলতেই তিনি বললেন, "বুঝেছি। কোনও ওস্তাদ-টোস্তাদের খবর নিয়ে এসেছিস বলে সন্দেহ হচ্ছে। বল্ ত শুনি।" আমরা চমৎকৃত হ'লাম। আমি বল্-লাম, "আপনি নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথী করেছেন। নয় ত কি করে বুঝলেন আমরা একজন ওস্তাদের খবর নিয়ে এসেছি।" তিনি খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, না। শারলক্ হোম্সের গল্প পড়েছিস্ ত? সেই বিদ্যাটা একটু খাটিয়ে দেখলাম, ঠিক লাগে কি না। এই অসময়ে—মানে,

মনু-টনু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এমন সময়ে তোরা বাড়ীর মধ্যে না গিয়ে চলে এলি আমার কাছে। এর কারণ আর কী হতে পারে, তুই বল।"

আমি চকিতদৃষ্টিতে তাঁর হাতের বইখানি দেখে নিলাম; সেটা ছিল: "মেমইয়ারস্ অব্ শারলক্ হোম্‌স।" তাঁর যুক্তিযোজনা অকাট্য। বল্‌লাম, "আপনি ঠিক ধরেছেন।" তিনি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করতে আমি আনুপূর্বিক ঘটনার প্রধান কথাগুলি বলে গেলাম; এমন কি, শ্যামলালজীর বৈঠকের সন্ধানসূত্রটি পর্যন্ত। তিনি সমস্ত ক্ষণ আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন। কথা শেষ হলে আমাকে তাঁর কাছে উঠে আসতে বল্‌লেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম; ভাবছিলাম, হয় ত কাণমলা খেতে পারি। হায় হায়! তা হয় নি। হলে ত একটা বলবার মত কথা হ'ত যে, মহারাজ নাটোরের হাতে, যে আঙ্গুলে মৃদঙ্গের মধুর 'পরন্ধ' ('প্রবন্ধ' শব্দের অপভ্রংশ, বোলের বিস্তার-পরিপাটী) বেজে ওঠে, সেই আঙ্গুলের কাণমলা খেয়েছে পাঁচু সাণ্ডেল! তিনি আমার হাতের কব্‌জি আর বাইসেপ্‌স পরীক্ষা করে বল্‌লেন, "তাই তো! তুই লায়েক হয়ে গেলি কেমন করে! যাই হ'ক, আজ থেকে তোর উপর একটা কাজের ভার দিলাম। তোদের পাড়ায় (অর্থাৎ উত্তর-কলিকাতা অঞ্চলে) নামী ওস্তাদ এলে তুই নিজে দেখে শুনে আমাকে খবর দিবি। বুঝলি ত? কতকটা বীরবলের মত। বীরবলের গল্প জানিস ত?"

বীরবলের গল্প দু-দশখানা জানতাম আমি; "বীরবল্‌কা কিস্‌সা" বলে হিন্দী ভাষার পুস্তকও পড়েছিলাম তখন। কিন্তু তিনি বিশেষ কোন্ গল্পের ইঙ্গিত করলেন, বুঝতে পারলাম না। তা ছাড়া তাঁর মুখে অন্য ছোট ছোট মজার গল্প শুনে আমার একটা ধারণা হয়েছিল, মুখে গল্প বলারও একটা বিদ্যা আছে; মহরাজের গল্প বলার ঢং ছিল হৃদয়হারী। বল্‌লাম আমি, "মহারাজ, আপনি কোন্ গল্পটির কথা বলছেন, আমরা নিশ্চয়ই জানিনে। আপনার মুখ থেকে আমরা শুনব।"

দেখলাম, তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পাশের দরজার দিকে তাকালেন। এমন সময়ে সাক্ষাৎ মা জননীর মতো স্নেহপ্রতিমা মহারাণীমা এসে দেখা দিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, "কে রে! পাঁচু! নিকুঞ্জ! এখন কোথা হ'তে এলি তোরা?" আমরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর শুভ্র

সুকোমল চরণ দু'টি স্পর্শ করে নিজেদের ধন্য মনে করলাম। কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বল্‌লেন, "মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোদের খাওয়া দাওয়া হয়নি। তোরা বাড়ীর মধ্যে চল, খাওয়া দাওয়া সেরে নিবি। মনু এখন ওঠেইনি, তার খেতে অনেক দেরী। আয় আমার সঙ্গে।" আমি একটা ক্ষীণ আপত্তির সুরে বললাম, "মহারাজের মুখে বীরবলের গল্প শুনব ঠিক করেছি এইমাত্র ;" বলতেই মহারাজ বললেন, "না না, তোরা আগে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পেট ঠাণ্ডা করে আয়। খালি পেটে গল্প ভাল লাগে না। আমি ত সেই জন্যই তোদের মহারাণীর কাছে টেলিপ্যাথি করলাম। বুঝতে পারলিনে! আর, অম্‌নি উনি এসে হাজির! একেই বলে টেলিপ্যাথি!" বলে, মহারাণীমার মুখের দিকে বিনয়ের সুরে যেন অভিনয় করে বললেন, "মহারাণী! আপনি কি বলেন ? এরকম টেলিপ্যাথি কত বার হয়েছে, তার হিসাব কি আপনার কাছে আছে ?" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে যথার্থই কোনও হিসাবনিকাশ ঘটেছিল কি না, কি করে বুঝব আমি! শুধু মনে আছে—মহারাণীমা আমাদের হাত ধরে মহারাজকে বললেন, "খুব হয়েছে, তোমার আর তামাশা করতে হবে না। গল্প ওরা পরে শুনবে। এখন খাইয়ে নিয়ে আসিগে এদের" ; বলে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে মৃদুমন্দ চরণচ্ছন্দে অন্দর-বাড়ীর দিকে চললেন তিনি।

সেই ধীর চরণসঞ্চার! অতি ক্ষুদ্র এই বাস্তব ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার দুর্বল লেখনী দুর্বলতর হয়ে পড়ে। সেদিনকার সেই বাস্তব মুহূর্তগুলির মধ্যে আমার চোখে মহারাণীমা ও মহারাজ বিশিষ্ট মানুষের রূপেই ত দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে করতে গিয়ে দেখি —সেই চরণধ্বনি আমাকে কোথায় নিয়ে যায়, কি সংবাদ শোনায়! সেই ক্ষণে সত্য সত্যই হর-পার্বতীর রহস্য-কৌতুকেরই আদান-প্রদান হয়ে গেল, দুই নিমেষের মধ্যে। কে বর্ণনা করতে পারে সেই অনির্বচনীয় রহস্যের মর্মকথা, সেই করুণাগর্ভ কৌতুকের অমৃতময়ী বাণী! অন্তত আমি ত নই। ঘটনাকে মাত্র প্রত্যক্ষই করি আমরা; ঘটনার অন্তরালে দেবতার পূজা ত করি না। আর, আজ আমার স্মৃতি কোন্ মহাস্মৃতির পূজা করছে, অনুভবের নৈবেদ্য দিয়ে! সেই মহাস্মৃতির রহস্য বুঝি না; সে অনুভব কোথা থেকে এসে ঝলকে দেখা দিয়ে যায়, তাও জানিনে;

আর অন্তরের পূজার ঘরে কে কখন্ সেই নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছে, তাও জানিনে। মাত্র এইটুকুই বুঝি, বুঝে ক্ষান্ত হওয়ার চেষ্টা করি, মনোমন্দিরের গোপন দুয়ার সব সময়ে উন্মুক্ত থাকে না। আজ এই মুহূর্তটিকে আমি কিছুতেই উপেক্ষা করব না। অতীত প্রত্যক্ষের মুহূর্তে, অন্তরাত্মার গভীরে মহাস্মৃতির আনন্দধামে, আমার অজ্ঞাতসারেই সঞ্চিত হয়েছিল না-জানি কোন্ সুকৃতির কুসুমসম্ভার, যা এখন অকস্মাৎ দেখা দেয় স্মরণের নৈবেদ্য হয়ে। একে কি অবহেলা করতে পারি! এ যে নিতান্তই আপনার; একান্তই আপন অন্তরের সুকৃতি সঞ্চয় সেই চরণধ্বনির প্রতিধ্বনি!

অন্দর-বাড়ীতে যখন আমরা খেতে বসেছি, যথার্থ কথা বলতে—ভোজন ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছি আর মহারাণীমা স্বয়ং অন্নপূর্ণারই রূপে পরিবেশন করছেন, তখন কথায় কথায় নিকুন্ বলে ফেল্‌ল, কালে খাঁ সাহেবকে শিকার করার কাহিনী; অবশ্য সে যতটুকু বুঝেছিল। নিকুনের ব্যবহার দেখে মনে মনে রেগে গিয়েছিলাম; তার চিত্তের বিক্ষেপ-দোষ দেখে ব্যথিত হয়েছিলাম। অর্থাৎ ঠিক সেই সময়টিতে অহৈতুকী কৃপার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের রূপে আমাদের থালায় পরিশায়িত হয়েছিল কদাচন কোনও সুবৃহৎ চিত্রফল্লিকা মৎস্যের উৎকৃষ্ট অংশের পাকপরিণামসম্ভূত অতুলনীয় সুদর্শন খণ্ডযুগল; প্রাথমিক ধ্যানের অপেক্ষায়। আমি সবে মাত্র চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র করে তাদের ধ্যান-ধারণায় উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে নিকুনের কথায় আমার ধ্যান ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এতে কার না রাগ হয়। পরে একদিন ঐ কথা তুলে নিকুন্‌কে তিরস্কার করে বলেছিলাম, অমন প্রত্যক্ষ মনোহারী সরষে-বাঁটা ঝাল রসের চিতল মাছের পেটিতেই যখন তুই ধ্যান ঠিক করতে পারলিনে, তখন বুড়ো হ'লে অলক্ষ্য, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে তুই কি করে মন স্থির কর্‌বি? তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ইত্যাদি বলে তাকে বিভীষিকা দেখালাম। কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করে ফেলেছি তখন। সে যখন অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইল, তখন বললাম, তাকে ক্ষমা হয়ে গিয়েছে কবে; তোর নূতন অপরাধের প্রতীক্ষায় আছি। ভাগ্যে নিকুন্ অপরাধ করত, আর আমার ক্ষমাধর্মকে শান দিয়ে দিত মাঝে মাঝে!

নিকুনের মুখে বিবরণ শুনে মহারাণীমা খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন। আমাদের আগ্রহ আন্দাজ করে বল্‌লেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তোরা ভাল করে গান শুনলেই ত পারিস্।" আমি তখনই বললাম, "মহারাজ আধাআধি মঞ্জুর

করে বাকিটা আপনার জন্য রেখেছিলেন। সেটাও আদায় করলাম আপনার কাছে।" তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, স্নেহ-বাৎসল্যের অবদানে সেই মাতৃমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সেই অনুপম স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে আমাদেরই ঔৎসুক্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে ; অধরপ্রান্তে সেই স্মিত হাসির রেখার মধ্যে লেখা রয়েছে আমাদেরই আশার ভবিতব্য! সে ছবি কখনও মুছে যায় না ; ভবিতব্যের সে রকম লেখা কখনও ত বিফল হয়নি।

ভোজনপর্ব শেষ হলে সংবাদ পেলাম, কুমার বাহাদুর (বর্তমান মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়) স্নান করতে গিয়েছেন। অর্থাৎ দু'ঘণ্টার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কুমারের তখনকার স্নান বলতে আমি বুঝতাম গ্রহণ-স্নানের ব্যাপার। প্রথমে পোষ্য-প্রেষ্যদের কৃত অভ্যঙ্গ-সংবাহন প্রভৃতি দিয়ে গাত্র স্পর্শের জন্য হ'ত স্পর্শস্নান। মধ্যপর্বে বাথ-টাব্ নামে বিরাট্ আকৃতির মর্মরদেহী যেন রাহুর কবলে চন্দ্রের অবস্থান ও বিলীন হয়ে যাওয়ার একটা বিলম্বিত ব্যাপার। শেষ অর্থাৎ মোক্ষপর্বে—বাথ-টাবের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে "শাওয়ার-বাথে"র ঝরণাধারায় মুক্তিস্নান করে স্নানপর্বের সমাধা ; সেদিনকার একবেলার মত! এর পরেই মণিরত্নাদি ধারণ করে যেন সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রের মতো কুমার আবির্ভূত হতেন পাশের আরাম-কামরায়। আমরা ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত থাকলে কিছু অমূল্য দানপর্বও নিষ্পন্ন হতে দেখেছি। যথা, কাউকে স্নিগ্ধ কটাক্ষের জ্যোৎস্না দিয়ে মোহিত করা ; কাউকে বা বিচিত্র ভ্রূক্ষেপ বা গাত্রবিক্ষেপের পবনহিল্লোল দিয়ে, কাউকে বা সহাস পরিতোষের কোকিল-কূজন দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া ইত্যাদি রকমের দানখণ্ডগুলিকে অমূল্য বলেই মনে করেছি আমি।

কুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনই বুঝেছিলাম, তিনি বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে স্বরক্রতির সুধা পান করে আকুল হওয়ার ব্রতই যেন গ্রহণ করেছেন। মনে পড়ে যায় সে দিনের ঘটনা। রাজবাড়ীর উত্তরদিকের গাড়ীবারান্দার উপরে সুসজ্জিত আসরে স্বয়ং বিশ্বনাথ ওস্তাদজী আসন গ্রহণ করেছেন ; তাঁর এক পাশে কুমার আর অন্য পাশে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, দু'জনের হাতে তম্বুরা ; চাটুজ্জে মহাশয় (গিরীশ চট্টোপাধ্যায়) পাখাওজ নিয়েছেন, প্রবীণ মদনমোহন ভট্টজী উৎকর্ণ হয়ে সুর ও ছন্দের সহযোগিতা লক্ষ্য করে বসে আছেন ধ্যানীর মত।

বিশ্বনাথজী একবার গান করেন, তার পরেই গান করেন কুমার, তার পরেই ব্রজেন্দ্রবাবু। গান হচ্ছিল "মোকো তো তিহারো ভরোসা", শ্রীআনন্দ-কিশোর-রচিত খাম্বাজ চৌতালের অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ একটি। বিশ্বনাথজীর কণ্ঠে স্বরস্ফুতির লীলা আভাস দিচ্ছিল যেন বিদ্যুতের চমৎকৃতির মত, গানের দিগন্তকে মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে ; সূক্ষ্ম, মধুর, সুললিত কণ্ঠে কুমার যেন সাদর আহ্বান জানাচ্ছিলেন খাম্বাজের চকিত মনোহর সেই মূর্তিকে ; ব্রজেন্দ্রবাবুর কণ্ঠে ছিল দূরাগত বংশীধ্বনির হর্ষমাধুর্য আর বিহ্বলতা ! কাকে দেখি, কাকে শুনি, কাকে ফেলি ! তম্বুরা গুঞ্জন আর মৃদঙ্গের ধ্বনির মধ্যে দিয়ে প্রথম ও অন্তরের পরিচয় ; এ রকমের কুটুম্বিতার আশ্বাস জীবনে আর ত পাইনি, কোথাও, কখনও !

ক্রমশ পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল কুমারের স্বর্গসন্ধানী হৃদয়ের ; স্বর্গ অর্থাৎ বাণী সুর ও ছন্দের অলকনন্দা যে দিব্যধাম থেকে উৎসারিত হয়ে মর্ত্যলোককে প্রবাহপ্লাবিত করে চলেছে, সঙ্গীতের সেই কল্পলোক, রাগ-রাগিণীর সেই অমরাবতী। মানবহৃদয়ের শত সহস্র কলুষের সংস্পর্শ সেই ত্রিধারার আবিলতা ঘটাতে পারে না, শত সহস্র বিরুদ্ধ প্রভাব সেই ত্রিধারার গতি ও বেগকে নিরুদ্ধ করতে পারে না, শত সহস্র রুচিভেদ সেই ত্রিধারার সনাতন সৌন্দর্যের অবলোপ সাধন করতে পারে না। কুমারের ললিত মধুর কণ্ঠে কত বার শুনেছি বাংলা টপ্‌পা, কীর্তনগীতি, ছোট ছোট খেয়াল, রবীন্দ্র-গীতি, গজল আরও কত কী। সুরে একপ্রাণতা আর সমান অনুভূতি দিয়ে আমাদের বন্ধন হয়েছিল দৃঢ় অথচ মধুর। বন্ধন শিথিল হয়েছে বলে সন্দেহ হয়নি এখনও।

সেই তরুণ সহৃদয় রসপ্রবণ স্বরূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোনও এক দিন নিভৃতে তাঁর স্নানের প্রসঙ্গ তুলে ঐ সকল কথা বলেছিলাম তাঁকে। কৌতুক কটাক্ষের সঞ্চারে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "পাঁচুবাবু! পত্ত-টত্ত লেখা অভ্যাস আছে না কি আপনার?" আমি বললাম, "ছিল না। কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে যেন একটা প্রবৃত্তি চেগে উঠছে।" তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন, "যথা?" আমি বললাম, "ধরুন, আপনিই যেন চন্দ্র ; কিন্তু আকাশের চাঁদ থেকে লাখোগুণে ভাল ; কারণ, হাতের কাছে পাওয়া যায় আপনাকে" ; ইত্যাদি। তিনি তখনই বললেন, "আর কলঙ্কটা?"

আমি বললাম, "সে ত বোঝাই যাচ্ছে! যে সম্বন্ধের ভারে আপনি হাতের কাছে নেমে এসেছেন, সেই সম্বন্ধটাই ত এ চন্দ্রের কলঙ্ক! এ কলঙ্ক ত ঘুচবে না, আপনার!" ঐ সাঙ্ঘাতিক কথা শুনে মুহূর্তের পরাজয় হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সামলে নিলেন তিনি বাক্যের যুযুৎসু প্যাঁচ দিয়ে; বল্লেন তিনি, "দোহাই পাঁচুবাবু, যা বলেছেন বলেছেন, আর বলবেন না যেন। নইলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে!" কথার যুযুৎসু দিয়ে হেরে যাওয়ার ভাণ করেই জিতলেন তিনি; সত্যিকারের পরাজয় আমাকেই স্বীকার করতে হ'ল সেই নিরহঙ্কার হৃদয়ের কাছে। তখনই কফি পরিবেশনের হুকুম দিয়ে হয় সাময়িক সন্ধির প্রস্তাব! প্রস্তাবের সূচনা তিনি করলেন, পরজ-কালংড়ার মধুমাখান একটি গানের বাণ সন্ধান করে: "কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখি।" কানের মধ্যে দিয়ে সেই বাণটি আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে; সেই মাধুর্যও সংক্রামিত হয়েছে, অজ্ঞাতসারে। আমিও মাঝে মাঝে সুর ছাড়ি। দু'জন সুরপাগলার নিভৃতে মিলন হ'লে যা ঘটবার তাই ঘটে; অর্থাৎ কখন্ যে কফি দিয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই আমাদের। গান থামলে দেখি কফি জুড়িয়ে জল! এ যেন মিলনের পর সন্ধির মূল প্রস্তাবটাই বাতিল হয়ে গেল, এতই ঘটা সে মিলনের! আবার নূতন করে প্রস্তাব হয়, টাটকা গরম কফি আসে; ভবিষ্যৎ কোনও যুদ্ধের আগেই সন্ধির প্রস্তাব করে তাতে শীল-মোহর দিয়ে রাখি আমরা।

এখন তিনি আর কলঙ্কের ভয় করেন না। পরজের সুরসন্ধানী নিষাদের পর্দা থেকে প্রাণের সুর নেমে এসেছে বিনীত অভিমানের গান্ধারে। জীবনের পুঞ্জীভূত অনুরণনগুলি বিশ্রান্ত হতে চায় যেন খাম্বাজের সুরে, যেন একটি গানে—

ধীরে, তীরে করো পার;
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার!
তরী করে টলমল পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার!

একটা দুঃখ থেকে গেল জীবনে। গান জিনিষটা লিখে শুনান যায় না। তা যদি যেত—তা হ'লে জীবনসন্ধ্যার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যেতাম। সেটা যখন হওয়ার নয়, তখন মূল প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

কুমারের স্নানপর্বের কথা মনে করে আমি একা চলে গেলাম মহারাজের নিকট। আমার ভগ্নী বধূরাণী কি একটা কাজে নিকুন্‌কে ধরে রেখেছিলেন।

মহারাজ তখনও বই পড়ছিলেন। আমি উপস্থিত হতেই আমাদের আহারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন; উত্তর শুনেই বললেন, "মন্নুর (কুমারের আটপউরে নাম) সঙ্গে দেখা করে বলবি, আজ রাত্রিতে এখানে সাহিত্যের আসর আছে আমাদের। আমি ঠিক করেছি, কালে খাঁর গান কাল সন্ধ্যার মজ্‌লিসে হ'তে পারে। ওস্তাদজী (বিশ্বনাথজী) আর অন্যদের জানিয়ে রাখে যেন আগে থেকে"; বলে তিনি মৌন হলেন। আমি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লাম, "বীরবলের সেই গল্পটা কি এখন বলবেন?"

তিনি বললেন, "ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস"; বলেই উঠে বসলেন কোলবালিস নিয়ে। "আচ্ছা, তা হ'লে শোন্, বলি", আরম্ভ করে তিনি একটি কাহিনী বলে গেলেন; অতি চমৎকার। গল্পের মূল কথা—বীরবল ও একজন অজ্ঞাতনামা ধ্রুপদগায়ক অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিত হয়েছিলেন বাদশাহ আকবর ও মিয়াঁ তানসেনের সঙ্গে; বাদশাহের খাস্‌-কামরায়। মীরা-বাঈকী-মল্লার নামে একটি রাগিণীর কিম্বদন্তীও জড়িত ছিল তার সঙ্গে। শেষ কথা—অর্থাৎ আসল কথা ছিল, গান মাত্রেরই কিছু আন্তরিক নিবেদন আছে, প্রকাশ্য আবেদনের রূপে যাকে ফুটিয়ে তোলাই গুণীর পক্ষে চরম কৃতিত্ব, আর, যাকে অনুভব দিয়ে হৃদয়ের আসনে বরণ করে নেওয়াই শ্রোতার চরম সার্থকতা।

তখন সদ্য কালে খাঁ সাহেবের মুখে গান শুনে আমার মনপ্রাণ ভরে আছে। সেই কাহিনীর মর্মকথাগুলি আমার মনে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; যাকে শান্ত করতে পরে অনেক সময় কেটে গিয়েছে। দ্বিতীয় বার কালে খাঁ সাহেবের গান শুনার পরে একটা মীমাংসার কূলকিনারা পেয়েছিলাম। কূলের কথা পরেই হবে। আপাতত গল্প শুনে মহারাজের নিকট বিদায় নিয়ে যখন কুমারের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, তখন একেবারেই অকূলে ভাসছি। অকূল অর্থাৎ কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনি আসাওরির এমন এক অপূর্ব সমুদ্র প্রত্যক্ষ করিয়েছিল, যার মধ্যে কথার বাঁধন দিয়ে তৈরী করা গানের তরণীখানির অস্তিত্ব বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল সুরলহরীর বিক্ষোভলীলার মধ্যে; স্থায়ী কূল-কিনারা বলতে কিছু ছিল না যেন। সে গানের মর্মকথা বা 'অরমাঁ' ত ধরে

ছুঁয়ে পাচ্ছি না। এ রকম কুলহারা অনুভবের তলাতল কোথায়, আর পাড়ে উঠলামই বা কেমন করে!

কুমারের আরামকক্ষে উপস্থিত হয়েই দেখি, কুমারের সঙ্গে নিকুন্ গল্প করছে। পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণের পরে কুমারই উৎসুকনয়নে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁচুবাবু, নিকুন্ যা বলল, তার সবই সত্য?"

অতি সংক্ষেপে ঐতিহাসিক নিষ্পত্তির ভাষায় 'সবটাই সত্য' বলে চরম সত্যটা জানিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম সুরে, গান করে, "ননদিনি, বলো নগরে সবারে; ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে;" বল্লাম, কালে খাঁর আসাওরির দরিয়ায় হাবু-ডুবু খেয়ে ফিরছি আমরা। পরে, কাজের কথা উঠিয়ে বল্লাম, মহারাজ আপনাকে বলতে বল্লেন, কাল সন্ধ্যায় কালে খাঁ সাহেবকে নিয়ে এসে গান শোনার ব্যবস্থাটা আজই করা যেতে পারে, ইত্যাদি। মহারাজ একটি চমৎকার গল্প বললেন, বীরবলের সম্বন্ধে ইত্যাদি।

কুমার কিন্তু কল্পনায় আসাওরির দরিয়ায় পাড়ি দিতে ইচ্ছা করেন; বলতে থাকেন, "পাঁচুবাবু, গলায় একটু সুরের ভাঁজ দেখান, কেমন সে আসাওরি।" আমি তাঁকে অনেক কষ্টে বুঝালাম যে, ও কাজ এখন একেবারেই বাতিল, অসম্ভব; ধ্যানটা থিতিয়ে গেলে, তবে একটু জলে নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখন সবে বান্ ডাকার অবস্থা। তখন তিনি কালে খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গে কাজের কথাই তুললেন।

কথায় কথায় তম্বুরার প্রসঙ্গ উঠল। বল্লাম, তম্বুরা ত দেখলাম না ত্রিসীমানায়; আছে কি না সন্দেহ। তবে ভাবনা নেই। আপনার সুরের যাদুঘর রয়েছে। তা থেকে তম্বুরা বার করে বিশ্বনাথজী বা ব্রজেন্দ্রবাবুকে দেখিয়ে নিলেই ত হবে। কি বলেন?"

কুমারের মহলে উত্তর দিকের গাড়িবারান্দার উপরে সুন্দর করে 'সাজান কার্পেট-বিছান' সেই ঘরটি ছিল যেন সঙ্গীত-নিকুঞ্জ। সেই ঘরে বিরাট্ আয়তনের কাচ-বসান একটি আলমারিতে ছিল রবাব, সুরশৃঙ্গার, সুরবাহার, সেতার, বড়-ছোট এক জোড়া দিল্‌রুবা, এস্রাজ, দু'টি তম্বুরা, দু'টি পাখাওজ, খোল, খঞ্জনী, করতাল আর তবলার যুড়ী। কত বার যে এদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি, তার সংখ্যা নিষ্পত্তি হয় না! কখনও মনে হয়েছে, এরা যেন কাঠ চামড়া লোহা পিতল দিয়ে গড়ে-তোলা জমাট-বাঁধা সুরের সংযত তপো-

মূর্তি! আবার মনে হ'ত, যেন কোন অচিন্ সুরমূর্ছনার স্বপ্নকে হৃদয়ে ভরে নিয়ে অভিশাপের সুষুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে দিব্য বিদেহিনীর দল; প্রতীক্ষা করে আছে কোনও দরদী কলাবন্তের যাদুস্পর্শের নিমিত্ত! ঐ আলমারির নাম দিয়েছিলাম সুরের যাদুঘর। সাধারণ নিত্যকার মজ্‌লিসের জন্য পৃথক্ তম্বুরা প্রভৃতিও ছিল। আর কুমারের প্রিয় সুরসুকুমারী সেতারটি থাকত বিশ্রাম-ঘরে। ওস্তাদ্ কেরামত্‌উল্লা খাঁ সাহেবের পরিকল্পিত জম্‌কালো স্বরোদটি তখনও আবির্ভূত হয়নি।

কুমার বললেন, "ঠিক ঠিক, আপনি যা বলেছেন, তাই হবে। সন্ধ্যার সময়ে ব্রজেনবাবু এলেই ঠিক্-ঠাক্ বন্দোবস্ত করা যাবে। আর ওস্তাদজীকেই বলব সঙ্গতীয়ার কথা, কি বলেন?"

ব্রজেনবাবু অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর স্মৃতি দেখা দেয় মনে। ইনি ওস্তাদ্ বিশ্বনাথজীর শিষ্য ছিলেন, এ কথা বল্‌লে এঁর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। ইনি যখন ধ্রুপদ গান বা রবীন্দ্রনাথের গান বা রজনী সেনের গান করতেন, তখন এঁর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসত বংশীধ্বনির প্রাণ-জুড়ান সুর, আর আবেশ-ভরা বাণীর মূর্তি। কিন্তু—জাতীয় সঙ্গীত, বিশেষ বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' গান করার সময়ে এঁর কণ্ঠধ্বনি ভরে উঠত দীপ্ত, মধুর, ওজস্বী একরকমের সুরে, যা এখনও আমার কানে বাজে, স্মরণে উদ্দীপনা আনে। বন্দে মাতরমের সুরটিই সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় আমার স্মৃতিতে আজ। তিলক-কামোদ রাগিণীর বাহনে, অপরূপ একটি সুরধ্যান দিয়ে অভিষিক্ত সেই মহীয়সী মাতৃপূজার আবাহনী বাণী! বীর ও অদ্ভুত রসের অলৌকিক ভাববিভাবনাগুলি যেন স্বতই উচ্ছলিত হয়েছে লৌকিক শৌর্য বীর্য উৎসাহের শব্দচ্ছন্দোময়ী প্রস্রবণধারায়! সেই ধ্যান, সেই ভাব, সেই বিভাবনাই আমার অন্তরকে নিষিক্ত, দ্রবীভূত করে দেয় আজও। শত শত ধন্যবাদ জানাই আমি ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর স্মৃতিকে; তিনি গান করে আমার আন্তরিক শ্রবণপ্রত্যক্ষে মায়েরই ডাক শুনিয়ে দিতেন। বন্দে মাতরমের গানের সে সুর ও ছন্দের মধ্যে ছিল না ভাবের দ্বন্দ্ব, ধ্যানের বিক্ষেপ, ধ্বনির পরাভব। আজকের গানের সুর ও ছন্দ আমার অনুভবকে ক্লিষ্ট করে। আজকের দিনের দেশমল্লারে বর্ষারম্ভের আলো-ছায়া, দূরবিরহকাতরার বিপ্রলম্ভ, বেদনাতুরা কান্তার হা-হন্ত ধ্বনি, তান-গিটকারীর শৃঙ্গার রচনা, আর অলঙ্কারচমৎকারী বন্দে মাতরমের মর্ম ভেদ

করেছে, তার স্বরূপকে বিকৃত করে ফেলেছে। এ ত মায়ের আগমনী নয়; এ যেন বিরহিণী নায়িকার অভিসারকল্পনা। আমার ভাল লাগে না এ ব্যাপার। অন্যের মন জানি না, তাদের কথা বলতে পারি না। আমি জানি, সে যুগকে পিছনে ফেলে এ যুগ অগ্রগতির সুরে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু অন্তরের অনুভবের গতি নেই; প্রবাহ নেই; আছে মাত্র হৃদয়ের স্পন্দন, ভাবের তরঙ্গে উঠানামা। সুপ্রাচীন কালের 'স্ফোট' বা স্পন্দবাদের কথা তুলে লাভ নেই; আধুনিক বিজ্ঞানের তরঙ্গবাদের প্রসঙ্গ করতে চাইনে। আমি জানি, মনের ভাবের গতি নেই, স্থানান্তর হয় না; সম্ভব মাত্র উত্থান আর পতন, আবির্ভাব আর তিরোভাব।

আজকের যুগপ্রগতির লম্ফঝম্পসার মুহূর্তগুলির মধ্যে মাতৃপূজার আসর জমেছে ভাল! আরম্ভেই বন্দে মাতরমের আর্তনাদ; এর মধ্যে পাই বিসর্জনের ধ্বনি। কিসের বিসর্জন? সঙ্গীতের বাহনে মাতৃমূর্তির বিসর্জন! শেষের দিকে ভেসে আসে চলচ্চিত্রের চর্চরীপ্রবাহ; ভাসিয়ে নিয়ে আসে উচ্ছৃঙ্খলতার উপচার, রিরংসার মৌসুমী কুসুমদল! পৈশাচিক উল্লাসসূত্র দিয়ে গ্রথিত এই আদ্য আর উপান্তের কী সুন্দর মালাই না রচনা করতে লেগেছেন আধুনিক স্বয়ংসিদ্ধ রূপদক্ষের দল; চিত্রে, শিল্পে আর সঙ্গীতে! দু'চারজন বিষাদবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ভীত হয়েছেন; দু'চারজন দুর্বলচিত্ত সামাজিক ব্যথিত হয়েছেন; অন্য কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, বন্দে মাতরম্ খণ্ডিত, কর্তিত হয়ে গেল, কী সর্বনাশ! আমি মনে করি, এতে ভয় বা দুঃখ করা বৃথা; সহ্য করতেই হবে যে একে! তা হলে—কালে খাঁ সাহেবের কথাতেই বলি, "ঠিক্ হ্যায়; মগর শুনিয়ে বাবুসাব্।" প্রবাদ আছে, যে কাঠায় মাপ্, সে কাঠাতেই শোধ। শক্তিমাতৃকার পরিমাপ করেছিলাম ত আমরাই পঞ্চ-মকারের কাঠায়; বহুদিনের কথা সেটা। প্রতীচ্যের জড়বাদের কাঠা দিয়ে প্রতিমামূর্তির পরীক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি এখন; প্রতিমা ত মাটি পাথর কাঠ পিতলের পুতুল! দেব-বিগ্রহ ত দেশের গলগ্রহ। আবার—শুম্ভ-নিশুম্ভের দৃষ্টির মাপ-কাঠা দিয়ে সম্প্রতি জগতের মাতৃকাদের নিরীক্ষণ করতে, আর বাহ্যিক রূপ-সৌষ্ঠবের মূল্য, পদক দিয়ে কৃতার্থ হ'তে চেষ্টা করছি। একেই বলে কাঠায় কাঠায় ধার আর শোধ; যা সবে আরম্ভ হয়েছে।

অন্তরার দিকে একটু এগিয়ে যাই ; কারণ, খাঁ সাহেবই বলেছিলেন, "ফির্ আগে বড়িয়ে বাবু সাব্!" আমি বলি, ভয় বা দুঃখ করে লাভ নেই। এই ত সবে আরম্ভ হ'ল চতুর্দশী আর অমাবস্যার সন্ধিক্ষণ ; আর দেখা দিয়েছে সাইক্লোনের আগে সেঁওটা। ঐ যে উল্লাস, ওটা ত রুদ্রগণের নিঃশ্বাস-সঙ্কেত, ভূত পিশাচের নেপথ্য-রচনা। দক্ষের অর্থাৎ আধুনিক রূপদক্ষদের শিবহীন যজ্ঞ ত সবে আরম্ভ হ'ল! আধুনিক মন্ত্রাচার্যের দল ত সবে বিলাতি উন্মাদনার আসব দিয়ে আচমন সেরে আঙ্গুলে নির্ভয় নিরঙ্কুশ কুশের আংটি চড়িয়েছেন। এখনই হয়েছে কী! আগে যজ্ঞটা শেষ হ'ক, তখন নিজের ঘাড়ে নিজের মাথাটা আছে কি না, হাত দিয়ে দেখে নিতে হবে। দক্ষের মুণ্ড বিজাতীয় ছাগমুণ্ড কি না, মায়ের বাহান্ন পীঠ হবে, কি চৌষট্টি পীঠ হবে, এ সব ত পরের কথা। এখন শুধু সাদা চোখে যজ্ঞটাই দেখি।

আর নয় ; ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর কণ্ঠে বন্দে মাতরমের ধ্বনির স্মৃতিকে উদ্ধার করতে গিয়ে ময়লা-মাটি উঠে পড়েছে। স্মৃতির ঢোলটা বিগড়ে গেল না ত ? কারণ, হাত ধুতে গিয়ে দেখছি আঙ্গুল জ্বালা করছে। মনকে জিজ্ঞাসা করি, 'এ কেমন হ'ল ?' মন বলে, 'ও- কিছু নয় ; ময়লা-মাটি ছাই-গাদার মধ্যে গেলাস—বোতলভাঙ্গা কাচের টুকরা ছিল, তার খোঁচা লেগেছে। ভয় নেই ; সঙ্গীতের পূর্বসূরি, গুণী, গায়কদের স্মরণ করো, জ্বালা দূরে যাবে।' তাই করি আমি। দেখি, গানের মধ্যে—সঙ্গীতের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ নেই, গন্ধ ছিলও না। কত শত মুসলমান গুণী গায়ক শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশের বিষয়ে পদ গান করে গিয়েছেন, গীত রচনাও করে গিয়েছেন এবং মুসলমান বাদশাহের দরবারেও সে সব গান গেয়ে গত হয়েছেন। সদ্য সদ্য কালে খাঁ সাহেবও ত উচ্চারণ করলেন, "তুয়া চরণকমলপর মনভ্রমর ভাল-ভান!' তখনই জ্বালা মিটে গেল প্রায় পনের আনার মত। বুঝলাম—বিলাতী বোতল আর গেলাসে ভরে আমরা ধার করে এনেছি পৌত্তলিকতার গন্ধবাতিক। সে কালে ঘট, কলসী বা মাটির ভাঁড়ও ছিল ; কিন্তু তাদের ভাঙ্গা টুকরাগুলি গুঁড়ো হয়ে এই মাটিতেই মিশে গিয়েছে মহিষাসুরের খুরের চাপে, দেহের ভারে। কিন্তু একালের বোতল—গেলাস-ভাঙ্গা কাচের কুচি এ মাটিতে মিশতে চায় না। সাবধান হয়ে যাই, ভবিষ্যতের জন্য।

তবুও একটি অস্বস্তি থেকে যায়। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী এবং তখনকার পুলিন বাবুর (সৌখীন সুকণ্ঠ গায়ক পুলিনবাবু) কণ্ঠের গান আর বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের সুরকে ত আমরাই চাপা দিয়েছি। এখন ফলভোগ করছি; জাতীয় প্রচার-সঙ্গীতের নামে সভা-মজলিসের আরম্ভ ও শেষে উঠ্-ব'স করছি। প্রতীচ্য থেকে আমদানী-করা এক রকমের কণ্ডুতি রোগ আমাদের পশ্চাতে আক্রমণ করেছে; স্থিরাসনে বসে 'বন্দে মাতরম্' গান হ'তে পারে না, স্থিরাসনে বসে 'বন্দে মাতরম্' গান শুনলে হবে যুগদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহ! বঙ্কিমচন্দ্র কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন—তাঁর সাধনার সিদ্ধিকে মাঠে মাঠে লেফ্‌ট-রাইট্ তালে নেচে কুঁদে পরীক্ষা দিতে হবে! অথবা, ঘরের মধ্যে ওঠা-বসা মাত্র আনুষ্ঠানিক উপোদ্‌ঘাতের বিড়ম্বনা সহ্য করে যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঙ্কেতে পরিণত হতে হবে! ঐ তিনটি আত্মার নিকট ক্ষমা চাই, আমি! তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে পারি যে—সঙ্গীতের বস্তুকে যেন সঙ্গীতের রূপেই ভালবাসি। তাকে খাটিয়ে স্বার্থসিদ্ধি বা প্রচারকার্য সাধন করে তার অপমান যেন কখনই না করি আমি।

অন্যের কথা বলতে পারিনে; আমার অস্বস্তি আমিই দূর করেছি। এখন প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

তম্বুরার প্রসঙ্গে কুমারের মুখে 'ঠিক-ঠাক্' শব্দগুলি শুনে মনে পড়ে গেল সেই জারুল কাঠের তক্তার কথা। গাম্ভীর্যের অভিনয় করে বল্‌লাম, "বার বার ওরকম 'ঠিক-ঠাক্' বল্‌বেন না। ওতে বিপদ্ ঘটতে পারে।"

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যে কোনও দেশ-কাল-পাত্র-ঘটিত বিপদের ইঙ্গিত মাত্র করলেই কুমার চম্‌কে উঠতেন, ভয় পেতেন। এই ছিল তাঁর স্বভাবের নিরতিশয় সৌকুমার্য। তাঁর জীবন-বীণার তারগুলি ছিল মিহি, আর মোলায়েম; বাঁধা ছিল অত্যন্ত চড়া সুরে; যেন তারের উপর মাছি বসলে রিণ্-ঝিন্ করে উঠে। খামখা কুমারকে জব্দ করে দেওয়ার ঐ কৌশলটি রপ্ত করে-ছিলাম আমি আর ননী। আমার মুখে অজানা বিপদের আভাস পেয়ে কুমার থমকে গেলেন। তখন সেই হুঁশিয়ার তক্তাপোশের চরিত্র বর্ণনা করলাম; নিকুন্ এ কথাটা তাঁর গোচরে আনেনি। কথাগুলি শুনে কুমারের মুখে চোখে হাসি আর কৌতুক দেখে কে! বিলাসপ্রাচুর্যের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট উপকরণ দিয়ে সজ্জিত সেই আরাম-কক্ষ যেন এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল কুমারের

সহাস সানন্দ ধ্বনির নির্দেশকে। মনে হ'ল, এরা যেন এখন সজীব হয়ে প্রতিধ্বনি করছে; বিচিত্র ভঙ্গির মর্মরমূর্তিগুলি, আর চিত্রাপিত কারু-সুন্দরীরা যেন সচকিত উল্লাসে শিহরিত হয়ে উঠল। অর্থাৎ আমি যা দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম, হয় ত সে আমার দৃষ্টিরই ভ্রম; হয় ত বা বুদ্ধির প্রমাদ মাত্র। কিন্তু তরুণ মনের সেই অনুভব করার প্রলিপ্সা এখনও ত নিবৃত্ত হ'ল না। প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার মত পটুতা এখনও আমার হ'ল না; এ বিষয়ে আমার অপাটব দোষটা বহুকালের সঞ্চিত।

হাসি তামাশার রেশ চলেছিল, কিছুক্ষণের জন্য। তারই মধ্যে কুমার বলে উঠলেন, "যাই বলুন পাঁচুবাবু, আমার হাতের তম্বুরা খাঁ সাহেবকে দেব না, বলে রাখছি।" আমি বললাম, "বুঝতে পেরেছি। নিকুন্ বোধ হয়, খাঁ সাহেবের দেহশ্রীর কথা বলেছে আপনাকে।" তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন, "ঠিক ধরেছেন আপনি"; বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন, আনমনা হয়ে। সেই সুশ্রী সুন্দর মুখখানি বিষাদের মেঘছায়ায় আবৃত হয়ে গেল যেন। খঞ্জনের মতো স্বভাবচঞ্চল চক্ষু দু'টি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে যেন দৃষ্টিকে লাঞ্ছিত প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিল অন্তরের দিকে, মুহূর্তের মধ্যে। কোমল অথচ প্রগাঢ় স্বরে তিনি বল্লেন, "অত বড় গুণীর ওরকম বেহাল করলেন কেন, ভগবান্!"

সেই এক সনাতনী জিজ্ঞাসা! এক নিমেষের মধ্যে বিচিত্র শব্দ-রূপের সেই রহস্যপরিবেশ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল আমার মনের মেঘাবরণের অন্তরালে। হাস-পরিহাসের ঊর্মিমালা বিলীন হয়ে গেল হৃদয়ের অক্ষুব্ধ অপরিমেয় গভীরে। চিরন্তনের প্রশ্নটিও যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল মনের নেপথ্যে, মীমাংসার সন্ধানে। আমার মানস নেত্রে আবির্ভূত হলেন কালে খাঁ সাহেব; বিদায়কালীন সেই হর্ষোৎফুল্ল আভাস। আর একবার যেন শুনতে পেলাম তাঁর কথাটি, "বাবুসাব, আপনি সন্ধ্যাবেলা আসছেন ত?" সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে 'কেন' বা 'কি হেতু'র অভিযোগ ত ছিল না এ প্রশ্নের মধ্যে। এর মধ্যে ছিল, দু'টি অক্ষম দুর্বল মানবহৃদয়ের পরস্পরের পরিচয়ের শেষে 'কবে' আর 'কখন' বলে কিছু প্রতীক্ষার বার্তা, সুযোগের সন্ধান, আশা আর আকুতির রেশ। তখনকার তখন আমার মনে এই শেষের ছবিটিই বড়ো হয়ে দেখা দিল; কুমারের প্রশ্নটা যেন কিছু নয়। কিন্তু—সন্দেহ হয়, কি জানি, হয় ত বা সেই সনাতন প্রশ্নই অনন্তের কূল না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে শতধা খণ্ডিত হয়ে ফিরে

আসে, আর যে যেমন পারে, ভিড়িয়ে যায়—মানুষের শান্ত মনেরই কিনারায়; এই টুকরাগুলিই কি আমাদের আশা আর আকাঙ্ক্ষা! তা হলেও—হৃদয়ের উপকূলে ভিড়িয়ে যাওয়া এই আশা-আকাঙ্ক্ষার টুকরাগুলিই আমাদের প্রেয়, আর নির্ভরযোগ্য। বড় বড় সনাতনী প্রশ্নের দার্শনিক মীমাংসা দিয়ে মন মজে না, কাজ মিটে না, মানব-জীবনের।

এমন সময়ে কুমারের কোনও স্বজন এসে মৃদুস্বরে সংবাদ দেয়, তাঁর আহার্য সজ্জিত হয়েছে। তখন প্রায় দু'টা বাজে! কুমারের নিকট বিদায় নিলাম আমি। তিনি শেষ বারের মত অনুরোধ করলেন, কালে খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা, আর আগামী সন্ধ্যায় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা, এ দু'টি ভার যেন আমিই নিই। আমার জীবনে আরও কয়েক বার ওরকম দায়িত্ব নিয়েছি স্কন্ধে। কিন্তু প্রতি বারই সেটা আমার মাথার উপরে উঠে গিয়েছে, আনন্দের উপঢৌকন হয়ে। গুণীদের সঙ্গলাভ করা, তাঁদের সঙ্গে যাতায়াত করা ত মহান্ সুনিমিত্ত বলেই মনে হয়েছে। সর্বপ্রথম কালে খাঁ সাহেবই এরকম ব্যাপারের স্বাদটি পাইয়ে দিয়েছিলেন।

রাজভবন থেকে ফিরে এলাম ননীদের বাসায়। ননী জানত, নিকুন্ আর আমি হাওড়ায় গিয়েছি। আমাকে একলা ফিরতে দেখে প্রশ্ন করে ননী; আমি সব কথা বল্লাম তাকে। খুবই উল্লসিত হ'ল ননী; কিন্তু আশ্চর্য হয়নি সে। অভাবনীয় বলে যে ফল, তার রস আর শস্যই বেছে নিত, ঘটনার ছোবড়াকে সে আমলই দিত না! তাকে বল্লাম, "ভাই, বাসায় ফিরে স্নান করতে হবে; তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়েই সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ রওনা হব খাঁ সাহেবকে খবর দিতে। তুমি তৈরি হয়ে নেও, একসঙ্গে যাওয়া যাক্। কালে খাঁ অদ্ভুত লোক।" আমি একটু অধীরই হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, বেলা বুঝি বয়ে গেল। ননী আমার কথা শুনে তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে; কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার জন্য নয়। উল্লাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর মাঝে মাঝে গগন ওস্তাদের (স্বনামধন্য বিদ্যাসুন্দর টপ্পা গাইয়ে) ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে, হাতে তালির চাপড় দিয়ে ননী সুর করে এক কলি ধরল—

"ও যাদুমণি ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো;
এই ত কলির সন্ধ্যাবেলা, ভোর না হতে হও অ-ধর!"

কালংড়ার সুরে, আর আড়খেম্টার ছন্দে। হীরা মালিনীর মুখে সুন্দরের

রূপ-যৌবন গুণপণার পরিচয় পেয়ে বিন্ত্যা 'অ-ধর' হয়েছেন ; তাঁকে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। বিন্ত্যার ভাবগতিক দেখে হীরা ঐ কথাগুলি শুনিয়ে দিচ্ছেন রসিয়ে রসিয়ে।

অগত্যা ধৈর্য ধরি আমি ননীর কথায়।

আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময়ে ননী ও আমি ট্রামে করে চলেছি খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানাতে। ননীর ছিল সৌখীন নাগরিকের বহির্ভ্রমণের বেশ, অর্থাৎ গিলে-করা ধব্‌ধবে পাঞ্জাবী, শান্তিপুরের ধুতি আর গ্রেজ্‌ কিডের অ্যাল্‌বার্ট সু ; অসাধারণ বলতে ছিল হাতে একগাছা ছড়ি। সে যখন রাজবাড়ী যেত, তখনই ঐ ছড়ি নিত। সে দিন কথা ছিল, খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে চলে যাবে রাজভবনে আর কুমারকে সাক্ষাতে সংবাদ বলবে। ট্রামের মধ্যে ননীর পাশে আমি বসেছিলাম যেন বিদূষক, বড় জোর রাজন্যবন্ধু।

কালে খাঁ সাহেবকে আবিষ্কারের কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়েছি ননীকে। খাঁ সাহেবের চিত্রটি কল্পনায় এঁকে নিয়ে রং ফলাতে গিয়ে বল্‌ল সে, "খাঁ সাহেব ত তা হলে খুব নিরীহ ভালমানুষ যত দূর বোঝা যাচ্ছে ; ওঁর সঙ্গে কথা বলে ত সুখ হবে না ভাই। চট্‌পট্‌ কথা বলে না যে, সে ত একটা পাথর ; পাথরে ঘা দিয়ে লাভ নেই।" আমি ননীকে বলি যে, সব সময়ে ঘা দিয়ে দেখতে হবে মানুষকে এই বা কি কথা। যাই হ'ক, ওঁর সামনে কোনও বীণ্‌ সেতার বা সুরবাহার বাজিয়ের কথা তুলো না, ভয়ানক চটে যান তিনি ; ব'লে শ্যামলালজী আর তন্নুলালজীর মুখের বর্ণনাটাও বল্‌লাম ননীকে। ননী সে কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বলে, "তাই না কি! তা হলে ত খুব মজা। ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেবের সেদিনকার সেই দরবারীর আলাপ আর গান্ধারের কথাটা ত পাড়তেই হয় দেখছি!" মহারাজভবনে যে সব যন্ত্রীরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে কলিকাতাবাসী ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেবই যথার্থ সুরে মজিয়েছিলেন আমাদের। বিশেষ করে একদিন দরবারীর আলাপের অছিলায় বারকতক এমন ভাবে এমন একটি কোমল গান্ধারের সম্মোহন বাণ মেরেছিলেন, যাতে আমরা অনেকদিন মোহগ্রস্ত হয়ে ছিলাম। মূর্ছার ভাবটা কেটে গেলে বাণটি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সেই মাধুর্যের বিষটা নিঃশেষ হয়ে যেতে চায় না হৃদয় থেকে! ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেব ইনায়েত হুসেন খাঁ সাহেবের পিতা।

আমার ধারণা হয়েছে, ইম্‌দাদের বাজনা শুনে তাঁর ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু ছেলেদের বাজনা শুনে ইম্‌দাদের প্রতিভা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না, গতেই বা কি, আলাপেই বা কি!

ননীর কথায় ভয় পেলাম আমি, বল্‌লাম, "সর্বনাশ! আর যাই করো ভাই, ঐ কাজটি করো না; করলে খাঁ সাহেবের মুখে খিস্তি শুনতে হবে।" ননী বলে, "তাই না কি! তা হলে ত আরও মজা! খিস্তির মুখেই ত আসল মানুষটি বার হয়ে পড়ে! আর নূতন বোলচালের পাঞ্জাবী খিস্তিও শোনা যাবে। এ ত ভাল কথা; ভয় কি?" ননীর ভাবগতিক আমার ভাল বলে বোধ হ'ল না; বল্‌লাম, "ভাই, আজকের শুভলগ্নে খিস্তিটা না হয় নাই শুনলে, নাই টেনে বার করলে। তা ছাড়া, খাঁ সাহেব একটু আজব রকমের সৃষ্টিছাড়া মানুষ; চটে গিয়ে হয় ত মুজ্‌রা নিতেই গর্‌রাজি হবেন। তা হ'লে যে বড় বিপদ্ হবে। আজকের দিনটা খোঁচাখুঁচি করো না ভাই, মুখ সামলে রেখো, দোহাই তোমার।" ননী হাল ছেড়ে দিয়ে বলে "তাই না কি! আগে বলতে হয় আমাকে! আচ্ছা, তুমি যখন বল্‌ছ, তখন তাই হবে, উপায় কী।"

এ-কথা সে-কথার মধ্যে চীৎপুরের মোড়ের আগেই ট্রাম মন্থরগতি হয়েছে খেয়াল হ'ল আমাদের। ননী হঠাৎ বলে, "মোড়েই নামা যাক্। করিমের দোকানে অনেক দিন যাইনি। কিছু পেস্তা-আখ্‌রোট নিতে হবে আজ। বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে মেরে দেওয়া যাবে, যথেষ্ট সময় আছে।" আমি ভাবলাম তাই হক। ননীর সব রকমের সাধ-আহ্লাদে বাদ সাধাও ত ঠিক নয়; আর খাঁ সাহেব হয় ত এতক্ষণ নমাজে বসেছেন।

করিমের দোকান অর্থাৎ দু'নম্বরের ফলের দোকান। অবশ্য করিম সেই দোকানের মালিক নয়। তা হ'লেও আমরা দু'নম্বরের দোকানকে করিমের দোকান বলতাম। সে দোকানের সঙ্গে বেশ একটু খাতিরের সম্বন্ধ ছিল আমাদের; সখ্‌সওগাতের জন্য ত বটেই, বিশেষ করে ননীর বচনপটুতার জন্য। আর সেই দোকানেই ছিল আমাদের সমবয়সী একটি ছোকরা, যার নাম ছিল করিম আর বাড়ী ছিল নওশেরা অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশে, ভারত-সীমান্তের পারে কোনও গ্রামে। সে নিজেকে পাঠান বলে পরিচয় দিয়েছিল।

সুন্দর চেহারা ছিল করিমের; ফরসা রং, ডিমের মত মুখের আকৃতি, বাঁশীর মত নাক, আর নাকের নীচেই গোঁফের রেখা, চিকন পরিষ্কার। তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল হৃদ্য, অথবা হৃদয়ের কাছ-বরাবর। সম্বন্ধটা আবিষ্কার আর রচনা করেছিল ননী—প্রথমে একটি সাবলের ঘা দিয়ে, আর পরেই কাশ্মিরী সুঁচের ফোঁড় দিয়ে। সেই দোকানে বসে তার সঙ্গে প্রথম কথাবার্তার একটু অবকাশে ননী কি বুঝেছিল জানিনে, তার হাত ধরে অনতিদূরে একটু নিভৃতে নিয়ে এল আর মোলায়েম অথচ মজ্‌বুত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "অরে ইয়ার! বিয়া-সাদি করছ কবে? জওয়ানির পেয়ালা ত ভরে উঠেছে করিব্‌-করিব্‌! এখন থেকে চুমুক না দিলে যে উছলে পড়বে!" অকস্মাৎ ঐ প্রাণখোলা ভাষণ শুনে করিমের সুরমা-টানা বড় বড় সরল চোখ দুটি সঙ্কুচিত হয়ে যায়; যেন চোর-ধরা-পড়েছে রকমের ভাব তার মুখে। সামলে নিল সে একটি মাথাঝাড়া দিয়ে। মুখের কথা বলে ধরা দিল না তখন; কিন্তু মনে হল, যেন তার মনের দোলনই ছড়িয়ে পড়ল সেই বাবরি চুলের ঢেউএর বাহারে। পাহাড়ী দেশের ছোকরা কখনও বিয়ের কথা ভাবে না; সুযোগ নেই, অবসর হয় না, উত্তেজক কারণও ঘটে না। এ সব কাহিনী শুনেছিলাম আমরা শ্যামলালজীর এমন কয়েকজন আত্মীয়ের মুখে, যাঁরা হিন্দু হয়েও দু'তিন পুরুষক্রমে বাস করেছেন ডেরাইস্‌মাইল খাঁ অঞ্চলে; আর মাঝে মাঝে মথুরা আর কলকাতায় এসে স্বজনবিরহের ভার লাঘব করে ফিরে যেতেন সেই দেশে। যাই হ'ক, করিম বেচারা পাঞ্জাবে আত্মীয়ের গৃহে বাস করতে এসে একটা মনোরম ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল; ননীর কথার চাপে মোটামুটি স্বীকার করল সে কথা। এর পরেই ননীর মুখে যখন গুণ্‌-গুণ্‌ স্বরে "জুল্‌ফ্‌ পুর্‌ পেঁচ মে দিল্‌ এয়সা তো গিরফ্‌তার্‌ হুয়া, ছুট্‌না দুশ্‌বার হুয়া" গজলের সুর করিম শুনল, তখন সে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল; মাথাঝাড়া দেয়নি আর। শাবলের ঘা'এর পরেই কাশ্মিরী সুঁচের ফোঁড় দু'চারটি একেবারে মর্মে সন্ধান করেছে! সত্য সত্যই সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি কিশোরীর ঝুমকা-লাগান কানের পাশে লপেট্টদার জুল্‌ফির পেঁচের মধ্যে তার মনটি আটকা পড়ে গিয়েছিল; করিমই এ সব কথা বল্‌ল ক্রমশ, প্রাণ খুলে অসঙ্কোচে। কলিকাতা শহরে করিম নূতন এসেছে, চালানি কাজকারবার

শিখতে। কিন্তু আমাদের মতো সহৃদয় শ্রোতা পাবে কোথায় সে! ফলের দোকানে ফল কিনতে এসে ননীই আবিষ্কার করেছিল এই পাহাড়ী ফুলটি, অমন সরল প্রাণটি। দোকানের মালিক ছিলেন করিমের মুরুব্বি; কড়া নজর ছিল তাঁর এই ফুলের উপর। করিমের সঙ্গে আমাদের দোস্তির মনোভাব দেখে মনে মনে খুশীই ছিলেন; কিছু না হ'ক, ভাল খরিদ্দার পাকা আর কায়েমি হ'তে চলেছে।

করিমের কথা এখানেই শেষ হ'তে চায় না। স্মৃতির পথে শেষ ফলের অতিরিক্ত একটা ফুলের সুঘ্রাণও জমাট বেঁধে রয়েছে; নিক্তিধরা প্রয়োজনের নিরপেক্ষ একটা প্রেয় বস্তুরও সন্ধান রয়েছে। কালে খাঁ সাহেবের আলোর এলাকায় পড়ে গিয়েছে করিম। তবুও তার নিজের জীবনরেখার এমন কিছু স্বতন্ত্র দীপ্তিও ছিল, যেটা প্রকাশ পেয়েছিল পরে, একটি ঘটনাসূত্রে।

তখন থেকে এক বৎসর পরের সেই ঘটনা। বিপিনবাবু, শচীন আর আমি ফিরছি বেলুড় মঠ থেকে। বিপিনবিহারী দে ঈশান-স্কলার, দর্শন-শাখায় (১৯১৪ সাল); শচীন অর্থাৎ শচীন্দ্রলাল দাস বর্মাও কম নয়, ইংরাজি সাহিত্যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (১৯১৪); তাঁদের সঙ্গে আমি ত জাহাজের পিছনে জালিবোট! বেলুড় মঠে আব্দুলের কালীকীর্তন দলের ধ্রুপদ শুনে আমার মন রসসিক্ত হয়ে রয়েছে। শচীনের কথা এই যে, গান খুবই ভাল লেগেছে, তবে সেখানে অতিথিসৎকারের মধুর সরস আস্বাদটাও ত কম নয়! বিপিনবাবু গান সহ্য করতে পারতেন না, পারত পক্ষে; আর অজীর্ণের রোগ ছিল বলে ভোজনের কাজটা সেরেছেন ভয়ে ভয়ে। আমরা যখন গান শুনছি, তখন বিপিনবাবু উঠে গিয়ে নিভৃতে স্বামীজীদের সঙ্গে বোধ হয় মানবজীবনের ইষ্টানিষ্ট প্রসঙ্গ করেছেন। সন্ধ্যার একটু পরেই ফিরছি আমরা হাওড়া ব্রিজের দিক্ থেকে, হ্যারিসন রোডের ডান দিকের ফুটপাথ ধরে।

ফলওয়ালাদের দোকানের কাছে একটা বাড়ীর সামনে দেখি ভিড় হয়েছে, আলোর বাহারও দেখা দিয়েছে। ভিড়ের পাশ দিয়ে যেতেই প্রথমে কানে এল বিজাতীয় সুর; ক্রমশ নজরে এল পেশোবারীদের জমাত; রাস্তার ধারেই একটি ঘরের মধ্যে। একটু চেষ্টা করে উঁকি দিয়ে দেখি, ঘরের ভিতরে গ্যাস-লাইটের আলো আর ছায়ায় সতরঞ্চির উপর আসর। আসরে

জনচারেক পেশোবারী, খালি মাথা, আর প্রত্যেকে একটি করে ছোট গড়নের রবাব নিয়ে একসঙ্গে বসে গান করছে; এমন ভাষায়, যা আমরা বুঝি না, এমন সুর, যা আমি কখনও শুনিনি আগে। কিন্তু কী প্রাণ-মাতান সেই গান! আর কত সরল ছন্দের দোলা সেই গানের সুরে! তিন জনই দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভাল করে নজর দিতে গিয়ে দেখি, আমাদের করিম সেই গায়কদের একজন। সে ত অনেকদিন ছিল না! তা হ'লে ফিরে এসেছে। কিন্তু করিম অমন সুকণ্ঠ গায়ক আর বাদক! গানের ধারা বিচার করে বুঝলাম, করিমই মুল গায়েন; প্রথমে করিম গান করে এক কলি; শেষ করলে অন্য তিনজন একসঙ্গে সেই কলিটি গান করে। করিম তা হলে পাকা গাইয়ে!

এমন সময় একজন চেনা পেশোবারী আমাকে দেখে সাদর অনুরোধ জানায় ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে। তার অনুরোধ উপেক্ষা করিনি। বিপিন-বাবুকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে আমি আর শচীন ঘরের মধ্যে আসন নিলাম। মুহূর্তের জন্য করিম আমাকে দেখে হর্ষভরা চাহনি ও আদাবমাত্র দিয়ে আপ্যায়িত করল; কিন্তু কোনও কথা বলেনি সে গানের মধ্যে। চার জন গায়ক গান করে চলেছে যেন পাগলের মতো! তাদের মাথার দোলানি আর চোখের অজানাসন্ধানী দৃষ্টি দেখে আমাদের তাই মনে হল। সুরের ভাঁজ আর চলত্-ফিরতও ছিল অদ্ভুত, সাবলীল। মাঝে মাঝে এক একটি চরণের শেষে হঠাৎ রবাবের তান আর সঙ্গত্ বিশ্রান্ত হয়ে যায় মাত্র একটি সুরে; আর ঠিক সেই সময়েই কোনও একটি স্বরবর্ণের প্লুত ধ্বনিকে সম্বল ক'রে রাগাপ্লুত কণ্ঠের আবেগ-ভরা রেশটি ঈষৎ কম্পমান রেখার মতো সুরের দিগ্‌দিগন্তরে ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে; পাহাড়ী বনলতার শীর্ষে ত্বরিতচুম্বনের বিদায়-সঙ্কেত জানিয়ে প্রলম্বিত নিস্বনের রূপে মিলিয়ে যায় যেন একটির পর একটি সমীরণ-হিল্লোল, দূরে, সুদূরে, অতিদূরে। সে দীর্ঘশ্বাস যখন শ্রবণের সীমা পার হয়ে গিয়েছে, এক নিমিষের মধ্যেই মানস গগনের অলক্ষ্য অবকাশে ভাবের বিচিত্র তারাবলী দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে আবার আরম্ভ হয় রবাবের "দুং দুং দৌ দৌ" ধ্বনি; পাহাড়ের বুক ফেটে বেরিয়ে-পড়া সুদূর নির্ঝরের আসন্ন প্রতিধ্বনির মতই চমৎকার অলৌকিক! চার জন বাদকের হাতের চারটি জরবার (রবাব্ বাজান'র উপযোগী কাঠের মেজ্‌রাব এক

রকমের) সমকালীন এক একটি আঘাত যেন এক একটি হৃৎস্পন্দন ! যন্ত্রীর, না যন্ত্রের ? কথার, না সুরের, না কি ছন্দের ? অথবা শ্রোতারই হৃদয়ের ? আমি জানি না ; আমার মনে হয়—সকলের ; সেখানকার সব কিছু জড় ও চেতন বস্তুরই যেন স্পন্দন সেগুলি।

পরে কত বার আমার মনে হয়েছে, যখনই করিমকে মনে করেছি, তখনই মনে হয়েছে—কলকাতার সন্ধ্যায় একতলার ঘরে বসে যদি এমন অনুভব সম্ভব হ'ল, তা হ'লে করিমের দেশে, তার বাড়ীর জমাতের আনন্দের মধ্যে ওরকম অভিজ্ঞতা না জানি, কত তীব্র অনুভূতি সাক্ষাৎ করাতে পারে! কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

গান শেষ হ'লে করিম উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে, কুশল জিজ্ঞাসা করে, ননীর কথা জিজ্ঞাসা করে।

আমরা উঠে বিদায় নেওয়ার সময়ে করিম ও বাড়ীর কর্তা, একজন পেশোবারী ভদ্রলোক, আমাদের প্রত্যেককে রেকাবী করে বাদাম-পেস্তা প্রভৃতি এনে দিলেন। আমরা সেগুলি নিলাম। করিম বার হয়ে এসে ফলের দোকান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায় আমাদের।

আমরা সেই ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে গানের সুরের বিষয়ে কত কি কথা বলছি। আর পকেট থেকে বাদাম-পেস্তা আর মিছরির টুকরা বার করে খেয়ে যাচ্ছি। বিপিনবাবু চলেছেন নীরবে ; বোধ হয় সময়ের অপব্যয়ের দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা করছেন। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে আমাদের খেয়াল হ'ল যে, পকেটের মাল ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কি আশ্চর্য! আমার আর শচীনের কি একসঙ্গেই মনে হ'ল যে, বিপিনবাবুর মতো অজীর্ণরোগীর পকেটে বাদাম-পেস্তার মত বিস্ফোরক পদার্থ থাকা বা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না মোটেই। দাঁড়িয়ে গেলাম। বিপিনবাবুর পকেট থেকে আমরা ঐ সব বিপজ্জনক পদার্থ বার করে আমাদের পকেটে পুরলাম। বিপিনবাবুর মুখে কথাটি নেই ; আমাদের ধন্যবাদ করতেও ভুলে গেলেন!

তাঁর কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়। সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বল্‌লাম, "বিপিনবাবু, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় ?" দীর্ঘ সময়ের অন্তে এই আমার প্রথম প্রশ্ন। বিপিনবাবু আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন, যেন ধ্যানভঙ্গের মত। বল্‌লেন, "কি বলছেন ? কষ্ট ? কষ্ট হয়নি ত! আমার জীবনে আমি এই সর্ব-

প্রথম গান শুনলাম। সত্য বলছি আমি। এর আগে যেন গানই শুনিনি" ; বলে গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেলেন। এবার অবাক্ হওয়ার পালা আমার আর শচীনের! আমি কী জিজ্ঞাসা করলাম আর বিপিনবাবু কি ভেবে কোন্ দিক্ দিয়ে তার উত্তর দিলেন! সামলে নিয়ে আমি বললাম, "আপনি কি ষ্টিফেন সাহেবের সাগরেদের মত কথা বল্ছেন? না কি, ইমার্সনের বুলি আউড়ে কথা বল্ছেন?"

আদালতে হেড্ জুরির মত দৃঢ় অবিচলিত স্বরে বিপিনবাবু বললেন "না, মোটেই না। আমার নিজের মনের কথাই ত ভাবছিলাম এতক্ষণ। মনের কথাই বলছি, আমি যেন একটা নূতন রকমের জগৎ প্রত্যক্ষ করলাম ঐ পেশোবারীদের গান শুনবার সময়ে। ভাবছি, হয় ত আমার একটা ফ্যাকাল্টি চাবি বন্ধ ছিল। আজ সেই ঘরের দরজা জানালা খুলে গেল। কেমন করে এটা হল, তাই ত ভাবছিলাম এতক্ষণ।"...

দিন কয়েক বাদেই শচীনের সঙ্গে দেখা হল। সে বল্ল, বিপিনবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তিনি একটা হারমোনিয়ম কিনবেন, আমি সঙ্গে না থাকলে হবে না। আশ্চর্য বটে! ধীর স্বল্পবাক্ দার্শনিক বিপিনবাবু যাকে বাংলা বা হিন্দি কোনও গান শুনিয়ে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারিনি আমি বা অন্য কেউ, তিনিও সুরের ফাঁদে পড়লেন! আর তিনি ধরা দিলেন পষতু ভাষার গানে আর পাহাড়ী সুরে! শ্রুতির তূণীরে বাইস বাণ; সুরের জালে বদ্ধ আমরা; কখন্ কোন্ বাণে ঘায়েল হই জানিনে।

করিমের স্মৃতি সহজেই উদিত হয়; কিন্তু অত সহজে বিদায় নেয় না তার সেই পাহাড়ী দেশের গান আর সুর; যে সুর বিপিনবাবুর মনে অনুভবের নূতন রাজত্ব আভাসিত করে দিয়েছিল। এখন প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

চীৎপুরের মোড়ে ভিড়ের মধ্যে ননী আর আমি অগ্রসর হচ্ছি। দু'নম্বরের দোকানের দিকে আমার দৃষ্টি গিয়েছে কি আমি থেমে যাই! দেখি, সেই দোকানের সামনে রাস্তার ধারেই স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব; মনে হ'ল, যেন একটা টুলের উপর বসে তিনি! এমনটি ত আশা করিনি।

ননীর হাত চেপে ইশারা করলাম, ননী দাঁড়িয়ে গেল; তৎক্ষণাৎ বল্লাম তাকে, সাক্ষাৎ খাঁ সাহেব বসে রয়েছেন ঐ দেখ। ননী, খাঁ সাহেবকে দেখ্ল প্রথম বার। খাঁ সাহেব অবশ্য আমাদের লক্ষ্য করেন নি তখন। ননী

ভাল করে এক টিপ নস্য নিয়ে নাক মুখ পরিষ্কার করে নিল রুমাল বার করে। বল্‌ল, "চলো, পাকড়াও করা যাক্।"

একটু এগিয়ে যেতেই দু'তিন জন পেশোবারী ননীকে দেখেই বল্‌তে আরম্ভ করছে, "সেলাম বাবু সাব্" "আইয়ে বাবুসাব্, ইধার আইয়ে"। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ননী এগিয়ে চলে পালোয়ানী ঢংএ বুক চিতিয়ে; আমিও চলি সেই করিমের দোকানের দিকে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি, যদিও দোকানে আলো জ্বলছে। করিমের দোকান থেকে একজন চেনা লোক চট্ করে বার হয়ে আসে, ননীকে ও আমাকে সেলাম্ জানায়; আর দু'হাত আগলে দাড়ায়, মতলব এই যে আমাদের আর অগ্রসর হতে দেবে না সে। আমি প্রায় পাশ কাটিয়ে উঠেছি। ইতিমধ্যে ননী জোর গলায় প্রায় ধমকের সুরে বল্‌ল, "অরে, হটো মিঁয়া। দেখতে নহি, সামনা পর হিন্দুস্তানকে রিঝানেওয়ালা খুদ্ বৈঠে হুয়ে হ্যায়! পহ্‌লে উন্‌সে মুলাকাত হো যায়, বন্দ্‌গি করেঁ; তব্ পিছে লেন্‌দেন্ কি বাত। ঘবড়াতা কেঁও।" রিঝানেওয়ালার অর্থ—যে আনন্দ সঞ্চার করে।

ননীর কথা শুনে লোকটি হাত নামিয়ে নিল; ঘাবড়াবার ছেলে নয় সে; কিন্তু ননী, অর্থাৎ তাদের ডাক্‌টর সাব্ কালে খাঁ সাহেবকে চেনে, এইটাই তার পক্ষে যথেষ্ট কথা। ননী আর আমি খাঁ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে বন্দ্‌গি জানালাম। খাঁ সাহেব আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন, প্রতি-নমস্কার করেছেন। আর কিছু হয় ত বলতেও যাচ্ছিলেন; কিন্তু ননীর একটা কথায় খাঁ সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ননী ফলওয়ালাদের উদ্দেশে মুরুব্বিয়ানার গলায় প্রায় চীৎকার করে আর তিরস্কার করে বল্‌ল যে, তারা এমনই গঁওয়ার (গ্রাম্য) বে-আক্কিল্ লোক যে, খাঁ সাহেবের মত বুজুরগ্ শরীফকে একটা রদ্দি না-কামিল্ (বসবার অযোগ্য) তিপাইয়ের উপর বসিয়ে রেখে তাঁকে তক্‌লিফ্ দিচ্ছে। হায়, হায়, ক্যা শরম্ কি বাত্! সারা কল্‌কত্তা শহরের বদ্‌নামি হ'ল আজ! আর ভাই, চেয়ার-টেয়ার কিছু থাকে ত বার করো; জল্‌দি।

বাস্তবিক, সেই টুলটার চারটি পায়া থাকলেও, একটি পদ ছিল বিপদের কারণ হ'য়ে; তা ছাড়া বাইরে সাধারণের মধ্যে খাঁ সাহেবকে টুলে বসতে দেওয়াও ত অসম্মানজনক, বিশেষ করে দোকানে চেয়ার রয়েছে। কিন্তু

তখন আমরা জান্‌তাম না যে—ডেরা থেকে বের হয়ে এসে খাঁ সাহেব নিত্যনৈমিত্তিকরূপেই ঐ দোকানটিতে বসেন; এটা তাঁর প্রথম হল্‌টিং স্টেশন্। আর চতুষ্পদ চেয়ার ও চতুষ্পদ টুলের পার্থক্যটা খাঁ সাহেবের এমন কিছু ইতরবিশেষ নয়।

ননীর সেই চেহারা আর তার সঙ্গে মুরুব্বিয়ানার চাল-চাল্ দেখেই বোধ হয় খাঁ সাহেব অবাক্ হয়েছিলেন। দোকানীরাও যেন একটু লজ্জিত বোধ করেছিল ননীর কথায়; তাড়াতাড়ি করে একখানা চেয়ার বার করে ফেল্‌ল। ননী খাঁ সাহেবের হাত ধরে টেনে চেয়ারে•বসিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ে। ইতি-মধ্যে করিম ভিতরে ছিল, ননীর হাঁকডাকের চেনা আওয়াজে সে বার হয়ে এসে দাঁড়াল, নমস্কার করল আমাদের। সে হয় ত ভাবছিল, আমরা দু'জন কি করে, কবে খাঁ সাহেবের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করেছি।

একটিমাত্র খালি টুল, আর তার পাশেই অতিথিসৎকারের মামুলী বেঞ্চ। আমরা বসব বসব করছি, এমন সময়ে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে করিমের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের আওয়াজে বল্লেন, "লাহ্‌ল-ওয়েলা কুবত্! দো কুর্‌সি ঔর্‌ভি তো নিকালো। ক্যা ইন্‌লোগ্ খাড়ে রহেঙ্গে?" করিম ছুটে যায় আর কি; এমন সময় একজন আর একখানা মাত্র চেয়ার উঠিয়ে নিয়ে এল; তৃতীয় চেয়ার আর নেই। আমি ননীকে চেয়ারে বসতে বলে নিজে টুলখানি টেনে নিয়ে বসলাম্। করিম আর দোকানের লোক-জন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ; এখন তারা স্বস্তি লাভ করল যেন।

ননী সুস্থির হয়ে বসে পকেট থেকে দামী সিগারেট্ কেস্ বার করে তা থেকে একটি নিয়ে খাঁ সাহেবকে নিবেদন করে আর দিয়াশালাই কাটি বার করে খাঁ সাহেবকে সাহায্য করে। নিজেও একটা ধরিয়ে নিল; করিমকেও দিতে গেল, কিন্তু করিম আদাব্ জানিয়ে বল্‌ল, মাফ্ করুন। ননী সিগা-রেট্ ব্যবহার করত কদাচিৎ; কিন্তু কেস্‌টা বোঝাই করে নিয়ে বাড়ী থেকে বার হত সর্বদা।

দু'জনার মুখ বন্ধ; আমিই আরম্ভ করলাম; বল্‌লাম ইনি আমার চচেরা ভাই (খুড়তুত ভাই), ডাক্‌টর্, রইস্ আদ্‌মি; আর সুর বলতে নিহায়েত্ রাগিব্ (অত্যন্ত আসক্ত) ইনি; আমার মুখে আপনার কথা শুনে ইনি আর থাকতে পারলেন না। বল্‌লেন, চলো ভাই খাঁ সাহেবকে

দরসন্ করে আসি; ইত্যাদি করে শেষে বল্‌লাম, মহারাজ নাটোরের রিস্তা-দার ইনি; আপনার সামনে কিছু আরজ্ করবেন; বলে ননীকে ইশারা করলাম, অর্থাৎ সেই যেন খাঁ সাহেবের নিমন্ত্রণ সংবাদটা জাহির করে, তার মুখে মানাবে ভাল।

ননী সে রাস্তায় গেল না। বল্‌ল, "খাঁ সাহেব, বুরা মত্ সমঝিয়ে। আপনার ডেরাতেই যাচ্ছিলাম আমরা, দৌড়্‌তে হুয়ে (যেন দৌড়তে দৌড়তে)। সিরফ্ মৌজ্ আর খেয়ালের বশেই আমরা এখানে নেমে পড়েছিলাম। বলুন ত, যদি এখানে না এসে পড়তাম, কি মুশকিলই হ'ত! আপনার পত্তা পেতাম না, বুক চাপড়ে হায় হায় করে ফিরে যেতাম মুলাকাত্ হওয়ার ভাগ্য নেই বলে।" খাঁ সাহেব যেন কথার খিলাফ্ করেছেন, এমন একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুর ছিল ননীর গলায়।

ননীর কথার দোষ নিলেন না খাঁ সাহেব। লজ্জিতও হলেন না। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে বিড়্‌বিড়্ ধ্বনি করে পরে গম্ভীর স্পষ্ট স্বরে বল্‌লেন, "হর্‌গিজ্ নহি (কখনও নয়) ডাকৃটর সাব্! এয়সা হো নহি সকৃতা। খোদাকা মর্জি ইয়ে হ্যায় কে ইসি জাগাহ্ পর আপ্ ঔর হামারা মুলাকাত্ হো যায়গি। ত ফির্ ক্যা কহুঁ উন্‌কে রহম্ ঔর মর্জিকে হিসাব!" অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ এখানে মুলাকাত্ হওয়াটা ছিল, তাই হয়েছে। আর, তাঁর ইচ্ছা আর কৃপার হিসাব-নিকাস আমি কি করে দিব?—ওরকমের কথা হ'ল শেষ কথা; ওর কি জবাব আছে, না হয়!

কথাটা শুনে ননী একটু থেমে যায়; পরে ঘাড় নেড়ে তারিফ করতে করতে বল্‌ল, "বহুত্ ঠিক বাত্ বললেন, আপনি; এর জবাব নেই" বলেই করিম আর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "কী ছাই লেন্-দেনের কথায় মস্ত্ হয়ে আছ ভাই! খাঁ সাহেবের কথাটা একবার খেয়াল করলে না, হায় হায়!" তারা খেয়াল করেছে। ননীর কথা শুনে এখন তারা জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় যে, তারা খেয়াল করেছে। এরই মধ্যে ননী আমাকে চাপা গলায় জানিয়ে দিল যে, খাঁ সাহেব একজন প্রচ্ছন্ন সাধক, যে-সে লোক নয়; তবে সেটা আমি এখন বুঝতে পারব না। কথাটা আমার প্রাণে লাগেনি। খোদার মর্জি আর ভগবানের কৃপার

বুলি শুনে শুনে কান পচে গিয়েছে; ওগুলি ত কথার মাত্রা। যাই হক, ননী খাঁ সাহেবকে বল্‌ল, "ইনি আমার ভাই। আপনি কী এক আজব্‌ আসাওরি এঁকে শুনিয়েছেন আর ঘায়েল করেছেন এঁকে। আপনি ত মনে হচ্ছে যেন খোদার তরফের লোক; সব কিছু জানেন বুঝেন। এখন আমার নসিবে আপনার গান শুনতে পাওয়া আছে কি না, মেহেরবানি করে বলুন।" ননীর কথায় চপলতা বা ঠাট্টাতামাশার সুর একেবারেই নেই যেন!

খাঁ সাহেব তেমনি নির্বিকার স্বরে বল্‌লেন, "খোদাই জানেন খোদার মর্জি আর আপনার নসিবের নতিজা (শেষ ফল)! আমি কী জানি কী হবে!" ননী একেবারেই নির্বাক্‌ হয়ে যায়। ননীর একটা দুর্বলতা ছিল; কাউকে সাধক মনে করে ফেল্‌লে তার কথার জোর কমে যেত; শুন্‌বার আগ্রহটাই প্রবল হ'ত। আমি থাকতে পারলাম না চুপ করে।

খাঁ সাহেবকে বল্‌লাম, "আপনি হয় ত মহারাজ নাটোরের নাম শুনে থাকবেন। বাংলা মুলুকের পুরানা শাহী শরীফ্‌ ঔর সিল্‌সিলা (রাজগৌরব ও বংশপরম্পরা) চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এখনকার মহারাজ নাটোর আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর অনুরোধ করেছেন, আগামী কালের সন্ধ্যায় আপনি তাঁর ভবনে তশ্‌রিফ্‌ নিয়ে যান; আর, কিছু সুর আর রাগের শকল্‌ (রূপ) জাহির করে খুশী ঔর ইনায়েত্‌কি খুশ্‌বু ডাল দেঁ (আনন্দ আর পরস্পর প্রীতির সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেন)। মেহেরবানি করে বলুন, আপনার সুবিধে হবে কি না। আপনার রাজীর কথা শুনে তবে আমরা খবর দেব আর প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

আমার মুখের প্রস্তাব শুনে খাঁ সাহেব আদাব জানাতে জানাতে বল্‌লেন, "বহুত্‌ খুশিকি বাত্‌! মগর আপকো বড়ি তক্‌লিফ্‌ হুয়ি হোগি, মেরে খুশিকে লিয়ে"; বলে চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম; কিছু বলতে বা করতে সাহস হ'ল না। কারণ, দেখি—তিনি উপরে নজর করে কি একরকম মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন! একটু পরেই উৎফুল্ল নয়নে ননী আর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "খোদা আপনাদের ভাল করবেন। আর আমি তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছি, আপনাদের হৃদয় যেন এরকম লুত্‌ফ্‌ (আনন্দ) আর সখাওত (সৌজন্য) দিয়ে ভরা

থাকে।” তাঁর হৃদয়ে কি ব্যাপার হচ্ছিল, আমি জানিনে। কিন্তু তাঁর হাত দু'খানি অনুভবে মনে হয়েছিল সুখোষ্ণ আর কোমলস্পর্শ। আমাদের হৃদয় সর্বদার জন্য আনন্দ আর সৌজন্য দিয়ে ভরে যায়নি; দুঃখ, দৈন্য, হিংসায় মলিন হয়েছে কখন কখনও। কিন্তু একথা বলতে পারি, তাঁর প্রার্থনা আর আশীর্বচন আমাদের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি।

খাঁ সাহেবকে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি বসলে জিজ্ঞাসা করলাম, “তা হ'লে আপনি রাজি আছেন, এ সংবাদ পাঠিয়ে দিতে পারি?” তিনি বললেন, “জরুর, বেশক্ আপ্ ইস্ বাতকো খবর ভেজ্ দিজিয়ে। ময়্ তৈয়ার রহুঙ্গা ঔর আপকা ইন্তিজার (প্রতীক্ষা) করুঙ্গা। মগর” ; তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না ননী। ননী তাঁকে বল্‌ল, আগামী কাল এরকম সময়ে আমার এই ভাই আপনার কাছে আসবেন, এখানেই আসবেন, আর আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রাজভবনে।

ননীর কথা শুনে খাঁ সাহেব তাকে বল্‌লেন, “বহুত্ মেহর্বানি হ্যায় আপকি। অব্ দেখিয়ে ডাক্‌টর সাব্! আপ্ নসিবকা জিক্‌র করতে থে; খোদা উস্ বাতকো মন্‌জুর কর রখ্‌খা হ্যায়, ন-মালুম কবসে! খএর্, আপ্ তো জল্‌সেমে তশ্‌রিফ্ লায়েঙ্গে?” ননী একরকমের হাত ঘুরিয়ে বলে, “অজী! হামারা জিক্‌র্‌কা জিক্‌র্ ছোড় দিজিয়ে, খাঁ সাব্! হাম্ ত বিল্‌কুল না-লায়েক হ্যাঁয় ঔর আপ্‌কে অধিন্ হ্যাঁয়। আপ্ বুজুর্‌গ্ হ্যাঁয়, আপকা মুহসে যো বাত্ নিক্‌লেগি উসি বাত্ কায়েম্ হো যায়গি! জী হাঁ, জলসেমে ম্যায় জরুর হাজির রহুঙ্গা।” ননী আর আমি প্রায় একসঙ্গেই বল্‌লাম যে, ওস্তাদ্ বিশ্বনাথ রাওজীও থাকবেন; কুমার বাহাদুর ত বিশ্বনাথজীর শাগিরদ্। আরও সব কদরদান সমঝ্‌দারেরা থাকবেন আশা করছি।

খাঁ সাহেব তম্বুরা আর সঙ্গতীর প্রসঙ্গ করতে তাঁকে ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করলাম আমি; বল্‌লাম, কম্ সে কম্ দো তম্বুরা মজুদ্ রয়েছে আপনার জন্য আর স্বয়ং বিশ্বনাথজী সঙ্গতীয়া নিয়েআসবেন। খাঁ সাহেব খুব খুশী; করিমকে বললেন, এই বাবুসাব আজ সকালে আমার সঙ্গে বাসায় গিয়েছিলেন। খাঁ সাহেবের কথা শুনে করিম খুব আশ্চর্য হয়ে যায়, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আমি করিমকে বল্‌লাম যে, আমি আর আমার অন্য এক ভাই খাঁ সাহেবের দরসন্ পেয়েছিলাম আজই সকালে।

এমন সময়ে ননী খাঁ সাহেবকে বল্‌ল, "বিশ্বনাথজীর মুখে আপনার বীণ্ বাজনার প্রশংসা শুনেছি। যদি মেহেরবানি হয় ত আপনার বীণ্‌টাও সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হয় না কি?" বুঝলাম, ননীও খাঁ সাহেবের চরিত্রগত ব্যাপারে পরীক্ষা করতে চায়! খাঁ সাহেব কিন্তু সপ্রতিভ হয়েই বল্‌লেন যে, তাঁর বীণাটি এখানে নেই, লাহোরে ছেড়ে এসেছেন! সেই এক কথা! হাজার হ'ক, খাঁ সাহেব ভদ্রলোক! লাহোর ছাড়া অন্য কোনও স্থানের নাম করলেন না তিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, তিনি যথার্থই বীণ্ বাজাতেন, কোনও কালে।

ননীর কথার হাওয়া পালটে দেওয়ার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করলাম খাঁ সাহেবকে—"আপনি কি এখন ডেরায় ফিরবেন? না কি, অন্য কোথাও যাবেন?"

খাঁ সাহেব জানালেন, তিনি ডেরায় যাবেন না, এখনি একজন লোক আসবে, তার সঙ্গে যাবেন মেছুয়াবাজারে। বল্‌তে বল্‌তেই একজন লোক এসে সেলাম করে দাঁড়াল! তখনই আমার মনে হ'ল, ভাগ্যে ননী আর আমি ফলওয়ালাদের দোকানে এসেছিলাম, না হ'লে আজ খাঁ সাহেবের দেখাই পেতাম না, এবং খাঁ সাহেব আমার আসার ভরসা না করেই ডেরা থেকে বার হয়ে পড়েছিলেন! কেন তিনি মেছুয়াবাজারে যাবেন বুঝলাম না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করাটাও উচিত মনে করিনি।

খাঁ সাহেব আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন, এমন সময়ে ননী আর একটি সিগারেট বার করে খাঁ সাহেবকে ভক্তি করে। আমরা দাঁড়িয়ে উঠে আদাব জানাই; খাঁ সাহেব চলে গেলেন। ননী বলে, ভাগ্য আমরা ট্রাম থেকে নেমেছিলাম।

ননী তখন বাদাম পেস্তা আখরোট কেনার দিকে মন দিল। করিম ছিল আমার কাছে। করিমকে খাঁ সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে খুব শ্রদ্ধার সুরে আমাকে কিছু বৃত্তান্ত বলে গেল; মোট কথা—খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে পাঞ্জাবে। খাঁ সাহেবকে আপন বাপ-দাদার মত ভক্তি করে সে। খাঁ সাহেব পীর-বুজুর্গ্ রকমের লোক, খুব অদ্ভুত লোক, দুনিয়ায় কিছু পর্‌বা করেন না। যাঁর বাড়ীতে আছেন, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন না; মাসের মধ্যে প্রায় কুড়ি দিন এখানে পাশের হোটেল থেকে আনিয়ে নেওয়া রুটিতরকারি আহার করেন। এই দোকানের মালিক অর্থাৎ করিমের মুরুব্বিই সে খরচ বহন করেন এবং সে বিষয়ে তদারক করেন।

বলতে বলতেই করিমের ডাক পড়ে, করিম দোকানের মধ্যে চলে যায়। একটু পরেই দোকানের মালিক, করিম আর ননী এসে দাঁড়ায় বাইরে যেখানে আমি বসে। ননীর হাতে বেশ বড় একটা মালের পুট্‌লি, মালিকের হাতে ঐ রকম আর একটা পুটুলি। মালিক সাহেব ঐ পুটুলিটা আমার হাতে দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, এ উপহার আমাকে নিতেই হবে; যৎসামান্য নজ্‌রানা এটা আজকের আনন্দের দিনে। আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করতেই মালিক আর করিম অত্যন্ত সরল ভাষায় বলল যে, আমি যদি খাঁ সাহেবকে কচুরি-জিলেবীর নাস্তা করাতে পারি ত এঁরা আমাকে সামান্য মেওয়াও কি খাওয়াতে পারেন না! আমি একেবারেই নির্বাক্‌ হয়ে গেলাম তখন। তাঁদের মনোভাবের সম্মান করার মত কথা খুজে পাইনি! আমি যদি সেই পাহাড় অঞ্চলের সরল ভাষা জানতাম, আর তাদের মত সরল হৃদয়ে ব্যাপারটা বুঝতাম, তা হ'লে বোধ হয় কিছু ধন্যবাদ বা আর কিছু কথা বলতে পারতাম। আমি সভ্য শিক্ষিত জগতের লোক। আমার তরুণ প্রাণ যত বা অস্থির চঞ্চল, আমার মন তত বা সন্দেহকাতর; আর হৃদয়ের মধ্যে স্থায়ী বিশ্বাস বলতে কোনও কিছু দেখা দেয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তের একটা সৌন্দর্য অনুভব করেছিলাম আর বুঝেছিলাম, লৌকিকতার কৃত্রিম উত্তর দিয়ে আমার নিজ হৃদয়কে কলুষিত করব না।

ননীর পক্ষে সরাসরি রাজবাড়ী যাওয়া সম্ভব হ'ল না। আমরা দু'জন যখন বাসায় ফিরছি, তখন ননী ও আমার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ননী বলে, খাঁ সাহেব একজন প্রচ্ছন্ন সাধক; আমি বলি, খাঁ সাহেব একজন সরল আর গোটা মানুষ। ননী মানুষের মধ্যে সাধক খুঁজে বার করার চেষ্টা করে; আমি খুঁজি মানুষের মধ্যে যেটা আসল, তাজা মানুষ। অনেক তর্কের পর তবে আমাদের মধ্যে সাময়িক রফা হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাধক বলে ননী যাকে শ্রদ্ধা করছে—সেইটেই হল মানুষের মধ্যে আসল মানুষটি, যাকে আমি চিনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এক কথায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আসল মানুষটি প্রচ্ছন্ন সাধক; আর বাইরের নকল মানুষটি হ'ল সমাজের ছাপ দেওয়া একটি জড় ও চৈতন্যের পিণ্ড।

পরের দিন সন্ধ্যার একটু পরেই করিমের দোকানে খাঁ সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি তাঁর বাসায় গিয়ে বেশ পরিবর্তন করবেন। করিম ও আমি

চললাম তাঁর সঙ্গে। করিমের হাতে একটি লণ্ঠন। যেতে যেতে সে বলল, প্রায় প্রতি রাত্রিতেই খাঁ সাহেবকে সে পৌঁছিয়ে দেয় তাঁর ডেরায় লণ্ঠন নিয়ে। বুঝলাম, করিমই তাঁর যথার্থ সেবক।

সেই উপরের ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখি, তক্তাপোশটি গায়েব্! তার স্থানে রয়েছে দড়ির জাল্‌তি দেওয়া একটি খাটিয়া। আমাদের আরাম করতে বলে খাঁ সাহেব পাশের ঘরের দরজা খুলে ফেললেন; লণ্ঠন হাতে করে ঢুকলেন সেই ঘরে। এই অবসরে করিমকে জিজ্ঞাসা করি, সেই তক্তাপোশের কথা। করিম বলল, খাঁ সাহেব সেটাকে আজ সকালে না-মন্‌জুর করে বিদায় দিয়েছেন; কারণ, সেটা সব সময়ে বদ্-আওয়াজ করে ভদ্রলোকদের বিরক্ত করে।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "বাবুসাব্, জেরা দেখিয়ে ত ইস্ চিজ্‌কো।" আমরা দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই খাঁ সাহেব আস্‌মানি রংএর একটা লম্বা কুরতা হাতে করে নিয়ে এসে হাজির; করিমকে বল্‌লেন লণ্ঠনটা তুলে ধরতে। লণ্ঠনের আলোয় পরীক্ষা করে দেখতেই হ'ল সে জিনিষটা; খাঁ সাহেব ছাড়বেন না যে! রেশমের বুনানির উপর ছোট ছোট তারাগুচ্ছের জরীদার নক্‌সা; দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়, তবে পুরান বলে মনে হ'ল। খাঁ সাহেব আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন দেখে বল্‌লাম, "বড়ি বারিক্ (নরম) ঔর্ বেহ্‌তর্ (উৎকৃষ্ট) চিজ্ ইয়ে কুর্‌তা আপ্‌কে! মালুম হোতা যৈসেকে সিতারেঁাসে (নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে) রোশ্-নিকি টুক্‌রিয়েঁ কুদ্ পড়্ রহি হ্যাঁয়! আহঃ হ!" খাঁ সাহেব প্রসন্নমুখে আবার চলে যান সেই ঘরের মধ্যে, লণ্ঠন আর কুরতাটি নিয়ে।

এবার একেবারে পাক্‌কা দরবারী বেশে খাঁ সাহেব বেরিয়ে এলেন; মুখে সংযত আনন্দের ভাব; মাঝে মাঝে গোঁফ জোড়া চুম্‌রে কায়দা করে নিচ্ছেন তিনি। বুকের বুটিদার বোতামগুলি টাইট হয়েছে বলেই নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ির একটু উন্নত আভাস ছিল; তবে বেমানান হয়নি, কারণ, মাথায় বৃহদাকার মুরেঠার সুষ্ঠু কুণ্ডলীবন্ধ দিয়ে উপর নীচে পাষাণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা বেখাপ্‌পা জিনিষ নজরে এল। দেখি, সেই রেশ্‌মী তারা-কাটা জামার বাহার নষ্ট করে দিয়েছে গলায় ঝুলান একটি লাল ফিতার ঘের, আর তার শেষে একখানি সবুজ পাথরের চাকতি, যার উপর সোণার জলে খোদাই-করা আরবি হরফে কি সব লেখা রয়েছে।

এ ত ফিরোজ পাথরের চাকৃতি! দেখেই মনে পড়ে গেল আমার মায়ের কথা। পূর্বে আমরা গয়াতে থাকার সময়ে মা মাঝে মাঝে মানসিক এক রকমের উদ্বেগে কাতর হয়ে পড়তেন, যাকে আজকাল 'নিউরোসিস্' বলেন, চিকিৎসকেরা। আমার পিতৃদেবের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধু আমার মায়ের রোগের প্রতিকারকল্পে ঐ রকম একখানি ফিরোজ্ পাথরের চাকৃতি আনিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হ'ক, 'ফিরোজ্' শব্দ আর তার অর্থ 'বিজয়' এটা জেনেছিলাম তখন। খাঁ সাহেবের গলায় ঝুলান পাথরখানি আমার চোখে ভাল লাগেনি। তাঁকে বল্লাম, ফিরোজ পাথরের যাদুমন্ত্রগুলি কুর-তার ভিতরে কলেজার কাছে রাখলে খুব ভাল হয়; আর ফিরোজ! সে ত আপনার গলার সুরে দম্ পর্ দম্ বার হয়ে আসবে মাইফেলের মধ্যে! খাঁ সাহেব আমার পরামর্শের সম্মান করে আমাকেই বললেন, বোতাম খুলে যাদু-পাথরখানি ভিতরে চালিয়ে দিতে। বুটিদার বোতাম খুলি, সেই ফিতা আর চাকৃতিখানি ভিতরে চালিয়ে দেই, আর বেশ পরিশ্রম করে বোতামগুলি এঁটে দেই, আবার। হাঁফ ছেড়ে দু'কদম পাছু হটে খাঁ সাহেবের দিকে তাকাই। তাঁর মাথায় রক্তজবা রংএর মুরেঠা খুব দুরস্ত সওয়ার হয়েছে বটে; যেমন সুন্দর তার ঢং, তেমনি সুন্দর তার পরিপাটি। বললাম, আপনার লাল মুরেঠা যেন মালকৌস্ রাগের মধ্যমের মতো জগ্‌মগ্ করেছে, লা-জওয়াব্! খাঁ সাহেব এবার মুখ খুলে হেসেই ফেল্লেন! তাঁর মুখে ঐ একবারই হাসির আওয়াজ শুনেছিলাম! আওয়াজ্‌টা ভাল লাগেনি আমার। মনে পড়ে গেল গ্রীক-দেশীয় বুদ্ধিমন্তের প্রবাদবাক্য 'Laugh if you are wise' অর্থাৎ— বোকাদের দাঁত বেরিয়েই আছে, যখন তখন হেসে ওঠে তারা; আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হাসবার আগে বুদ্ধি খাটিয়ে দেখেন যে, হাসার কারণ উপস্থিত হয়েছে কি না; বুঝেসুঝে হাসেন বুদ্ধিমন্ত।

করিম সপ্রশংস নেত্রে খাঁ সাহেবের পোষাকের দিকে চেয়ে আছে। খাঁ সাহেব আমাকে বললেন, এই করিম ছোকরা বড় তমিজ্‌দার (শিষ্ট) আর হোশিয়ার, এর উপর আল্লার নেক নজর আছে। করিমের সুখ্যাতি শুনে আমার হিংসা হয়েছিল। খাঁ সাহেবকে বল্লাম, আমি যে এত করে আপনার পোষাকের তারিফ করলাম, তবু আমার জন্য ত কিছু মুবারক্ (ভালাইয়ের কথা) বললেন না আপনি।

খাঁ সাহেব বিশদ নয়নে চাইলেন আমার দিকে; কাছে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে কী যেন অস্ফুট শব্দ করে আমার মাথার উপর তিন বার ফুঁ দিলেন! আর বললেন, "কোনও ভয় নেই, কিছু পরবা করবেন না, আল্লা আপনার ভালই করবেন, মনে রাখবেন।" কেন তিনি এরকম কথা বললেন বুঝতে পারিনি; কারণ, ভয় বা পরবা করতাম না কিছুর। তবে, পরে ভেবে ঠিক করেছিলাম যে, যৌবন বয়স আমার; গানে ও সুরে উন্মত্ত আমি; প্রায় অবাধ আমার গতি; বিপদাপদ্ দেখা দিতে কতক্ষণ! হয় ত খাঁ সাহেব ভেবেছিলেন, আমার জন্য একটা রক্ষামন্ত্র বা প্রার্থনার কবচের প্রয়োজন আছে বা হতে পারে।

ট্যাক্সি ধরে নিয়ে খাঁ সাহেব আর আমি চলেছি রাজভবনে। খাঁ সাহেব চুপ করে বসে আছেন। এমন সময় মনে করলাম, তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে দিন ট্রামে বসে তিনি আমাকে চৌধুরাণের জলসার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেন, কী ভেবে তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করলাম এখন।

সর্বনাশ! প্রশ্ন শুনেই মনে হল, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন; কারণ, তিনি হঠাৎ আওয়াজ্ করে উঠলেন, "লাহল্ওয়েলা কুবত্" আর কিছু বিড়বিড় করতে করতে এক রকমের গা-ঝাড়া দিয়ে ভাল করে বসলেন সিটের উপর। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েছি; ভাবলাম—অপরাধটা কোথায় হল! তিনি নিজেই ত ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে। যাক্, চুপ করেই থাকি। কিন্তু মন চঞ্চল আমার। সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তাঁর ডান হাঁটুর উপর ডান হাতের আঙ্গুলে একটি তস্‌বির মালা ঘুরছে; যে রকম মালা দিয়ে মুসলমান সাধকেরা জপের কাজ সারেন। হরি বোল হরি! তিনি যে মালায় আছেন, আগে বললেই ত চুকে যেত, আমি তাঁর জপে বিঘ্ন করতাম না! চুপটি করে বসে থাকি আর ননীর কথা ভাবি। ননী ত নেহাৎ বাজে কথা বলেনি; কিন্তু বুঝল কেমন করে! ননীই বা কোন্ মানুষটিকে দেখল আর বুঝল; আমিই বা কোন্ মানুষটিকে দেখছি, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনে! যাই হোক, মানুষ দু'টি নয়; মানুষ একই।

এল্‌গিন রোডে; যখন গাড়ী ঘুরছে, তখন খাঁ সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, জপমালা অদৃশ্য হয়েছে, তাঁর পকেটের মধ্যে

নিশ্চয়ই। তবুও কথা বলতে সাহস হ'ল না আমার। দেখি, খাঁ সাহেব তাঁর বুকের কাছে অলক্ষ্য ফিরোজ পাথরের চাকতির উপর হাত বুলিয়ে নিচ্ছেন! অথচ ইনিই আমার মাথায় ফুঁ দিয়ে কৃপা করে অভয় দিয়েছিলেন; এমন সময়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন, আমি গণেশীলাল চোবেজীর তারিফ অর্থাৎ নাম-ধাম গুণপনার কথা শুনেছি কি না। আমি ঐ নামটি জীবনে প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। বললাম, না—আমি শুনিনি। তিনি তখন নিজে থেকেই সেই গণেশীলাল চোবেজীর বিষয়ে এমন কিছু তারিফ করে গেলেন, যা থেকে বুঝলাম, সেই চোবেজী একজন সঙ্গীতসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক; শুধু তাই নয়, তিনি একজন ইলম্‌দার বুজুর্‌গ্‌ শ্রেণীর লোকও বটে! তিনিই খাঁ সাহেবকে বলেছিলেন যে, তুনিয়াতে শয়তানের বান্দা-বান্দীদের প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ফিরোজ পাথরে লেখা যাতুমন্ত্র ধারণ করাই উচিত। খাঁ সাহেবের কথা শুনে মনে হ'ল, যেন বালকের মত সরল বিশ্বাসের প্রবণতা ভরে আছে খাঁ সাহেবের হৃদয়। আর বলিহারি এই ফিরোজ পাথর! মুসলমান এটাকে এনে দেয় হিন্দুর কল্যাণের উদ্দেশে, আর হিন্দু সাধক পরামর্শ দেয় মুসলমানকে এই সবুজ পাথরের চাকৃতি ধারণ করতে! পরে জেনেছিলাম, তুরস্ক আর এশিয়া মাইনরই না কি এর জন্মস্থান, মিশর এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, পয়গম্বর মহম্মদের বহু পূর্ব থেকে বেদের দল এই চাকৃতির গুণাগুণ প্রচার করে এসেছে। আজব দেশ এই ভারত, আর তার সর্বলোলুপ মনোভূমি!

রাজভবনে কুমারের তরফে উত্তর দিকের গাড়ীবারান্দায় নেমেছি আমরা। একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তু'জন কৃপাণধারী রক্ষী পুরুষের অভ্যর্থনা স্বীকার করে সুসজ্জিত অলিন্দ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানে পাই নীরব সমাদর। তুয়ারের তু'দিকে তু'টি দীর্ঘাকার যোদ্ধবর্ম এমন ভাবে খাড়া করে সাজান রয়েছে, যেন জীবন্ত সৈনিকযুগল পাহারা দিচ্ছে। তা ছাড়া কয়েকটি নির্জীব জন্তুও সজ্জিত রয়েছে, সজীবের ভঙ্গিতে। খাঁ সাহেব এদের আমলই দিলেন না। কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠি আমরা। খাঁ সাহেবের পরিশ্রম হয়েছে বলে মনে হ'ল না, যদিও তাঁর হাতে লাঠি নেই। তিনি জাহাজী সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন। তাঁর জীবন কাষ্ঠ-কঠিন আরোহ-

অবরোহে অভ্যস্ত ; এটা ত তাঁর পক্ষে কুসুমকোমল সংকার ; সুরশৃঙ্গারের সুচিক্কণ বক্ষে সুরের আস্তরণ! উপরে সিঁড়ির শেষে বারান্দার আরম্ভে দু'টি মর্মরময়ী কিশোরীমূর্তি বিজলীর প্রদীপ হাতে নিয়ে অতিথিদের বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছে! এর পরেই চোখে পড়ে সেই হাতীর দাঁতের বড় খণ্ডটি ; অদ্ভুত, বৃহদাকার, অথচ নিরতিশয় শোভন রূপ হয়েছে তার, রূপালি বলয়ের বহু বিচিত্র বেষ্টনীচর্যা দিয়ে। সঙ্গীতনিকুঞ্জে অর্থাৎ আসর-ঘরে যেতে প্রবেশপথে নানারকমের শিল্পসজ্জার মধ্যে এতই সমঞ্জস পরিবেশন ছিল এই কারু-পদার্থটির যে, সমাগত দর্শকের চক্ষুর পীড়া ঘটায় না। অথচ এর রূপটি চোখে পড়া মাত্র বিস্ময়ে মতি স্তব্ধ হয় ; অজ্ঞাতসারে গতিও মন্থর হয়ে যায়, এমন কি, স্থিরও হয়ে যায়। কিন্তু খাঁ সাহেবের মতি বা গতি কিছুই ব্যাহত হ'ল না, সেই সুন্দরীযুগলের নির্নিমেষ আমন্ত্রণে অথবা গজদন্তের বিচিত্র শোভা-সম্পদে।

নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারেই আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম একটি বুদ্ধমূর্তির প্রতি নির্বাক্ শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। সম্যক্ নির্বিরোধ প্রশান্তিই যেন ঘনীভূত হয়ে আছে সেই সৌম্য প্রতিমূর্তির রূপে। কতো বার চেয়েছি এই মূর্তির দিকে, কিছু ইঙ্গিত, কোনও সঙ্কেতের প্রতীক্ষায়। আশাভঙ্গ হয়নি আমার। নির্মল অনুদ্ধত মনোভাবের পটভূমিকায় আমাদের জীবনরেখার শান্ত দীপ্ত প্রতিভাস সম্ভব হ'ক, জীবন-সঙ্গীতের পবিত্র উল্লাস দিয়েই আমাদের তরুণ হৃদয় স্পন্দিত হ'ক, আনন্দের পরিশেষ মুহূর্তগুলি যেন পুনরায় শান্তির কোলেই সার্থক পর্যবসিত হ'ক,—মাত্র এরকমের কিছু অস্ফুট বাণী মাঝে মাঝে যেন শুনেছি বুদ্ধমূর্তির সেই নিস্পন্দ ওষ্ঠযুগলের ইঙ্গিতে। এ থেকে গূঢ়তর কিছুর আভাস পাইনি আমি। সুরের কুসুমবাণ দিয়ে অনুবিদ্ধ আমার হৃদয়ের তরুণ গ্রন্থিগুলি ; এদের উচ্ছেদ করে নির্বাণের কল্পনা করাই যে আমার পক্ষে প্রাণান্তকর !

খাঁ সাহেব সেই বুদ্ধমূর্তির দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। খাঁ সাহেবের মন কি লোহা, হাতীর দাঁত বা মার্বেল পাথরের চেয়েও কঠিন, দুর্ভেদ্য ? তাও ত নয় ; আমি তাঁকে যেমন দেখেছি আর বুঝেছি।

* * *

আসরে খাঁ সাহেবের আগমনেই উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার

জানালেন, অভিবাদন করলেন ব্রজেন্দ্রবাবু ও নগেন্দ্রবাবু (ভবানীপুরনিবাসী সুকণ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ও সুরসিক পুরুষ)। খাঁ সাহেব মৃদু গম্ভীর স্বরে আদাব জানাতে থাকেন। তখনও বিশ্বনাথজী আসেননি। আসরের একদিকে দু'টি সুন্দর তম্বুরা প্রস্তুত ও শায়িত রয়েছে। পাশেই রয়েছে তবলার যোড়ী আর স্থিরস্বরা একটি বক্স হারমোনিয়ম্। স্থিরস্বরাই বটে! হারমোনিয়মের স্থিরস্বর না হ'লে তম্বুরা বাঁধার সুবিধা হয় না, কণ্ঠে স্কেল ঠিক করা সুবিধা হয় না, প্রাথমিক গীতনবিশের কণ্ঠে সুর অভ্যাস করার সুবিধা হয় না। বিশ্বনাথজী এ যন্ত্রটিকে ত্যাজ্য বা অপাঙ্ক্তেয় মনে করতেন না। তখনকার দিনে গণপত রাও সাহেব, শ্যামলালজী, সোহ্নীজী, বশীর খাঁ, জনাব মির্জাসাহেব ও জঙ্গীর যাদুভরা অঙ্গুলিক্ষেপণে হারমোনিয়ম্ যন্ত্রের হৃদয় থেকেই যেন সুরের বন্যা বয়ে আসত। ঐ সকল গুণীরা হারমোনিয়মের স্থির অনাড়ম্বর স্বরলহরী দিয়েই রচনা করতেন সুত্ ও মীড়ের ইন্দ্রজাল; যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, এই আশ্চর্য ব্যাপার তাঁরাই বুঝেছেন, অন্যের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্প্রতি এই যন্ত্রটি অপাঙ্ক্তেয় হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমরা আশা করিনি যে, সোহ্নী-শ্যামলালজীর দল দেহ ধারণ ক'রে অজর অমর হয়ে থাকবেন। তাঁরা কীর্তিতে অমর হয়ে থাকবেন; কীর্তিলেখার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে হার্মোনিয়ম্ এবং তার সম্ভাবনা।

আসরের আলোকশোভার উজ্জ্বলতায় আমাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ছিল খাঁ সাহেবের লাল পাগড়ীর জৌলুশের দিকে। ইতিপূর্বে আসরে কুকভ খাঁ (ওস্তাদ কেরামত উল্লা খাঁ সাহেবের ছোট ভাই, যিনি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কলকাতায় নাম কিনে নিয়েছিলেন), চন্দনচোবেজী আর মৌজুদ্দিন খাঁ সাহেবও পাগড়ী পরে' অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এমন জম্‌কালো লাল পাগড়ী আমরা আর দেখিনি।

আমি কুমারের কাছে চলে গিয়ে খবর বলতেই তিনি বললেন, মহারাজ হয় ত উপস্থিত থাকতে পারবেন না; বিশেষ একটি সভায় আহূত হয়েছেন তিনি। মহারাজ বলে গিয়েছেন, ওস্তাদজী অর্থাৎ বিশ্বনাথজী এলে যেন গান আরম্ভ করিয়ে দেওয়া হয়, মহারাজের প্রতীক্ষা যেন না করেন বিশ্বনাথজী। কুমার আমাকে অনুরোধ করলেন যে, আসরে বিশ্বনাথজী এলেই

কুমারকে যেন সংবাদ দেই আর খাঁ সাহেবকে পান-এলাইচ প্রভৃতি দিয়ে খাতির করার কাজটা যেন আমি তদারক করি; ততক্ষণ কুমার বেশ-পরিবর্তন করবেন।

আসরে ফিরে গিয়ে বসি। সামনেই বড় রুপার থালায় পান-এলাইচ প্রভৃতি রয়েছে, খুদে হাওয়া-গাড়ীর মত ঘুরঘুরে চাকা-লাগান একটি আধারে ভাল সিগারেট সরঞ্জামও রয়েছে। খাঁ সাহেব পান নিলেন না, মাত্র সিগারেটে মনোনিবেশ করলেন।

ওস্তাদ বিশ্বনাথজী এসেছেন; সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছেন; ইনিই সঙ্গত্ করবেন। ওস্তাদে ওস্তাদে দাঁড়িয়ে প্রীতিসম্ভাষণ হয়, আর আমরা উঠে দাঁড়াই ততক্ষণ। বিশ্বনাথজীকে বল্‌লাম, তিনি এলেই কুমারকে খবর দেওয়ার কথা আছে; আমি খবরটা দেইগে? বিশ্বনাথজী কী যেন ভেবে বললেন, একটু সবুর করতে; আর খাঁ সাহেবকে টেনে নিয়ে গেলেন জানলার ধারে একটু আড়ালে। সেখানে তাঁদের মধ্যে কিছু কথা হ'লে ফিরে এসে আসরে বসলেন তাঁরা; তখন বিশ্বনাথজী বললেন,—চলুন, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে একটু কথা আছে।

বিশ্বনাথজীর সাক্ষাৎ হতেই কুমার পদধূলি নিলেন গুরুদেবের। বিশ্বনাথজী বললেন, খাঁ সাহেবকে আগে খাওয়াতে হবে, না হ'লে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন! তৎক্ষণাৎ হুকুম হয়ে গেল, খাঁ সাহেবের আহারের আয়োজন করতে। আমার মনে পড়ে গেল, মৌজুদ্দিনের 'তৈয়ারী' হওয়ার কথা। এমন সময়ে ননী এসে উপস্থিত। কুমার বিশ্বনাথজীকে মহারাজের অনুপস্থিতির কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। বিশ্বনাথজী অল্প কথা বলতেন, আর কাজের কথা আগেই সেরে রাখতেন; বললেন, খাঁ সাহেবকে খাইয়ে দাইয়েই গান আরম্ভ করিয়ে দেওয়া যাবে; কি বলেন, কুমার বাহাদুর? কুমার বললেন, আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

খাঁ সাহেবের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত থেকে তদারক করার ভার পড়ল ননীর উপর।

* * *

যখন অন্দরমহল থেকে ঘুরে এলাম, তখন খাঁ সাহেব জলযোগ সেরে আসরে গিয়েছেন। ননীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, খাঁ সাহেবের জলযোগের কথা। সে বলল, খাঁ সাহেবের পাতে চারখানি করে পাঁচ বারে কুড়িখানা লুচি পড়েছে, তবে চব্বিশ পর্যন্ত যায়নি ; তার উপর তরকারী মাছ মাংস দই রাবড়িও ছিল, খাঁ সাহেব অমান্য করেননি কোনও কিছুর। আমি বললাম, "কি সর্বনাশ!" অর্থাৎ ভবিষ্য গানের কথা ভেবে! ননী আমার কথা বুঝতে না পেরে বলল, সাধকদের পক্ষে এ আর কি এমন কথা! কলসী কলসী দুধ-মালাই বা মদ বা শ' ছিলিম গাঁজা ত তাঁরা গণ্ডূষ করে শুষে নিতে পারেন ; আবার সাত-আট দিন নিরম্বু উপবাসও দিতে পারেন তাঁরা। আমি বললাম,—বাঁচলাম! ভাগ্যে সাধকদের ওরকমের ব্যালেন্স আছে আহারে আর উপবাসে, তাই ভারতের গৃহস্থেরা এখনও বেঁচে আছে! ননী বলল, তুমি একটা নাস্তিক, তুমি এসব রহস্য বুঝবে না।

বিশ্বনাথজী ও কুমার আসরে আসন গ্রহণ করেছেন ; প্রাথমিক শিষ্টাচার সব কিছু সম্পন্ন হয়েছে ; মাইফেল সরগরম হয়েছে। বিশ্বনাথজীই মাইফেলের কর্তা, তিনিই খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করলেন যে, অন্য কিছু অসুবিধা না থাকলে খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করুন। খাঁ সাহেব বিনীত স্বরে বললেন, রাওজি! আপনি ধ্রুপদের বাদ্‌শাহ ; আপনি প্রথমে একখানা ধ্রুপদ গাইবেন না কি? বিশ্বনাথজী খাঁ সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন, এই মাইফেল খাঁ সাহেবেরই মাইফেল, আর কারুর নয় ; আর মহারাজ বাহাদুর ঐরকম বন্দোবস্তই হুকুম দিয়ে রেখেছেন। অতএব খাঁ সাহেবই অনুগ্রহ করে তম্বুরা গ্রহণ করুন।

খাঁ সাহেব একটি তম্বুরা হাতে নিয়েছেন, এমন সময়ে টুং টাং শব্দে সুপরিস্ফুট ধ্বনি করে বাজতে থাকে কয়েকটি বড় ক্লক্ ঘড়ি, ষড়্‌জ গান্ধার পঞ্চম নিষাদের সুরে ; এ-ঘরে সে-ঘরে সিঁড়ির উপর থেকে, নীচে থেকে। সেই ধ্বনি আর অনুরণনগুলি খাঁ সাহেবের সংবিদ্‌কে নাড়াচাড়া দিয়েছে, হৃদয় স্পর্শ করেছে ; তিনি ঈষৎ আবেশের ভাবে অল্প মাথা নাড়তে লাগলেন। বার বার তিন বার স্বরপরিক্রমা দিয়ে যেন আমাদের হৃদয়াকাশ বিধূনিত করে ঘড়িগুলি একসঙ্গে

এক সুরে পর পর ধ্বনি তুলে জানিয়ে দিল যে, রাত্রি ন'টা বাজল। ঘণ্টার এই সঙ্কেতশব্দগুলিও সুরে বাঁধা। আমরা এই সুরকেই মূল ষড়্জ মনে করে পূর্বের সুরসন্দোহকে 'স-গ-প-ন' বলে অনুভব করতে অভ্যস্ত ছিলাম। ঘণ্টাধ্বনির রেশ যখন মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন খাঁ সাহেব বিশ্বনাথজীর দিকে চেয়ে বললেন, "কি সুন্দর রসিলা সুর দিয়ে ঘড়ির আওয়াজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে! বাঃ বাঃ!" বলে তিনি রেশটি নিঃশেষে মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকেন। এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, অন্তত এই একটা জিনিস খাঁ সাহেবের মন হরণ করেছে। খাঁ সাহেব বোধ হয় শব্দতান্ত্রিক লোক ; শ্রব্য রূপের সৌন্দর্যই তাঁর কাছে অধিক মনোরম, দৃশ্য রূপের সৌন্দর্যের চেয়ে। চক্ষুষ্মান্ লোকদের মধ্যে তিনি অসাধারণ লোক, এমন মনে হয়েছে আমার।

খাঁ সাহেব একটি তম্বুরা হারমোনিয়মের সাহায্যে সুরে বেঁধে নিয়ে বিশ্বনাথজীকে সেটা দিলেন পরীক্ষা করতে ; ততক্ষণ অন্য তম্বুরাটিও বেঁধে নিলেন খাঁ সাহেব। লক্ষ্য করলাম, খরজের তারটি খাঁ সাহেব বাঁধলেন খাদের মধ্যমে, অথচ পঞ্চমের তারটি পঞ্চমেই বাঁধা হ'ল। দুই তম্বুরা যখন এক সুরে বাঁধা হয়ে গেল, তখন বিশ্বনাথজী তাঁর হাতের তম্বুরাটি ব্রজেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে স্বয়ং তবলা বেঁধে দিলেন তম্বুরার সুরে। সঙ্গীতনিকুঞ্জ ভরে উঠল তম্বুরার গুণ্ গুণ্ ধ্বনিতে।

আশ্চর্য যন্ত্র এই সরল সুরকণ্ঠাভরণ তম্বুরা ; অতুলনীয় এর চারটি তারের গাঢ় মধুর গুঞ্জনধ্বনি, যেন শতদল কমলের চারিদিকে সমাগত ভ্রমরবৃন্দের মিলনমুখর ঝঙ্কার! উন্মুখ শ্রোতার হৃৎপঙ্কজ যদি বিকশিত ও রাগোৎফুল্ল হয়ে ওঠে সেই চারটি তারের উপচ্ছন্দময় গুঞ্জনের প্রভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! কে এই যন্ত্রটি নির্মাণ করেছিলেন? তখন পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম, তুম্বরু নামে কোনও দিব্য গন্ধর্ব পুরুষ এই তুম্বুরু বীণা অর্থাৎ তম্বুরার উদ্ভাবক। বেশ একটা তৃপ্তিতে ছিলাম। কিন্তু ঐতিহাসিক চর্চা করতে গিয়ে তৃপ্তিটা একরকম নষ্টই হয়ে গেল। মহামুনি ভরতের প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, নারদীয় "সঙ্গীতমকরন্দ" গ্রন্থ, মতঙ্গপ্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থ, এবং শার্ঙ্গদেবরচিত "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থে (খৃঃ ১২৪৭) সর্বসাকল্যে নানারকম বীণার নাম উল্লেখ ও বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হ'লেও "তুম্বুরু বীণা" নাম পাইনি, চার তারের বীণাজাতীয় কোনও যন্ত্রের উল্লেখও পাইনি। ঐ সকল গ্রন্থে দু-তার, তিন-তার, পাঁচ-তার, সাত-তার,

ন'-তার, একুশ-তার, ছেষট্টি-তার, এমন কি, এক শ'-তারের বীণার উল্লেখ রয়েছে ; নেই কেবল এই চার-তারের তম্বুরা বা তুম্বুরু বীণার উল্লেখ ! কোনও কোনও অর্বাচীন শাস্ত্রকার নিজের উদ্ভাবিত বীণার নাম-রূপ প্রচারও করেছেন, অথচ তুম্বুরু গন্ধর্বের খাতির করলেন না ; এই বা কি রকম কথা ! প্রশ্ন হয়, তম্বুরা নামে এই চার-তারের যন্ত্রটি এল কোথা হতে ? আর, কবেই বা এসে উড়ে বসল ধ্রুপদখেয়াল-আলাপসঙ্গীতের কোল জুড়ে ? এর চরম উত্তর আজও পাইনি আমি। প্রাচীন সংস্কৃত শব্দকোষে তম্বুরা বা তানপুরা, তুম্বুরু বীণা বলে শব্দ পাওয়া যায় না। সোজা সরল কথা এই যে, তম্বুরা নামে যন্ত্রটি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের স্বীকৃত বা সম্মত নয়।

জার্মানী দেশের বৈজ্ঞানিকপ্রবর সঙ্গীতরসিক ডাক্তার হেল্ম্‌হোল্‌জের প্রণীত শব্দ-ধ্বনিবিষয়ক গ্রন্থ (অবশ্য ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় সংস্করণ, খৃঃ ১৮৯৫) পড়ে দেখি, তার ভাষ্য-টীকার মধ্যে তম্বুর নামে একটি আরবদেশীয় তারের যন্ত্রের প্রসঙ্গ রয়েছে। ক্রমে জানতে পারলাম, "তম্বুর"* শব্দটি আরবী অভিধানে পাওয়া যায় ; শব্দটি পারসি ও আরবী ভাষার শব্দ।

তবে কি ঐ যন্ত্রটি নাম-রূপ সম্বল করে আরব ধাউ (সমুদ্রগামী বড় বজ্‌রা) চড়ে আরব্য সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের উপকূলে অবতীর্ণ হয়েছিল !

* [মাত্র সাধারণ আলোচনার দিঙ্‌নির্ণয়কল্পে বলা যায়—(১) Cassel and Company Limited কর্তৃক প্রকাশিত The Encyclopaedic Dictionary (1889) গ্রন্থাবলীর প্রাসঙ্গিক বিভাগে তম্বুরা শব্দের উল্লেখ আছে ও উল্লেখকার বলেছেন—পারস্য, তুরস্ক, ইজিপ্ট ও হিন্দুস্থানে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং প্রাচীন আসারিয়া ও ইজিপ্ট দেশে এই একই যন্ত্র বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল ; (২) ডাঃ হেল্‌ম্‌হোল্‌জের গ্রন্থের (Sensation of Tone, 1895) পরিশিষ্ট অংশ খোরাসানী তম্বুর ও বাগ্‌দাদী তম্বুরের বিশিষ্ট উল্লেখ আছে ; (৩) রাজা সর্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রণীত Universal History of Music গ্রন্থে (খৃ ১৮৯৬ ? ১৮৯৪ ?) আরব, পারস্য, আসিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের এবং হিব্রু জাতির সঙ্গীত প্রসঙ্গে "তম্বুর" যন্ত্রের উল্লেখ আছে ; ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন (বিশেষ প্রমাণ উদ্ধৃত না করে) যে, তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব তুম্বুরু বীণার উদ্ভাবক, কিন্তু তিনি বলেন না যে, ঐ তুম্বুরু বীণা ও অধুনা প্রচলিত তুম্বুরা একই বস্তু। মুসলমান বাদশাহী যুগের সঙ্গীতের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে সকল যন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তম্বুর বা তানপুরা নাম নেই, চার তারের যন্ত্রও উল্লিখিত হয়নি। ইতি—লেখক।]

অসম্ভব কি। যদি তাই হয়, তা হ'লে সেই নৌকাগুলি জেহাদী (ধর্মযুদ্ধের) নৌকা ছিল না, নিশ্চয়! যে রকমের নৌকা করে ভারত থেকে সেতার যন্ত্র রপ্তানি হয়ে পারস্য প্রভৃতি দেশে পৌছুত, সেই রকমের নৌকায় আমদানী হয়ে থাকবে এই শান্তিময় তম্বুরা যন্ত্রটি। হয় ত ফকির দরবেশী বা ভবঘুরে শ্রেণীর লোকের হাতে চড়ে ঘুরতে ফিরতে এসে পড়েছিল এটা। সেই নৌকাগুলি হয় ত করাচীর ছিদ্রপথ সন্ধান না করে, মালাবার উপ-কূলের অরণ্যবেষ্টিত স্থানে ভিড়িয়ে যেত। "মিরাজ" নামে যে স্থানটি বহু-কাল থেকে তম্বুরা প্রস্তুতির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে সারা ভারতে, সেই "মিরাজ" ত পশ্চিমোপকূলেরই সন্নিকটে। মিরাজই হয় ত ছিল সে রকম পণ্যের প্রাথমিক গন্তব্য স্থান বা আমদানী মালের আখাড়া; কে বলতে পারে! সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রণেতারা যদি ম্লেচ্ছসংশ্রব হেতুতে ঐ যন্ত্রটিকে গ্রহণের বা উল্লেখের অযোগ্য মনে করে থাকেন, তাতে ক্ষতি হয়নি, কাজ আটকে থাকেনি। তম্বুরা যদি আরবসাগরের ঢেউ সহ্য করে ভেসে এসে থাকে, ত আমি বলি—ভালই হয়েছে, রক্ষা পেয়েছে সে, সম্মানও পেয়েছে সে, ধ্রুপদ-ধামার, খেয়াল ও আলাপের গুণীদের কোলে উঠে, তাদের করাঙ্গুলির কোমল স্পর্শে। গ্রন্থকারদের কলমের মুখে এর নামটি কলিত না হয়ে থাকে, নাইই বা হ'ল। মনে করা যাক্, কল্পনার এই 'হয় তো' আর 'যদি'গুলি সবই অপ্রামাণিক, তাতেই বা ক্ষতি কি! বেঁচে থাকুন (বোধ হয় আর বেশী দিন নয়) আমাদের বাংলাদেশের অশিক্ষিত চিত্রপটুয়ার দল, যাঁরা এই তম্বুরাকে মানানসই ক'রে বসিয়ে দিয়েছেন নীলকণ্ঠ মহাদেবেরই কোলে; কিন্তু তুম্বুরু গন্ধর্বের ছবি আঁকেন না এঁরা। নীলকণ্ঠ সমুদ্রজাত বিষ হজম করে ফেলেছেন, আর সামান্য তম্বুরাকে হজম করতে পারবেন না? আমি বলি—পেরেছেন তিনি; কারণ, তিনি যে আশুতোষ। বর্তমানে যেটা ভাল কাজে লাগাতে পারছি, যাকে সত্ত ও সহজে নিবেদন করতে পারছি, তাতেই তিনি তুষ্ট; অতীতের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের 'হয় তো' বা 'আহা যদি'র হা-হুতাশের অভিমানে উপবাসী হয়ে থাকেন না তিনি। তম্বুরার অতীত বলতে কিছু থাক্ বা না থাক্, বর্তমানে আশু ফল দেয় এই যন্ত্রটি। তম্বু-রার চারটি সুরভ্রমরের সঙ্গীতির মধ্যে হৃদয় দিয়ে মিলনেরই ধ্বনি রয়েছে; সেই ধ্বনিমাত্রকে হৃদয়ে ধরে নেই এখন।

আসরকে নতি জানিয়ে খাঁ সাহেব কণ্ঠের সুর ছাড়লেন তম্বুরা কোলে নিয়ে।

কোনও তোম্ তায় নোম্ বোল ব্যবহার না করে, মাত্র স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে খাঁ সাহেব সুরের নক্‌শা ফুটিয়ে তুললেন এক নিঃশ্বাসে। প্রথম অংশটিই মনে আছে। আরম্ভেই প্রকাশ হ'ল মুদারার মধ্যম স্বর; এর পরে যেন মুক্তাহারে মুক্তাদানার মত স্পষ্ট সমান ও ঘনসংলগ্ন কয়েকটি সুর দেখা দিল অবরোহণক্রমে; শেষের সুর এসে দাঁড়াল উদারার মধ্যমে; দ্রুত অভ্রান্ত সুরক্ষেপ দিয়ে যেন একটা রেখাঙ্কন আবির্ভূত হ'ল আমাদের শ্রবণে। কানের ধ্যানে বুঝলাম, দরবারী কানাড়ার সুরগুলি; কিন্তু রেখবটি তখন ছিল না। দরবারী রাগ নয়; কারণ, উদারার মধ্যম স্বর দরবারীতে অমন করে প্রকাশমান হয় না। কণ্ঠের চারু চরিত্রপটে সুররেখার অপূর্ব সে মহিমা! জীবনে এমন বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার আর ত ঘটেনি। আমার শ্রবণের আকাশ যেন অকস্মাৎ কয়েকটি সুরনক্ষত্র দিয়ে খচিত হয়ে উঠল; অজানা তাদের সঙ্কেত, মধুর তাদের আভাস। আর, সকলের মধ্যে সেই মন্দ্র মধ্যমই যেন সমুজ্জ্বল মধ্যমণি! মধ্যমের সেই দীপ্তিমান্ নিষ্কম্প স্বরূপ আজ মনে পড়ে বিশেষ করে। অতিত্বরিত স্মৃতির আলোয় ঝক্‌মক্ করে ওঠে একটি উদারার গান্ধার,—মৌজুদ্দিনের কণ্ঠে 'সুপনেমে আয়ে' পুরিয়া রাগিণীর গানের সেই অপূর্ব গান্ধার; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ওস্তাদ মুস্তাক্ হুসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে 'তান তলবার' বসন্তমালতী রাগের গানে উদারার শুদ্ধ মধ্যমের নিরালা মাধুরী! আহা! এ যেন অন্ধকারের মধ্যে হারান রতনের একটির আলোয় অন্যগুলিকে ফিরে পাওয়া; সন্ধানের কষ্ট নেই। নিরভ্র শারদ-শর্বরীর নিশীথে ঊর্ধ্বগগনে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মত এরা যেন পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে উদিত হয়। আমার জীবনশরতে স্মৃতির নিশীথগুলি ভরে ওঠে কত শত তারকার স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটায়, কিন্তু আজকের লগ্নের এমন উজ্জ্বল সমাবেশ আর ত দেখিনে; ঐ দু'টি মধ্যম আর একটি গান্ধারের মত। মৌজুদ্দিন কালে খাঁ সাহেবেরা গত হয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠের সুর আর দেখা দেবে না। মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব (ভগবান্ এঁকে ও এঁর যোগ্য পুত্রকে দীর্ঘজীবী করুন) এখনও সুস্থ প্রাণবন্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। এঁর কণ্ঠের গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে বা এখনও যাঁদের

সে সৌভাগ্য নূতন করে দেখা দেয়, তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি সেই বসন্ত-মালতীর গানের কথা, উদারার সেই মধ্যমের শোভাসুগন্ধের, অনুপম সৌন্দর্যের কথা। একবারের জন্যও যদি এর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে থাকে ত কখনও তাঁরা ভুলতে পারবেন না ঐ মন্দ্র মধ্যমকে ; এই আমার ধারণা।

খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করলেন "দুখকে পাত সব ঝর্ গয়ে" দিয়ে আরম্ভ একটি পদ ; পরেই বিশ্বনাথজীর মুখে শুনেছিলাম রাগের নাম 'কৌশিকী কানড়া'। উদার ও অসাধারণ এক রকমের আবেদনের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুদারার মধ্যমস্বর। কেনই বা হবে না! আরম্ভের প্রথম পাঁচটি মাত্রায় অবিরল দাক্ষিণ্য দিয়ে মণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এই মধ্যমস্বর। পরেই পঞ্চম আর কোমল গান্ধার যেন প্রিয় নর্মসখার আকুল আবেগ দিয়ে সেই মধ্যমকে প্রদক্ষিণ করে ফিরেছে ; কোনও আকস্মিক সুসংবাদের আনন্দ এরাই ত বহন করে নিয়ে গিয়েছে ষড়্জ ঋষভ আর কোমল ধৈবতের শ্রুতিপ্রস্থে। চারি দিকে ছড়িয়ে পড়া আকুলতা শেষ চরণের ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে যায় ; নূতন উচ্ছ্বাসের সৌন্দর্য নিয়ে আবার দেখা দেয় "দুখকে পাত সব ঝর্ গয়ে"। উপক্রমণিকার মুহূর্তে মন্দ্রমধ্যম শুনিয়েছিল অলক্ষ্য লোকের অশ্রুতপূর্ব একটি ধ্বনি। এখন গানের মধ্যে সেই ধ্বনিই নিজ থেকে ধরা দেয় মরলোকের মানবহৃদয়ের বাণীর ছদ্মবেশে। সমগ্র পদের ভাবার্থ ছিল—দয়িতের আগমন-সংবাদ শুনে, হে সখি! আমার আশা-লতিকা থেকে দুঃখের শুষ্ক পত্রগুলি ঝরে পড়েছে ; তোমরাও আনন্দ করো, আর আমাদের হৃদয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে সত্বর নিয়ে এস।

অতীত দুঃখের ছায়া দিয়ে ঘেরা অথচ সুখস্মৃতি দিয়ে ভরা এই কলিটি স্মরণে জেগে ওঠে বার বার। সমস্ত গানটি পেয়েও হারিয়েছি তাকে। এ পর্যন্ত অন্য কোনও গুণীর মুখে ঐ পদটি শুনিনি, কৌশিকীতেই হ'ক বা অন্য রাগেই হ'ক। পরে চন্দন চোবেজীর নিকট কৌশিক কানাড়ার একটি গান পেয়েছিলাম আমি। এই গানের সুর দিয়ে কত বার মিনতি জানিয়েছি আমার স্মৃতিকে যে, ঐ "দুখকে পাত সব" ফিরিয়ে আনতে ; কিন্তু গানের চরণধ্বনি মাত্র শুনি মাঝে মাঝে, মূর্তিটি ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির পথে অলক্ষ্যে।

অল্পক্ষণ পরে খাঁ সাহেব হাতের তম্বুরাটি পাশে নগেন্দ্রবাবুকে দিলেন এবং ডান হাঁটু উঁচু করে কায়দা করে বসলেন ; তাঁর ডান হাত চলে

গিয়েছে ডান কানের কাছে, বাঁ হাতটি রেখেছেন বাঁ হাঁটুর উপর। মৌজুদ্দিনও এরকম আসনে বসে গান করেন, মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন আবেগ সঞ্চয়ের কারণেই তাঁর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলে মধুরে অপূর্ব হয়ে উঠেছে; চিকণ সুমার্জিত সেই কণ্ঠধ্বনির ঝলকে ঝলকে আভাস দেয় মীড়মূর্ছনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারগুলি। গায়কির শৃঙ্গারসজ্জায় সার্থক হয়েছে রাগের আবাহন। তখনও কাণে "দুখকে পাত সব" শব্দগুলি ধরতে পারছি। প্রতি আবর্তে নূতন তানের উপসংহার হয়ে যেন নূতন সাজে ফিরে আসে ঐ শব্দগুলি।

এর পর স্মৃতির পথে কথা আর যেন এগিয়ে চলে না। সুরের ঢেউ-গুলি বিশাল হয়ে উপচে পড়ে মুখপাতের উপকূল-ভূমিতে। গানের কোন্ সময়ে অন্তরায় পদচারী শেষ হয়েছে, জানিনে আমরা। মনে পড়ে মাত্র জম্‌জমা আর গমকের মালা দিয়ে নূতন নূতন সুরের সাজ রচিত হয়ে চলেছে; বিচিত্র তানের ফুলঝুরি দিয়ে রাগের আরতি আরম্ভ হয়েছে। সাক্ষাৎ রাগই আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের অনুভবের রাজ্যে। কথা ও সুরের উপচার-গুলিকে স্তরে স্তরে সাজান আর বড় কথা নয়; নিবেদন করে দেওয়ার কাজটাই তখন বড় কথা, একমাত্র কথা। পূজারী কখন গোটা ফুলকে চন্দন মাখিয়ে নিবেদন করেন, কখনও বা ফুলের দল ছিঁড়ে নিয়ে এক একটি পাপড়িকে সচন্দন নিবেদন করেন। রাগের পূজারীও তেমনি গোটা কথা বা শব্দকে সুরের চন্দনে সুরভিত করে নিবেদন করেন; কখনও বা কথার, শব্দের টুক্‌রাগুলিকেই সুরে সুরভিত করে সমর্পণ করেন রাগদেবতার চরণে। অনুষ্ঠানের পর্যায় বিলীন হয়ে যায় অন্তরের আরাধনায়; আরাধনাই রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে অনুরাগে আরক্তিম হয়ে, অনুভবের অমৃতে সুসিক্ত হয়ে। এই অনুভূতি, মানসী রতি আর অমৃতের আস্বাদ, না-জানি কোন্ আশ্চর্যরূপে সংক্রামিত হয় শ্রোতার হৃদয়ে। গায়ক ও শ্রোতার আন্তরিক ব্যক্তিত্বে যেন পার্থক্য আর থাকে না।

গান শেষ হয়ে গেলে মনে হয়েছে ধ্রুপদ-ধামার আর খেয়ালের ভেদ মাত্র সাধন বা অনুষ্ঠানেরই ভেদ; শেষ অর্থাৎ চরম সাধ্য যে অনুভবের উন্মেষ, তাতে ত ভেদ নেই। ধ্রুপদ-ধামারের গায়ক কখনও কথার ফুল ছিঁড়ে ছিন্ন দল নিবেদন করেন না রাগদেবতার পূজায়। খেয়ালের গায়ক আবেগের

বশেই হয় ত আনুষ্ঠানিক নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেন; তবুও অনুতপ্ত হন না তিনি।

অনুভবের মুহূর্তে সুরের বিশ্লেষণ হয় না, কথার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু কণ্ঠস্বরের বিশিষ্ট আভাস থাকে সর্বক্ষণ। খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য অনুভব করলাম, যখন তিনি ছোট ছোট পাল্লার "হর্‌কত" (অর্থাৎ প্রত্যেক নূতন বিস্তারের মুখে মূর্ছনার মোলায়েম আল্পনা) দিয়ে বিস্তারের বিচিত্র তরণীগুলি ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুরের তরঙ্গে। তখনকার তখন সেই কণ্ঠের তুলনা পাইনি। পরে, ইন্দোরনিবাসী বীণকার মজিদ্‌ খাঁ সাহেবের হাতে বীণার হর্‌কত্‌-গুলি শুনে মনে পড়ে গেল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর লীলায়িত চরিত্র* যার মধ্যে রুক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। কত রকমের গতি-বেগ দিয়ে কত রকমের অজস্র তান হ'তে থাকে, অথচ কণ্ঠের সেই কোমলতার বিচ্যুতি ঘটে নি। আমার কানে সুরের স্নেহলেপনই অনুভব করেছি, স্বর দিয়ে শ্রবণের বেধ বা আঘাত ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। জরব্‌দার (অর্থাৎ staccato style-এর) বোল বা তানের ছুঁই-ফোঁড় লক্ষণ সহজেই কাণে ধরা পড়ে; সুরগুলি যেন তাদের বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আবির্ভাব স্পষ্ট আঘাত দিয়ে জানিয়ে দেয়। খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্র ও কারুকার্য এরকম জরব্‌দার তানকে যেন উপেক্ষা করেছে বলে মনে হ'ল; এমন কি, চৌহুনি তানের মধ্যেও জরব্‌দার লক্ষণ ছিল না।

মজিদ্‌ খাঁ সাহেবের বীণায় গমক্‌-যোড় শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের মোলায়েম গমকের কাজগুলি। তম্বুরার গুঞ্জনের সহযোগে কণ্ঠের সেই আন্দোলনগুলি বীণাযন্ত্রে গমকেরই অনুরূপ ছিল নিশ্চয়; তা না হ'লে মজিদ্‌ খাঁ সাহেবের হাতে গমক শুনে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের গমক মনে পড়ত না। কালে খাঁ সাহেবের গান শোনার আগে ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেবের সেতার সুরবাহারে গমক শুনেছি; পরে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, কেরামত্‌ উল্লা খাঁ সাহেব ও ফিদাহুসেন খাঁ সাহেবের হাতে সরোদের গমকও শুনেছি। কিন্তু এসব ব্যাপার কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেনি। এই হ'ল আসল কথা।

---

* শব্দের 'চরিত্র' বলতে প্রাচীনতম সঙ্গীতাচার্য ভরত 'গুণ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন; আর, আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা একে বলেন 'Character' বা 'timbre'

কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য অনুভব করেও একরকমের তুলনা সম্ভব। মাত্র আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের বিশিষ্ট চরিত্রের সাদৃশ্য বা সাজাত্য বোধ করেছি। এরকমের বোধকেও একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্মৃতিতে ধরে রেখেছি। সারেঙ্গীর ধ্বনি আর এস্রাজের ধ্বনির যে সাদৃশ্য, কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনি আর আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনির মধ্যে সেইরকমের সাদৃশ্য বোধ করি। পার্থক্যও ঐ দৃষ্টান্তের অনুগত হয়ে দেখা দেয়। এস্রাজ যন্ত্রে তারার সপ্তকে সুরগুলির চরিত্রে একটা অসাধারণ তীক্ষ্নতা দেখা দেয়, যাকে ইংরাজীতে Falsetto বলে; সারেঙ্গীতে এরকমের হয় না। কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠ ছিল সারেঙ্গীর মত; তার-সপ্তকের সুরে কোনও কৃত্রিম তীক্ষ্নতা দেখা দেয়নি। আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠ এস্রাজের মত তার-সপ্তকে পৌছে কৃত্রিম ও সুতীক্ষ্ন একটা রূপ ধারণ করত। এই আমার ধারণা।

গান শেষ হ'লে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন খাঁ সাহেব। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথজী মৃদু স্বরে বাংলা ভাষায় কুমারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, খবরদার, যেন খাঁ সাহেবকে ফরমাইস করা না হয়, উনি আপন খেয়ালে যা গাইবেন, সেইটেই হবে চরম।

তম্বুরার সুরে কোনও পরিবর্তন না করে, কোনও উপক্রমণিকা না করে খাঁ সাহেব দ্বিতীয় গান আরম্ভ করলেন "যোবন আয়ে" ইত্যাদি একটি পদ। উদ্ভট অথচ রমণীয় স্মৃতির বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা রয়েছে ঐ গান; বেষ্টনীর চারি দিকে শুখ্‌না লতাপাতার জঞ্জালের মত অবান্তর অভিজ্ঞতা জড়িয়ে রয়েছে। স্মৃতির পথে এরাই বাধা সৃষ্টি করে। এগুলিকে সরিয়ে না দিয়ে অনুভবের দেউলে প্রবেশ করা কঠিন।

ওস্তাদ বিশ্বনাথজী বলেছিলেন, এই গানের রাগ 'পঞ্চম' নামে রাগেরই একরকম ভেদ। তখনকার বাংলা দেশের ধ্রুপদীয়া গুণীরা 'বসন্ত' নামে যে রাগ অনুশীলন করতেন, সেই বসন্তেরই জাতি বলে মনে করেছি পঞ্চম রাগকে। পরে শ্যামলালজী ও বদল্‌ খাঁ সাহেবের সঙ্গে প্রসঙ্গ করে জেনেছিলাম, এঁদের মতে "যোবন আয়ে" গানটির রাগ 'ললতা-পঞ্চম' (ললিতা-পঞ্চম), আর কিছু ইতর-বিশেষ করে 'ললত্‌-পঞ্চম' নামে অন্য একটা রাগও আছে। ঘরানা ওস্তাদদের মুখে প্রচলিত ধ্রুপদ-ধামার খেয়াল গানের সাক্ষাৎ

নজিরই ছিল এঁদের মন্তব্যের ভিত্তি। এই ভিত্তি নির্ভরযোগ্য মনে করেছি। ফলে, বসন্ত, ললত্ (ললিত), ললতা (ললিতা), পঞ্চম আর ললত্-পঞ্চম ও ললতা-পঞ্চমের অরণ্যে প্রবেশ করে দিশাহারা হ'য়ে গিয়েছিলাম। জঙ্গল সাফ করে একটা রাস্তা বার করেছি পরে। যাই হ'ক, স্মৃতির পথে জমে আছে এদের শুখ্‌ন ডালপালার আবর্জনারাশি। এদের স্পর্শ করায় বিপদ্ আছে; জঞ্জালের মধ্যে মতভেদের কাঁটাগাছ আর ঐতিহাসিক আগাছা জন্মে গিয়েছে। আপাতত কালে খাঁ সাহেবের মুখে "যোবন আয়ে" গানটির প্রতি প্রবল আগ্রহ আমার। এই আগ্রহের আগুনে জ্বালিয়ে দেই আবর্জনা আর আগাছাগুলি। শুখ্‌ন জিনিষ সহজে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে; কিন্তু ঐ আগাছার নিত্য নূতন কাঁচা কাঠামো পুড়তে পুড়তেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করছে বেশ বুঝতে পারি।

গানের আরম্ভে মাত্র "যোবন আয়ে"র পাঁচটি অক্ষর দিয়ে সুরের ফাঁদ; তাতে ধরা পড়েছে আমার মন। আগেকার কৌশিকী-কানড়ার গানের রেশটা তখনও লেগে রয়েছে। এই দ্বিতীয় "যোবন আয়ে" পদের অবশিষ্ট কথা ও সুরগুলির এক আবর্ত শেষ হয়ে গানের মুখবন্ধনী ফিরে এল দ্বিতীয় বার; যেন ভাসা-ভাসা মেঘের মর্ম ভেদ করে স্তিমিত জ্যোৎস্নার আলো,— গানেরই আলো ছেয়ে গেল আমার মনে। আমি খুঁজছি সেই আরম্ভের "যোবন আয়ের" চমৎকার ব্যাপারটিকে; মেঘের আড়ালে সেই চন্দ্রমা, সেই অনুভবের চন্দ্রমা, যে আমার হৃদয়ের বাতায়নে পাঠিয়ে দিল গীতমধুর জোছনাদূতীকে। কী চমৎকার সেই "যোবন আয়ে" মুহরা! তিন চার বার গানটি শুনতে থেকে বোধ হ'ল, যেন বাহার খুলে গিয়েছে মেঘ আর চাঁদের খেলায়; অস্ফুট জ্ঞান আর অবিকসিত অনুভবের মিলন-লীলা আমার অন্তরকে ক্ষণে পুলকিত, ক্ষণে শান্ত সুস্নিগ্ধ করে দেয়! আশ্চর্য আলো দিয়ে ভরা এই পাঁচটি অক্ষর আর সুরের পঞ্চপ্রদীপ! মুদারার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আর তার-ষড়্‌জ; কতো সামান্য কথা এটা! জগতে কে এমন গীতনবিশ্ বা সুরনবিশ্ আছেন, যিনি ঐ কয়েকটি সুরে গলা ফেরাননি! কিন্তু সুরে গলা ফেরান এক ব্যাপার, আর সুরশ্রুতির অনুভব সুন্দর আসন রচনা করে গান বা রাগকে আমন্ত্রণ জানান অন্য ব্যাপার।

একটি ছোট্ট দোহারা গিট্‌কিরির চমক্ আর একটা হাল্‌কা মোলায়েম ফান্দা রচনা করেই খাঁ সাহেব যেন তল্‌বারের চোট্‌ দিলেন সমের উপর নিষাদ সুরে। "আয়ে" শব্দের "আ"এর উপরই ছিল সমের সন্ধান। তীব্র নিষাদের অমৃতমুখ একটি বাণ দিয়ে যেন গানের মর্মভেদ হল, আর পরম সুস্বাদু এক শ্রবণামৃতই যেন অনুস্যূত হয়ে চল্‌ল গানের প্রতি অঙ্গে, ছন্দ আর মাত্রার গ্রন্থিতে। নিষাদের সেই বেদনামধুর স্বরূপটি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল যেন ধৈবতের মূর্ছনার মধ্যে, কিন্তু তার শিহরণ উছলে পড়ে দেখা দেয় যেন পঞ্চমের স্পর্শে; যেন আত্মসমর্পণের ক্রমিক লীলাপর্যায় দেখা দিয়ে যায় সুরের পথে শ্রুতিদের সাথে সাথে। প্রতিটি সুর আসে আপন অভিমানের স্পর্ধায় আপন আবেগ সঞ্চয় করে। পরমুহূর্তেই যেন বিমোহ আর বিস্ময়ের মধ্যে ঘটে আত্মবিস্মরণের চমৎকারী! অস্ফুট অবর্ণনীয় অনুভবের সেই মাধুর্য! ধরি ধরি করেও ত তাকে ধরা যায় না; অথচ অজ্ঞাতসারেই সে ধরা দিয়ে সরে যায় বার বার। যখন সরে গিয়েছে, তখন মনের মাধুরী দিয়েই বুঝি কোন্ এক মধুর সুন্দর এসে স্পর্শমাত্র করে গিয়েছে আমাকে। চলে যাওয়ার সময়ে আমার সমস্ত মনোভূমিকে নিস্নাত করে দিয়ে গিয়েছে সুরশ্রুতির স্নিগ্ধ শিশির সিঞ্চনে।

মাত্র ঐ পাঁচটি অক্ষরকে ধরে খাঁ সাহেব রাগের বাঢ়ত্ (ক্রমশ অগ্রগামী সুরের ভাঁজ দিয়ে একরকম রাগ-বিস্তার) রচনা করে চলেছেন একটির পর একটি। প্রতি বারেই ফিরে আসে "যোবন আয়ে"র মুখবন্ধনী নূতন তানের বেগ সংগ্রহ করে, সুর-কল্লোলের উদ্দাম তরঙ্গ-সম্ভার বহন করে। এ কি যৌবন সমুদ্রের নিত্য নব পরিচয়? কি জানি! আমার মানস প্রত্যক্ষে বার বার উপলব্ধি করি সেই মনোহর ক্ষণবিপর্যয়ের ভঙ্গিমা। ভাবতরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস, লীলাললিত অঙ্গবিক্ষেপের ঊর্মিমালা, আবেগবিহ্বল বক্ষশ্বাসের অধীর শব্দায়মান স্বরূপই যেন সঙ্গীতের ছদ্মবেশে আমার মনোভূমিকে উৎপ্লাবিত করে দিতে অগ্রসর হতে থাকে; আমি প্রতীক্ষা করে আছি সেই আগমনের চরম বিস্ময় আস্বাদ করার আশায়। এমনই সময়ে আর প্রতি বারই সেই তরঙ্গভঙ্গি যেন মুখবন্ধনীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে নিষাদ আর ধৈবতের শ্রুতির সীমায় অকস্মাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; পঞ্চমস্বরের অকিঞ্চন উপকূলে এসে সেই প্রমত্ত ভাবগুলি যেন শান্ত মূর্ছিত হয়ে যায় আত্মপ্রকৃতির গভীরে। অতি

বিচিত্র এরকম অনুভবের উন্মেষ, অনুভূতির এই অকস্মাৎ প্রশান্ত বিস্ময়, অন্তরের মধ্যে আকস্মিক উপরমের এই অনুপম পরিচয়।

বিস্তারক্রমের মধ্যে যত বার গানের মুখ ঐ নিষাদ আর ধৈবতের সম্মুখীন হয়েছে, তত বারই ঐ রকম অনুভবের বিস্ময় আর মোহ দেখা দিয়েছে আমার মনে। কত রকমের গানে কত বিভিন্ন রকমের রাগতরঙ্গে শুদ্ধ নিষাদ আর শুদ্ধ ধৈবত ভেসে আসে, ভেসে যায়। এদের সকলকে অবহেলা করিনি, এখনও করিনে। কচিৎ এদের শ্রুতিগুলি যেন ঈষৎ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হ'তে কটাক্ষ ও ভ্রূবিলাসের ইঙ্গিতমাত্র করে চলে যায়, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। কখনও বা সুরেরা হাসিমুখে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, শিল্পীর অভ্যাস-নিগড়ে বদ্ধ বিহঙ্গ এরা; কলকাকলী সৃষ্টি করে, মাত্র শিল্পচাতুর্যের "Window-dressing" বজায় রাখতেই এরা আসে আর চলে যায় পালাক্রমে। কখনও বা এরা শান্তশিষ্ট নির্বিকার ধ্বনি করতে থাকে একটির পর একটি; টাইম্‌পিস্ ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজের মতো শব্দের দাঁড় বয়ে কাল-সমুদ্রকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে দেওয়াই যেন এদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য, আগমনের একমাত্র হেতু! এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই বলি এদের,—"এসেছ, এই আমার ভাগ্য। তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে প্রীত হলাম, কৌশল দেখে চমৎকৃতও হয়েছি। আশীর্বাদ করি, বেঁচে বর্তে থাকো; আর তোমাদের যাত্রাপথের যিনি পাণ্ডা, তিনি যেন তোমাদের বিপথে বেঘোরে না নিয়ে যান।" খুব খুশী হয়ে এরা কর্তব্য পালন করে, নিজেদের মধ্যে ছলা-কলার খেলা করে, আর ছুটি পেলেই ছুটে পালায় পাঠশালার পড়ুয়ার মতো; কিছু নিয়েও আসে না, কিছু দিয়েও যায় না, এরা। শিল্পচাতুর্যকে অবহেলার বস্তু বলে মনে করিনি, কখনও। কিন্তু চাতুর্যই শিল্পের চরম চর্যা বা শিল্পীর জীবনে প্রথম ও শেষ নিঃশ্বাস, এমনও ত মনে করিনি কখনও।

এই নিষাদ আর ধৈবত! এরা মাত্র সাধনসিদ্ধ কণ্ঠকূজন নয়। অনুভবের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য পরিচয় সঙ্গে নিয়ে এরা এসেছে অনুভবেরই পথে; শ্রোতার অনুভবের কাছে সাক্ষাৎ নিবেদন জানিয়ে ফিরে যায় এরা। মনে হয়েছে, নিষাদ আর ধৈবতের যুগল পরিচয়ই ঐ গানের জীবনসূত্রের রসময় মিলনগ্রন্থি; অন্য সমস্ত কথা আর সুরেরা ঐ জীবন-সূত্র দিয়েই যেন পরস্পরে গাঁথা, ঐ সঙ্গম-সুধাই যেন তাদের পরস্পরে

চাওয়া আর পাওয়ার চরম কথা। এদের আবেদনই আমার অন্তরকে সঞ্জীবিত করেছে, আমার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেছে বেদনা ও অনুভূতির পরম প্রসাদ দান করে। তবুও মুখের কথা দিয়ে আমি ধরে নিতে পারছিনে এদের মর্মের কথাটি সুরের স্মৃতিপটে ভাবের যে বিচিত্র বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে, তাদের বর্ণরেখা আমার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, এটা বুঝতে পারি। সেই বিপর্যয়েরও গভীরে না-জানি কোন্ গোপন অনুভূতি ঘটে যায়, যার আভাসমাত্র পেয়ে আমি আবিষ্ট হয়ে যাই তখনই, আর সার্থক, ধন্য মনে করি নিজেকে।

নিষাদ-ধৈবতের সঙ্গমে এই গানের আন্তরিক ভাব-বিপর্যয় নানারকমে বুঝবার চেষ্টা করেছি। শ্যামলালজী ও বদল্ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার অবসরে বদল্ খাঁ সাহেব কৃপা করে এই গান ও ললত্-পঞ্চম রাগের একটি গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা করে দেখি, সেই একই নিষাদ আর ধৈবতের খেলা! একই রকমের মাধুর্য আর বিস্ময় দিয়েই ঐ দুই সুর সহসা অনুভবের উন্মেষণা ঘটায়! একই রকমের অনুভূতি রাগের কোনও অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দেয়। মাধুর্য আর বিস্ময় দিয়ে মাখান এই পরিচয়, এই আত্মসাক্ষাৎকার! গানের এই "অরমাঁ", সঙ্গীতের এই অনুভূতি! এদের বর্ণনা করা যেন অসম্ভবই মনে হয়। নিধুবাবুর কথায় বলতে হয়—"তোমারি তুলনা তুমি, প্রাণ! এ মহীমণ্ডলে।" অথচ, এমন কথা বলেও তিনি ক্ষান্ত হননি; তুলনা খুঁজেছেন। আমি তুলনা খুঁজতে চেষ্টা করিনি; তবুও একটা ভাব-জগতের উদাহরণ এসে দেখা দিয়েছিল আলোচনার অবকাশে।

একজন ভাবুক কোনও রূপগর্বিতা নায়িকার জীবনে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিপরীত রকমের ভাবাভাসের গূঢ় সৌন্দর্য ইঙ্গিতমাত্র করে বলেছেন —যৌবনাগমবিভ্রমৈরুদ্‌ভ্রান্তা হরিণেক্ষণা। পুনর্ন্ পুরনিকাণমুগ্ধা মুগ্ধেব তিষ্ঠতি॥

এর ভাবার্থ,—কুরঙ্গলোচনা জনৈকা কিশোরী বিশিষ্ট রূপগর্বিত আচরণ দিয়ে সখিজনকে মুগ্ধ করতে থাকেন। এমন সময়ে যৌবনের উপগমের কারণে নায়িকার আচরণে 'বিভ্রম' নামে কত কিছু বিশেষ লক্ষণও দেখা দিল। একে রূপগর্ব, তার উপর যৌবনের বিভ্রম! কত বিচিত্র বিকার ও চঞ্চলতা দেখা দেয় নায়িকার দেহে মনে বাক্যে আচরণে! "বিভ্রম"

অর্থাৎ অস্থির মতির বশে কারণে অকারণে আসন ত্যাগ, হাস্য, রোষপ্রকাশ, কার্য শেষ না হতেই অন্য কার্যে মনোনিবেশ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রকাশ্য লক্ষণ। কিন্তু, আশ্চর্য এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ! বিভ্রমগুলির জন্য নানা-রকমের চঞ্চলতা ও অধীরতা নায়িকার আচরণে উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও ক্ষণে ক্ষণে তিনি নিজ চরণের নূপুরশিঞ্জিত শুনে সহসা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যান; যেন আত্মপ্রকৃতির প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যান তিনি! যৌবন উপগমের ভাব-বিপ্লব তাঁর সমস্ত অভিমান ও রূপগর্বকে অভিভূত করে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে; বাল্যাবস্থার পূর্বাস্বাদিত বিস্ময়-বিমোহের পুনরাস্বাদই যেন ঘটে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে। ফলকথা, বিশেষ সন্ধিক্ষণেই এই বিপ্লব-বিপর্যয়ের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়; এবং সেই অতিপরিচিত নূপুরধ্বনিও এ-সময়ে ঐ রকমের আন্তরিক আলোড়নের কারণ হতে পারে।

যিনি ভাবুক, তিনি ভাবের ইঙ্গিত করে ক্ষান্ত হন। যিনি রসিক, তিনি ভাবসৌন্দর্যের রস গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যকে রাসাস্বাদ করান না। আর যিনি কবি, তিনি ভাবুক ও রসিকেরও উর্ধ্বে, কারণ, একমাত্র তিনি অন্যকে রসাস্বাদ করাতে পারেন। ঐ শ্লোকটির লেখককে আমি ভাবুক বলেই মনে করেছি। আমি নিজে ঐ ভাবুকের রচনার আলোচক মাত্র; কালে খাঁ সাহেবের গানের মুহরাটি শুনে আমার মনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ঐ ভাবুকের ইঙ্গিতগুলিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার একটা প্রত্যয় এই যে, অনুভূতির কোঠায় সাদৃশ্য আছে বলেই আমি এরকমের বিশিষ্ট চেষ্টা করলাম। ঐ গানের "যোবন আয়ে"ই হয় ত রাগানুভূতির একটি সন্ধিক্ষণ; নিষাদ আর ধৈবতের ব্যঞ্জনাই হয় ত সেই সন্ধিক্ষণে নূপুরধ্বনির মত চমৎকৃতি আস্বাদন করিয়েছে।

অবশ্য কালে খাঁ সাহেবের প্রতিভা ও-রকমের উন্মেষণা আর সাক্ষাৎ-কারের চরম সৌন্দর্য আস্বাদ করিয়ে দিয়েছিল। বদল্ খাঁ সাহেবের অন্য গানে ('ফুলি বসন্ত বাহার') ধৈবত স্বরই ছিল গূঢ় ঘূর্ণীপাকের প্রকাশ্য নিশানা; রাগোচ্ছ্বাসের অকস্মাৎ তিরোধানের প্রথম স্তম্ভ। বহির্জগতের দৃষ্টান্ত খুঁজেছি। মনে হয়েছে, এরকমের রাগে ধৈবত-নিষাদের মধুর চক্রান্ত যেন সমুদ্রতটের কিছু দূরে ব্রেক্‌ওয়াটারের তরঙ্গবন্ধনীর মত বিপর্যয়কারী; তরঙ্গের বিক্ষোভ যেন কারণে অকারণে এখানে থেমে যায়। বাইরের

জগতের উদাহরণ দিয়ে ভিতরকার ভাবজগতের ঘটনাকে বুঝবার একটা চেষ্টা মাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতির রহস্য যেন আচ্ছন্ন থেকে যায় ভাবের প্রহেলিকার অন্তরে।

আরও মনে হয়েছে, ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার প্রভৃতি স্বরের অন্তরে বস্তুত কত অদ্ভুত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, ধ্বনির বিচিত্র সংঘাতগুলি শ্রোতার অন্তরকে কত রকমের উন্মেষণা দিয়ে আপ্লুত, অনুগৃহীত করতে পারে, এসকল কথা আমরা তখনই বুঝি, যখন সঙ্গীতের প্রতিভা আমাদের বুঝিয়ে দেন গান ক'রে, হৃদয়ের আঁধারে সুরের আলো পৌঁছিয়ে দিয়ে; যখন সুরতরঙ্গের মধুর কল্লোল দিয়ে তিনি উৎসাদিত করে দেন আমাদের কানে-শোনা নিত্য-নৈমিত্তিক কোলাহলগুলি। এমনি করেই কবিপ্রতিভা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়ে দেন শব্দ-বাক্যের অলৌকিক ধ্বনিমাহাত্ম্য; আমাদের অনুভবের যন্ত্রকে উন্মুখ করে তোলেন বিচিত্র অনুভূতির প্রত্যাশা দিয়ে। সঙ্গীতের অনুভব আর কাব্যের অনুভব! এদের মধ্যে হয় ত মৃণালসূত্রের ব্যবধান আছে। গানের অবকাশে এই সূত্রটি যেন ক্ষণে পাই, ক্ষণে হারাই। তাইতে মনে করি, ব্যবধান থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী! যে রকম হক, আর যে রকমেই হক, কৃপা করে অনুভবটা ঘটিয়ে দেও, হে গায়ক, হে কবি! অনুভবের ঘর যদি আকাঙ্ক্ষা আর অনুরাগে ভরে না ওঠে, তা হ'লে গান আর কবিতা, অর্থাৎ সুরের ষড়্‌যন্ত্র আর কথার কাকলী দিয়ে কর্ণকুহরকে উত্তেজিত করে কী লাভ!

খাঁ সাহেবের গান আর সুর কানে ধরে নেই। আগেকার সেই বিস্ময় বিমোহ এখন আর নেই; গানের আলোয় দেখা দিয়েছে বর্ণের ছটা, রূপের শোভা। ঢিমা একতালার ছন্দোবন্ধনে খাঁ সাহেব রচনা করে চলেছেন গিট্‌কারির কুসুমগুচ্ছ; বাণী ও সুরকে ছন্দের বাঁধনে জড়িয়ে অলঙ্কৃত করেন বোল তানের বিভূতি দিয়ে। রাগের আলো আর ছায়া, ছন্দের আভাস আর নিরাভাসের সুযোগে যেন লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠল কথা ও সুরের দল। গানের লয়ে কথা ও সুরের পলকে প্রলয়, পলকে আবির্ভাব। সমের নিকুঞ্জ পথেই এদের পরস্পরে ধরা-ছোঁয়ার অভিযান; অভিযানের মধ্যেই যেন মিলন আর বিচ্ছেদের খেলা। কত মধুর মিলন, আর কি অপূর্ব বিচ্ছেদ! ইতিপূর্বে এ রকমের ব্যাপার আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি ব'লেই মনে প্রাণে সজাগ

হয়ে আছি। রাগের শরধি থেকে বাছাই করা সুরের বাণ তুলে নেন খাঁ সাহেব; কথার ডালি থেকে চয়ন করেন ব্যঞ্জনের শ্লিষ্ট ধ্বনিগুলি; মাত্রা ছন্দের সন্ধিক্ষণে কথার কুসুমামৃতে ডুবিয়ে-তোলা সুরের বাণগুলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠচ্যুত হয়ে ছেয়ে ফেলে আমাদের শ্রবণের আকাশ; মুহূর্তের পরিচয় মাত্র। এরা যখন শ্রুতির দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, তখনই আবার ফুটে ওঠে গানের রূপ, আপন দীপ্তিতে আপন সুষমায়।

ঢিমা খেয়ালের মন্থর গতিভঙ্গির অন্তরালে এতখানি চপলতা গোপন থাকতে পারে, গিট্‌কারি ও বোলতানের ছন্দসজ্জায় গানের রূপ এমন মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তখন পর্যন্ত আমরা টপ্‌পা গানের অঙ্গেই গিট্‌কারির শোভা দেখেছি; আর বোলতানের রূপই দেখিনি ইতিপূর্বে, এমন কি, মৌজুদ্দিনের গানের মধ্যেও এরকমের ছন্দোবদ্ধ সুরশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিনি। পরে বদল্ খাঁ সাহেব ও শ্যামলালজীর সঙ্গে এদের বিষয়ে আলোচনা করে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এপর্যন্ত নানা গুণীর মুখে নানা রকমের খেয়াল গান শুনে ধারণা হয়েছে, ধ্রুপদ গানের আনুগত্য স্বীকার করে আর বিধি-নিষেধের গণ্ডীবদ্ধ হয়েই সাধারণভাবে খেয়াল গানের রূপ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এমনও সব খেয়াল গানের রূপ দেখেছি,—বিশেষ করে বদল্ খাঁ সাহেবের ও আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের সম্প্রদায়ের গানের কথা মনে পড়ছে,—যেগুলি আপনার নিয়মে গড়ে উঠেছে; আপন ভঙ্গিমায় আপন সম্ভ্রমে আর ইচ্ছামত জম্‌জমা, গিট্‌কারি ও বোলতানের সাজে চলতে ফিরতে থেকেই আপন প্রাণের পরিচয় দেয়, আপন সুষমা পরিস্ফুট করে। ধ্রুপদ গানের নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এরা গড়ে ওঠেনি। খেয়াল গানের এই স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্র রূপের চরম পরিচয় সর্বপ্রথম ঘটেছে কালে খাঁ সাহেবের মুখে বিলম্পদ আস্থায়ী শুনে। আরও মনে হয়েছে, স্থপতি-শিল্পের পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাকে "বারোক্ স্টাইলে"র রচনা বলেন, বস্তুতঃ সেই ধরণের রচনা আর বিভূতি ছিল কালে খাঁ সাহেবের গানের মধ্যে। তাঁর গান শুনে মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম—খেয়াল ত খেয়ালই! আর গুণীর আপন খেয়ালই চরম কথা। পরের খেয়ালে গান করা ত চাকুরি করার সামিল। মাত্র এই কথাটি মনে করলে কালে খাঁ সাহেব, মৌজুদ্দিন আর আব্‌দুল করিম খাঁ সাহেব ছাড়া আর কাউকে মনে করতে পারিনে।

বোলতানের বাহনে গানের কথাগুলির অর্থ সামর্থ্য পরিস্ফুট হচ্ছিল বলেই আমি সন্ধান করেছি গানের ভাবার্থ। ভাবার্থ ছিল,—দেহধামে যৌবনশ্রী যেন রাজনন্দিনীর রূপে দেখা দিয়েছে। প্রিয় হিতৈষী সখিজনের মত যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরা নিজ নিজ রূপ গুণ শোভা আর অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হয়ে রাজনন্দিনী যৌবনশ্রীকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানায়। গান শুনতে শুনতে মনে হয়, তবে কি গীতেরই যৌবন দেখা দিল কথা সুর ও ছন্দে সমৃদ্ধ হয়ে। সত্য সত্যই যেন গানের উল্লাস-চঞ্চল যৌবনই প্রত্যক্ষ হ'ল আমাদের।

বিচিত্র ছন্দের বোল্‌তান শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছি; ছন্দে বা মাত্রায় আমাদের দেহ দুলে ওঠে; শিষ্ট শান্ত হয়ে বসে থাকার কথাই ওঠে না। খাঁ সাহেবের পাগড়িও থেকে থেকে দুলে উঠছে; তাঁর বাঁ হাতখানি ঊর্ধ্বে উঠে যায় তানের আগে, আর বোলতানের চক্রের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে। সময়ে সময়ে আবেগের চরমে সেই হাতখানি বেগে নেমে এসে বাঁ হাটুর উপর ধাক্‌কা দিয়ে থেমে যায়; কখনও বা আসরের জাজিমের উপর একটা চাপড় দিয়ে উঠে যায়। সঙ্গতীয়া ভদ্রলোকটি গান শোনার উল্লাসে অন্যমনস্ক হয়ে ইতিপূর্বে একবার অপ্রতিভ হয়েছিলেন। তার পর থেকে সযত্নে ঠেকাকে সংযত করে রাখেন তিনি, কিন্তু মাথা নড়ে ওঠে তাঁরও।

সহসা আমরা শুনি একটি নূতন গানের কলি,—"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরা"! খাঁ সাহেবেরই মুখে সুরে ছন্দের বাঁধনে, বোলতানের সাজে! তিনি যেমনটি উচ্চারণ করেছিলেন, ঠিক তেমনটিই লিখেছি। রাগ ত একই বোধ হল; কিন্তু এটা কি নূতন গানের আরম্ভ? সঙ্গতীয়া ভদ্র-লোকটি ত্রস্ত হয়ে ঠেকা ছেড়ে দিলেন, কি করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি ভাবছি, নূতন গানের মুখেই এত বাহার কি করে হয়। অবিলম্বেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। খাঁ সাহেব নূতন চরণটির শেষে অর্থাৎ কবিশেখর জয়দেবের লেখা সমস্ত চরণটি শেষ করে গাইলেন "বিহরত হরিরিহ সরস বসওন্‌ত, যোওবন আ"; একেবারে পূর্বের গানের মুহরা আর সম্‌! এ কি উদ্‌ভট প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার এই এক গানের মধ্যে অন্য গানের বোল! যেন দু'টি গানের লতা হঠাৎ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দেখা দিল আর নিমেষের মধ্যে হয়ে গেল ছাড়াছাড়ি! স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হয়েছি আমরা! এটা কি খেয়াল, না খাঁ সাহেবের খামখেয়াল!

হতবুদ্ধি হ'ননি দুজন ; স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব আর বিশ্বনাথজী। ঠেকা বন্ধ হলেও তম্বুরার ছেড়-ছাড় গোলমাল হলেও খাঁ সাহেব অবিচল গান গেয়ে চলেছেন, আপন খেয়ালে। আর বিশ্বনাথজী! তিনি সঙ্গতীয়া ভদ্রলোকটির হাত থেকে তবলার জোড়া একরকম কেড়েই নিলেন বলতে হয় ; যে রকম ব্যগ্র দেখলাম তাঁকে! গানের ছন্দের অনুক্রমগুলি অবলীলাক্রমেই ধরে নিলেন বিশ্বনাথজী। শুধু তাই নয়, চৌতালের দু'চার-ছয় মাত্রার কয়েকটি ছোট ছোট মানানসই বোল এমনভাবে সঙ্গতে লাগিয়ে দিলেন তিনি যে, খাঁ সাহেবের উৎসাহ বেড়ে গেল এবং আমাদের মনে হল, বিশ্বনাথজী এতক্ষণ সঙ্গত করলে গানের বাহার আরও খুলে যেত। তখন আরম্ভ হল এক উদ্ভট, অথচ সুন্দর চমৎকার গীতরূপের রচনা। গানের ভূমিকায় গান! এক গানের ফ্রেমে যেন অন্য গানের ছবি! এক গানের লতাপাতা ফুল দিয়ে অন্য গানের শৃঙ্গার-সাজ! প্রথমে বুঝতে অস্বস্তি হয়েছিল। অস্বস্তিটা চলে গেল, যখন বুদ্ধির কারচুবি বন্ধ রেখে গান শোনায় মন দিলাম।

সেই "যৌবন"ই যেন থেকে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় "ললিতলবঙ্গলতিকা"র সুর-ছন্দ তানপ্রতানের আড়ালে, আবার ফিরে এসে দেখা দেয় "বসন্তঋতু"র আগমনীবার্তা পেয়ে! এখন আর সুরে সুরে নয়, গানে গানেই যেন লুকোচুরির খেলা ; অদ্ভুত! আর মনে হল যেন অসম্ভব সাধন-চাতুর্য দিয়ে নিরতিশয় মনোরম ভঙ্গিতে, প্রতি বার এক এক রকমের গিটকারি আর বোলতানের সাজে দেখা দেয় "ললিতলবঙ্গলতা"। শব্দগুলি কখন সূক্ষ্ম গমকের নিস্বনে কেঁপে কেঁপে ওঠে, কখনও বা জমজমার মাদকতায় হেলতে দুলতে সপ্তকের এদিক্ ওদিক্ যেখানে সেখানে নৃত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। শীতের অন্তে বসন্তের আমেজে পত্রপল্লবের মত যেন কথার টুকরাগুলি ঝক্ঝক্ করে উঠে। বসন্ত আর যৌবনসমাগম একসঙ্গে! এদের আভাস ইঙ্গিতে রাগলতিকার বৃন্তে দেখা দেয় গিটকারির গুচ্ছ, আধ-ফুটন্ত ফুলের স্তবকের মত। ললিতাপঞ্চম রাগিণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই ত দেখি বসন্তের চমক! সুরশ্রুতির শিহরণ ত যেন গানের শরীরে যৌবনেরই জাগরণ! এমন আশ্চর্য কখনও দেখিনি, শুনিনি, কল্পনাও করিনি। এ কি বাস্তবিকই ললিতা-পঞ্চমের উন্মত্ত যৌবন-বিভ্রম? না কি, গুণীর হৃদয়ে প্রতিভার উন্মাদনার চরম একটা মূর্তি?

পরে অবসরসময়ে ঐ রকমের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে, মূলে একটি প্রহেলিকার সূত্রকে দু'খণ্ড করে দু'রকম সমস্যা রচনা করা আর দশ রকমের ব্যাখ্যার জাল সৃষ্টি করে তাদের মূল রূপটি আবরণ করে তৃপ্তি পাওয়াটা অনর্থক পরিশ্রম। গুণী, আর তাঁর গুণ, শক্তি ও প্রতিভাকে পৃথক্ করার অর্থ এক চুল চিরে চার চুল করা। এ যেন প্রাণবস্তুর সন্ধান করতে গিয়ে জীয়ন্ত মানুষকে কেটে শত খণ্ড করে, প্রতি খণ্ডের মধ্যে প্রাণকে খুঁজে বার করার চেষ্টা! আসল কথা যা মনে হয়েছে আমার,—অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, তার আলো, তার শিখা, তার ঔজ্জ্বল্য যেমন অগ্নি থেকে পৃথক্, বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, সে রকম গুণীর হৃদয়ে সঙ্কল্প, তাঁর কণ্ঠধ্বনি, আর সেই ধ্বনির বাহনে গান বা রাগরূপের অভিব্যক্তি সেই সঙ্কল্প থেকে পৃথক্, বিচ্ছিন্ন নয়; এরা সমস্ত মিলেই একটা গোটা জিনিষ। গুণীর হৃদয়ে রয়েছে প্রতিভার আগুন; বাইরে থেকে আমদানী-করা কাটা-ছাঁটা শিক্ষার কথা সুর আর ছন্দগুলি বিচিত্র রকমে মিলে মিশে সেই আগুনের জ্বালানির কাজ করে। সকলের শেষে কণ্ঠের সুরে যে আলো দেখা দেয়, সেই আলোই হ'ল চরম কথা। গুণী, গুণীর প্রতিভা, আর এই শিখার দেদীপ্যমান রূপগুলি,—এদের নিয়ে পৃথক্ করে সমস্যা গড়ে তোলা আর তাদের মীমাংসা করতে যাওয়া হল,—ইচ্ছা করে, অনর্থক হাতে কাদা মেখে, পরে কষ্ট করে কচ্‌লে কচ্‌লে ময়লা সাফ করে এক-রকমের তৃপ্তি পাওয়া।

খাঁ সাহেব গানের জাল গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন। "ললিতলবঙ্গলতিকা"র ইন্দ্রজাল অদৃশ্য হয়ে যায় কয়েকটি সরল মধুর হলক্ তানের হিল্লোলে। আমরা ভাবি, না জানি আরও কি খেলা লুকিয়ে আছে খাঁ সাহেবের ঝুলিতে। ক্রমে দেখা দেয় চৌদুনি তালের বিদ্যুৎ-বলয়; রাগের উপযুক্ত অলঙ্কারই এরা। কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে ঝলকে ঝলকে সুরগুলি আরোহ-অবরোহের অলাত-চক্র সৃষ্টি করতে করতে মিলিয়ে যায় "যোবন আয়ে"র মধ্যে; আথেরী তান এরা। অনুভবে বোধ হল, সুরের প্রদীপের শেষ আরতি দিয়ে গানের পূজা সমাপন করেন খাঁ সাহেব। গান সমাপ্ত হল। গানের সমগ্র মহিমার একটা রেশ যেন বিদায় নিতে চায় না আমাদের হৃদয় থেকে, তখনও।

খাঁ সাহেবকে সবিশেষ প্রশংসা করতে পারিনি আমরা; বাক্যের সামর্থ্য নেই বলে। সকলে তাকিয়ে আছি বিশ্বনাথজীর মুখের দিকে। তাঁর চোখ দু'টি আনন্দে ছল-ছল; এরকম চাহনি বড় একটা দেখিনি সেই শ্যেনদৃষ্টির অন্তরে। গদ্‌গদ কণ্ঠে বিশ্বনাথজী বললেন, খাঁ সাহেবের জিহনের (প্রতিভার) পক্ষেই এমনতর আশ্চর্য বে-নজির ব্যাপার সম্ভব হল। খাঁ সাহেব সেই রক্তজবার রংএর মুরেঠা সমেত মাথা নীচু করে যেন প্রশংসা ধরে নিলেন। ভগবানের প্রতি অভিমান করে এই মুরেঠাকে তিনি বাক্‌স-বন্দী করে রেখেছিলেন। পবিত্র অভিমানে মহীয়ান্ এই শিরোভূষণই ত প্রতিভার যোগ্য প্রশস্তি ধারণ করে বয়ে নিয়ে যাবে অন্তরের দেউলে। এক প্রতিভার মুখে অন্য প্রতিভার প্রশংসা আর সাধুবাদ! হৃদয়ের কোন্ গোপন মন্দিরে এই দুই আলোর মিলন ঘটে, আমরা বাইরে থেকে তার রহস্য কীই বা বুঝতে পারি! বিশ্বনাথজী একটি চরম কথা বলেছিলেন,— খাঁ সাহেব! আমি আর বড় বেশী দিন থাকব না। কিন্তু এঁরা থেকে যাবেন অনেক দিন, আর এঁদের ঠোঁটের আগায় আপনার নামওয়ারি চলে যাবে অনেক দিনের রাস্তায়। তারপর সব খতম্! আবার যখন আপনার মত লোক দেখা দেবে দুনিয়ায়, তখন আবার দো-চার রোজের পাল্লায় দুনিয়া হায় হায় করবে।

খাঁ সাহেব তম্বুরার সুর অদল-বদল করে নিয়েছেন, খরজের তার খরজে আর পঞ্চমের তার মধ্যমে। আসর গম্‌গম্ করতে থাকে যুগল তম্বুরার সুর—মধ্যমের মধুর সংবাদে। বিশ্বনাথজী বল্‌লেন, "আমাদের খাঁ সাহেব ত মালকোশে সিদ্ধ!" আমি ভাবলাম, সিদ্ধির আর কী নমুনা বাকী থাকতে পারে! সত্য সত্যই খাঁ সাহেব আরম্ভ করলেন মালকোশ রাগের একটি পদ "পগ্‌লাগন দে", মধ্য লয়ের তেতালায় আর বিনা উপক্রমণিকায়। জীবনে এই গানটি প্রথম শুনলাম। পরেও শুনেছি কয়েক বার, কিন্তু প্রথম পরিচয়টি যেন শেষ পরিচয় হয়ে আছে, এ পর্যন্ত সময়ে।

আরম্ভেই মুদারার মধ্যমস্বরে দুই গমকের মাণিকজোড়। পরেই একটি সূত্, যেন সুরশৃঙ্গারের ধ্বনির মতো চিকণ উজ্জ্বল রেখা নীচে নেমে এসে উদরার কোমল নিষাদের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষাদকে কয়েদ্ করেই নিয়ে চলে যায় কোমল ধৈবতের অপ্রমেয় সীমান্তে। এর পরেই বাণী ও

সুর একসঙ্গে সপ্রতিভ সঞ্চারে ফিরে এসে দাঁড়ায় ষড়্জে; সমের মন্দিরে রাগবিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়ে যায়। ঐ জোড়-গমক আর সুতে সুচারু চরণ-ক্ষেপ আর প্রকাশভঙ্গিমা ত ভুলতে পারিনি। পরে মজিদ্ খাঁ সাহেবের বীণাবাদন শুনে মনে মনে তর্ক করেছি, বীণ্কার গুণীরাই কি গায়ক গুণীদের কণ্ঠ থেকে কিছু কিছু ধ্বনি তুলে নেন তাঁদের আঙ্গুলে? না, কি গুণী গায়কেরাই বীণাবিনোদলহরীর কিছু অমৃত আকণ্ঠ পান করে সঞ্চয় করেন হৃদয়ের আধারে, গীতসুধার অভিনব ধারায় যেটা উছলে পড়ে গানের সময়ে? রামের গুরু শিব, না শিবের গুরু রাম! মজিদ্ খাঁ সাহেবকে, কালে খাঁ সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, কালে খাঁ সাহেবকে তিনি ত জানেন না, তিনি বন্দে আলি খাঁ সাহেব বীণ্কারের শাগিরদ্। যাই হ'ক, এসব কথা ভাবতে ভাবতে পরে মনে হয়েছে, কণ্ঠশিল্পী আর বাদ্যশিল্পী, এঁদের মধ্যে কে উত্তমর্ণ আর কে অধমর্ণ, এবিষয়ে পাছে তর্ক-কলহ হয়, এ জন্যই ত দেবী সরস্বতী একাধারে বাগ্বাদিনী ও বীণাধারিণী হয়ে আমাদের ধ্যানে আবির্ভূত হন; ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার তিমির অপসৃত হ'ক আমাদের চোখের সামনে থেকে। প্রতিভা বস্তুটি ধার করা যায় না, ধার দেওয়া যায় না। উপস্থিত, কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের সুত-গমকের লহরী উছলে পড়ে স্মৃতির মধ্যে; যেন প্রণয়ী-জনের কোমল করাবঘাত সঙ্কেত দিয়ে স্মৃতির লহরী বলতে থাকে—আপাতত রমণীয় বস্তুর দিকেই তোমার লক্ষ্য রাখো, ইতিহাসের শুষ্ক হাস্য তোমার কাজে লাগছে না।

সঙ্কেতটা বুঝেই কালে খাঁ সাহেবের গানের দিকে মন দেই। কিন্তু এ কি! "পগ্লাগন দে" দিয়ে আরম্ভ করে মুহরাটি কায়েম হতে না হতেই একটি সপাট তান হয়ে গেল তড়িৎগতিতে। এর পরে গানের পূর্ণ স্থায়ী পদটি দেখা দিল যেন ঝড়ের আগে কাক-চিলের মত; যে যেমন করে পারে, সেই অন্য শব্দগুলি এলোমেলো হয়ে পালিয়ে ঘরে ফিরতে পারলে যেন বাঁচে, এমন তাদের অবস্থা! হঠাৎ এমন ভাবে সুরের ঝড় উঠ্ল যে, অন্য কথাগুলি তাদের রূপ বজায় রেখে পরিচয়ই দিতে পারল না! খাঁ সাহেবের হৃদয়ে সুর আর ছন্দের একটা অভিনব উত্তেজনা এসেছে, বুঝলাম তাঁর চোখ-মুখের উদগ্র উল্লসিত ভাব দেখে, তাঁর কণ্ঠধ্বনির আকুল আবেদন অনুভব ক'রে। সাধারণত মধ্যলয়ের ছন্দে গানের আর সঙ্গতের গুরুলঘু

শব্দগুলি শ্রোতার মনে মাত্রার একটা চেতনা জাগিয়ে রাখে ; নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই শ্রোতার মনে আশা আর প্রত্যাশাগুলি আনাগোনা করে ; কাল পূর্ণ হ'লে চলে যায়, আবার ফিরে আসে এরা। গানের আরম্ভেই ধ্বনি আর ছন্দের এই আশা-প্রত্যাশাগুলি যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। খাঁ সাহেব তাদের পিষে বেঁটে রগড়ে সুর আর ছন্দের নূতন সাজে সাজিয়ে রচনা করতে থাকেন রূপগুলি ; আর বিদায় করে দেন মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের মনপ্রাণ ভরে গেল সুর ও ছন্দের মধুর উতরোলে। কথাগুলি এল, কি এল না, কি চলে গেল, এদিকে আমাদের কানই নেই। ঝড়ের সৌন্দর্যে যখন প্রাণ ভ'রে ওঠে, তখন কি প্রজাপতির সুযোগ দুর্যোগের কথা ভাবতে পারি !

আরম্ভ হ'ল মোটা মোটা সুরের দানা দিয়ে হর্‌কতের পর হর্‌কত ; তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় গমক-লাগান সুরের ফিরত্‌ আর ফিকর্‌-বন্দী চক্রগুলি ; সুরের দলেরা হুড়মুড়্‌ করে ঘুরে বেড়ায় মুহরার এ পাশে ও পাশে ! ছন্দের দোলা ত যেন ঝড়ের দাপটে তাল-তমাল-শালবনের মাথাগুলির এদিক্‌ ওদিক্‌ উলট্‌-পাক্‌ খাওয়া ; অথচ যে যেমন, সে তেমনই থাকে সুরের ঝড় চ'লে গেলে ! হঠাৎ মনে হয়, সুরের ঝড়ের মধ্যে মুহরাটি এবার উড়তে উড়তে এসেই পড়ে ; কিন্তু আসে না। আমরা যখন ভাবতেই পারিনে—গানের মুহরা এসে পড়বে, তখন চকিতে ছুটে এসে পড়ে সেটা ; যেন ভয়ে আসরের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পেরেছে বলে আমরা যে তাকে একটু আদর আপ্যায়িত করব, এমন অবকাশও পাইনে ; কারণ, সেই দুর্দান্ত ছেলেটি নির্ভয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সুর ও ছন্দের সংগ্রাম এলাকায়, হুঙ্কার দাপট আর কলরোলের মধ্যে। ঘরে ফিরে আসাটা তার যেন চাতুরী, ছলনা, অভিনয় ! সুরের অবিরল ধারা আমাদের শ্রবণকে প্লাবিত করে রাখে, শ্রাবণের বর্ষণের মতো ! মনের আকাশে আলোচনার ছিদ্র নেই, অবকাশ নেই।

মধ্যলয়ে ছিল গানের আরম্ভ। গতিবেগের উত্তেজনায় এখন গানের মেঘমালা যেন উড়ে চলে দ্রুত মান-লয়ের পাখা মেলে। ছন্দের দোলায় দোলায় বয়ে যায় সুরের প্লাবন, অতর্কিতে দেখা দেয় তানের তুফান। এক একটি পর্যায় শেষ হয় হলক্‌ তানের বাহার দিয়ে, ঝড়ের অবকাশে বিদ্যুতের ঝলকের

সঙ্গে মেঘের গুড়্‌গুড়্‌ ধ্বনির মতো। রুক্ষতার লেশমাত্র নেই এই হলকের মেঘধ্বনির মধ্যে। মধুর সুরে ভেজান এরা, এই হলকের দল তিন সপ্তকের দিক্‌-বিদিক্‌ ছুটে যায় আর ফিরে আসে। এরা যে সুরে ভেজান, বেশ বুঝতে পারি অনুভবের মাধুর্য দিয়ে; শুধ্‌ন ধোঁয়া বা বাষ্পের কুণ্ডলী নয় এরা! মধুর আওয়াজের এই হলক তানের দৃষ্টান্ত কোথায় পাই! কল্পনা করি, বীণার তারে আঙ্গুলের এক দবাওটে যদি দেড় সপ্তক সুরে মীড়-মূর্ছনা সম্ভব হ'ত, তা হ'লে বলতাম, কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের হলক্‌ সেই বীণার হলকের মত। প্রসঙ্গত বলি, সাধারণভাবে গীতশিল্পীদের মুখে হলক্‌ তানের চেষ্টা ও শেষ ফল দেখে বুঝেছি,—হলক্‌ তানের চমৎকারিত্ব নির্ভর করছে শিল্পীর কণ্ঠে মাধুর্যের পুঁজির উপর। হলকের ধাক্কা আর হাওয়া, জোরজবরদস্ত হ'লেই কণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্যকে খেয়ে ফেলে তারা, এক দমে। যাঁদের কণ্ঠে মাধুর্যের পুঁজি অল্প, তাঁদের পক্ষে হলক্‌ তানের প্রয়াসের অর্থ মাধুর্যের বিষয়ে দেউলে হয়ে হাহাকার করতে করতে ঘরে ফেরা। কণ্ঠস্বরে নাকীভাব (অর্থাৎ অনুনাসিকত্ব) থাকলে হলকের কারবারে একেবারে দেউলে হওয়া থেকে কিছু পরিত্রাণ হয়; এর নিদর্শনও আছে। কিন্তু, গানের অন্য সব কারবারে সেই নাকী সুরগুলি কণ্ঠে স্বভাবমাধুর্যের পক্ষে ভেজালের মত শোনায়, যেন মধুর সঙ্গে নলেন-গুড়ের ভেজাল; আর তম্বুরার সহযোগে সেই ভেজালের ঝাঁঝটাও বেশ ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গের খাতিরেই বলি, কালে খাঁ সাহেবের হলক্‌ তানগুলি আমাকে অন্য এক গুণীর কথা স্মরণ করায়; ইনি হ'লেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব। এঁর মুখে "কঙ্গন মুদরিয়া" মুলতান রাগের গানেই অন্যতম উৎকৃষ্ট হলকের পরিচয় পেয়েছিলাম। হলক্‌ তানের যথার্থ বাহার খুলেছে অনুভব হলেই আমি বুঝি, শিল্পীর বুক-ভরা দম্‌ আছে, কণ্ঠভরা মাধুর্য আছে, আর আছে চীৎকার প্রবৃত্তি দমন করার সুবুদ্ধি আর সামর্থ্য। কিন্নরকণ্ঠী বাঈজীরা যে হলকের প্রয়াস করেন না, তার একমাত্র কারণ আমি বুঝি, তাঁরা মাধুর্যের পুঁজি দিয়ে হলকের কারবারে ফাটকাবাজী করার মত ইচ্ছা বা সাহস রাখেন না। সে কালের জোহরা বাঈজী এর একমাত্র ব্যতিক্রম এবং এই ব্যতিক্রমের কারণে গুণীমহলে তিনি যথেষ্ট যশ অর্জন করেছিলেন, এমন কথা আমি শুনেছি শ্যামলালজী, বদল্‌ খাঁ সাহেব এবং রাণাঘাটনিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক নগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে। জোহরা বাঈজী রেকর্ডে যে

সব গান পরিবেশন করে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে "আল্‌লা জানে" (টোড়ি রাগ) ও "ধেতেলে দের্‌ তনন" (ভূপালী রাগের তেরানা) শুনেই বুঝতে পারা যায়, ও কথা কতখানি সত্য ; অনুমানও করা যায়—মধুর বামাকণ্ঠে হলকের সৌন্দর্য কতো বিচিত্র ও মধুর হ'তে পারে।

কালে খাঁ সাহেবের গানে ফিরে আসি ; এই গান অর্থাৎ আগাগোড়া ছন্দের দোলনদার স্তম্ভগুলির উপরে ভর করা সুরের বিরাট্‌ ছাওনি। ছাওনির শিরায় শিরায় কথা বা কথার টুকরাগুলি এমন ভাবে মিশিয়ে আছে যে, ছাওনি চিরে তাদের বেছে নিয়ে জোড়াতাড়া দিতে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। সম্প্রতি এরকমের কাজে অপারগ হয়েছি আমরা। সেই মহান্‌ দোদুল্যমান রাগরূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা বসে থাকি সম্মোহিতের মতো। সুর আর ছন্দের প্রাণে জেগেছে উল্লাস-তাণ্ডবের উত্তেজনা ; আমরা অন্তরে শুনি মল্‌ল-কৌশিকের পিনাকনিস্বন আর ডমরুধ্বনি।

অকস্মাৎ থেমে যায় সুর-ছন্দের তাণ্ডবলীলা ; আমাদের চমক ভাঙ্গে অবকাশের আঘাতে। সুরের রেশ আর ছন্দের দোলা প্রহরীর মতো জেগে আছে ; এদের সাবধানবাণী শুনি তম্বুরার গুঞ্জনে, পদধ্বনি শুনি সঙ্গতের মাত্রায় মাত্রায়। গুণীর হৃদয়ে কখন্‌ কোন্‌ সঙ্কল্পের আগুন জ্বলে ওঠে, কিছু ত জানা যায় না। খাঁ সাহেব যেন আমাদের প্রস্তুত হওয়ার অবসর দিলেন, মুহূর্তের জন্য।

এমনি সতর্ক অবকাশের কোন এক মুহূর্তে যেন জ্বলন্ত সুররেখার মতো একটি সূত্‌ সহসা দেখা দেয় আমাদের শ্রবণের আকাশে, কোথা হ'তে সেটা উদয় হ'ল জানিনি। সেই জ্যোতির্ময়ী রেখা যখন চলে গিয়ে দাঁড়াল তার-সপ্তকের মধ্যম স্বরে, তখন মনে হল যেন একটা উল্‌কাপিণ্ড উড়ে যেতে যেতে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আপন দীপ্তির ধ্যানে, আপন প্রভায় আপনিই মোহিত হ'য়ে। অপরূপ সেই 'তারা'র মধ্যম আর তার আলো! আমাদের অন্তরে এর রশ্মিচ্ছটা তখনও ম্লান হয়নি, আমাদের ধ্যান কল্পনা তখনও পরিতৃপ্ত হয়নি, এমন সময়ে চমক্‌ দিয়ে উঠতে থাকে অবরোহের সুরনক্ষত্রগুলি ; আর শেষে দেখা দেয় মুদারার মধ্যম স্বর, সমুজ্জ্বল একটি তারকার মতো। মুদারার মধ্যমে আমাদের শ্রুতির ধ্যান স্থির হ'তে না হ'তেই সুরের পাঁতি ছুটে চলে যায় উদারার মধ্যগগনে। মনে হ'ল, রাগের একটি জ্যোতিষ্মান্‌ সূত্র

দিয়ে রচিত সুরের হারাবলী তার-সপ্তকের দিগন্ত থেকে প্রলম্বিত হয়ে এল উদারার গগনে; সেই উল্কার স্বরূপ তখনও সপ্রভ ও প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে আমাদের মনে। সুরের হারে মুদারার মধ্যমের রক্তরাগমণি! অপূর্ব এই মণিমালার শোভা আর সৌন্দর্য!

প্রতি বার নূতন রকমের সূক্ষ্ম সুত্ দিয়ে সুরের অভিনব জ্যোতির্মাল্য রচনা করেন গুণী; বার বার এই হার পরিয়ে দেন রাগরাজ মালকোশের কণ্ঠে! এর পর আর কী হ'তে পারে, কী হবে, কীই বা হওয়া উচিত, কিছুই কল্পনা করিনি, কিছুই প্রত্যাশা করিনি। মুহূর্ত কয়েকের জন্য কথা-সুর ও ছন্দের আলোড়ন থেমে যায়। আমাদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হ'ল যেন রাগের একটি সমাহিত যোগমগ্ন স্বরূপ; তার-মধ্যমের রক্তললাটিকা তখনও যেন ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠছে, কণ্ঠ ও বক্ষ যেন ঈষৎ অন্দোলিত হয়ে উঠছে সুরের হারাবলীর আলিঙ্গনে।

আমরা ভাবছি, গানের মুহ্‌রাটি এবার না-জানি কেমন রূপে দেখা দেয়। এমন সময়ে আচম্বিতে দেখা দিল বড় বড় পাল্‌লার গমক; বিস্ময়কর উদ্‌ভ্রান্তিকর সে এক ব্যাপার!

আভাসে মনে পড়ে, উদারার ষড়্‌জ আর মধ্যমের মাঝামাঝি কোনও সুর থেকে এদের উদ্ভব আর অভিযান শুরু হ'ল আর তার-সপ্তকের মধ্যমের শ্রুতির দুয়ারে যেন তিন চার বার ধাক্কা দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে ফিরে এল আবার সেই উদারার মধ্যমের এলাকায়। নিমেষের বিরামান্তে আবার আরম্ভ হ'ল এই যুগল সুরের বিরাট্ হিন্দোলগুলি; আবার এরা প্রমত্তের মত চলে যায় তার-সপ্তকে, আর যেন মধ্যমের ঘরে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে ফিরে আসে উদারার মধ্যমে। দ্বিতীয় বার যখন এই ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে, তখন আমার মনে হল, যেন সঙ্গীত-নিকুঞ্জের আলোগুলি, দুয়ার-জানালা সবকিছু দুলে উঠছে সেই গমকের দোলে, যেন সুরের ভূমিকম্পই দেখা দিচ্ছে থেকে থেকে। মনে হল আমি নিজেই দুলছি। সেই বিহ্বল অবস্থায় খাঁ সাহেবের দিকে চাইলাম। অদ্ভুত এক রকম আবেদনের আগুন খেলছে তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠছে, আর সেই মুরেঠা সমেত সর্বদেহটি দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে গমকের পর্বে পর্বে! বাইরের জগতের জ্ঞান যেন তাঁর নেই। পরে এই স্বরূপটি স্মরণ করলেই মনে হয়,

ভিতরের জ্ঞান ছিল কি না বুঝিনি, কিন্তু ভিতরে জ্বলে উঠেছিল আগুন। কালে খাঁ সাহেব মালকোশ রাগে সিদ্ধ, এমন কথা বল্‌লেন বিশ্বনাথজী। আমার ধারণা, খাঁ সাহেব সিদ্ধ মাত্র নন; তিনি রাগের অগ্নিতে বিদগ্ধ একটি সত্তা। স্মৃতির আলোয় ক্ষণে ক্ষণে রাগাবেশের এই মূর্তিমান্ বিগ্রহ দেখা দেয়, এখনও। এখনও দেখি, কালে খাঁ সাহেবের জীবন্ত ছবি, সেই নীল কুরতার উপর তারা-কাটা নক্‌শা, আর সেই রক্তজবা রংএর মুরেঠা। কিন্তু এই গানটির কথা মনে হলে যেন দেখি সেই দেহ, সেই পরিধেয়, সেই মুরেঠা;—সমস্ত মিলে গিয়েছে যেন মালকোশ রাগের স্বরূপে, আর স্বরূপটি দুলে উঠছে গমকের দোলায়।

মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে এ যাবৎ। কদাচিৎ ঐ অভূতপূর্ব ব্যাপারের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি চমকিত হয়ে সে সব দিনের বিচিত্র কথা স্মরণ করেন আর বলেন—"পাঁচুবাবু! এসব কথা এখন মনে করেই আনন্দ পাই, আর সেই আনন্দটাই একটা মস্ত উপরি পাওনা আজকের দিনে, আসলের উপর সুদের মত। মাঝে মাঝে একটু আধটু গান আর সুরও শুনি; নূতন নূতন গুণীর নূতন নূতন কারিগরীও দেখি মোহিত হয়ে। কিন্তু মনে হয়, যেমনটি হয়ে গিয়েছে, তেমনটি আর ত হয় না।"

এই সেই তান, যার কথা শ্যামলালজী আর বদল্ খাঁ সাহেবকে বলতেই তাঁরা বল্‌লেন, "হাঁ হাঁ, এ ত লরজ্‌দার তান।" আর বদল্ খাঁ সাহেব তখনই হড়বড় করে কত কী বলে গেলেন। সার কথা হ'ল—বীণ্‌কারদের ঘরে, বিশেষ করে বন্দে আলি খাঁ সাহেবের ঘরে এর কায়দা প্রচলিত আছে বটে, তবে এ জমানার গায়কেরা এ রকম তানের প্রয়াস করেন না; কারণ, একবার যদি গাইতে বসে এ তান বেসুরা হয়ে যায়, তা হলে সেই গায়ক হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় তার লক্‌বা (পক্ষাঘাত) রোগ হয়ে যাবে, অথবা মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকবে। এ জমানায় রামপুরনিবাসী মুস্তাক হুসেন আর একজন গুণী, যিনি কণ্ঠে এই কাজ হাঁসিল করতে পারেন ইত্যাদি। এত খবরও রাখতেন বদল্ খাঁ সাহেব! শ্যামলালজীও ঐ মুস্তাক হুসেন খাঁ ও তাঁর সম্প্রদায়ের গুণীদের ভাল খবরই রাখতেন; কিন্তু মুস্তাক হুসেন খাঁ এই লরজ্‌দার তানের কায়দা গান করে দেখাতে পারেন, এ কথা শ্যামলালজীও প্রথম শুনলেন খলিফা বদল্ খাঁ সাহেবের মুখে।

মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবের সম্বন্ধে প্রসঙ্গ বিস্তার করব না; মাত্র এই কথা বলি যে, অনেক বৎসর পরে শ্যামলালজীর বৈঠকে বসে এবং শ্যামলালজী, বদল্ খাঁ সাহেব প্রভৃতি সমঝ্‌দারদের সামনে মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব সেই অদ্ভুত লরজ্‌দার তানের নমুনা দেখিয়েছিলেন। আমার জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার পক্ষে মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবই দু নম্বরের গুণী, যাঁর মুখে লরজ্‌দার তান শুনেছি। ভারতের সমস্ত গুণীর গান ত আমি শুনিনি; অতএব এ কথা বলতে পারিনে যে, অন্য আর কেউ লরজ্‌দার তান করতে পারেন না। বরং এখনকার দিনে এমন একজন ধুরন্ধর খেয়ালী রয়েছেন, যাঁর কণ্ঠের সামর্থ্য ও শিল্প-পরিবেশনের চাতুর্য দেখে মনে হয়, তিনি এই তান পরিবেশন করতে পারেন। শুধু তাই নয়; তিনি ইতিমধ্যেই একাধিক বার এমন কিছু তান রচনা করে শুনিয়েছেন, যার ছবি লরজ্‌দারের খুব কাছাকাছি বলে বোধ হয়েছে। এই গুণীর নাম শ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুর। এঁর খ্যাতি ভারতেরও বাইরে চলে গিয়েছে।

যাই হ'ক, সেই সুরের ভূমিকম্পের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। আবার মনে পড়ে যায়, ইন্দোরনিবাসী মজিদ্ খাঁ সাহেব বীণ্‌কারের কথা। এই প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারিনে।

শ্যামলালজীর বৈঠকে মজিদ্ খাঁ সাহেবের মাইফেল; ইং ১৯১৯ সালের কথা। বীণার আওয়াজ যতো বা মৃদু ততো বা মধুর। শ্যামলালজী, আমি, গিরিজাবাবু, তন্নুলালজী, বদল্ খাঁ সাহেব, ননী ও ঠাণ্ডীরাম—গুণীর খুব নিকটে বসে; প্রথম তিন জন গুণীর মুখোমুখী হয়ে বসে; যেন সূত্‌মীড়ের একটি কাজও ফস্‌কে না যায় কান থেকে; আর পুরোপুরি আদায় করতেই হবে, কারণ, কয়েকদিন আগে মজিদ্ খাঁ সাহেবের বাজনা শুনে বুঝলাম, তিনি সেই ধরণের গুণী, যাঁরা একটি 'কাজ,' বিনা প্রার্থনায়, কখনও দু'বার করে দেখান না। শ্রবণের আগ্রহে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। বাহ্য জ্ঞান লোপ হয়েছে, জগৎ বলতে দরবারীর বিলম্‌পদের শ্রব্যরূপ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। বিলম্‌পদ শেষ হয়ে সহসা দেখা দিল যোড়ের কাজ। যোড়ের কাজগুলি জমে এসেছে, এমন সময়ে খাঁ সাহেব অকস্মাৎ এমন ধরণের একটি গমক্-যোড় জাহির করলেন যে, আমরা তিন জন চমকে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে বসলাম। খাঁ সাহেব "লরজের" যোড় শুরু করেই একটি লম্বা তানকে

তিন সপ্তকের পাল্লায় ছুটিয়ে আর নাচিয়ে একেবারে খাদের খরজের নীচে বৃদ্ধ খরজের পঞ্চমে এসে বারকতক দোলা দিলেন। আমাদের মনে হল, যেন দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে; আর উপরে ঝোলান ঝাড়লণ্ঠনটি যেন দুলছে। তানের শেষে মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল, কালে খাঁ সাহেবের মুখে লরজের রূপ, আর বদল্ খাঁ সাহেবের মন্তব্য, যেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তানটি একবার শেষ হ'তেই বাবুজী খাঁ সাহেবকে আর একবার ঐ কাজটি করতে বল্লেন। খাঁ সাহেব মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বাবুজীর প্রতি আদাবের ইঙ্গিত জানিয়ে দ্বিতীয় বার এবং বিনা বিশ্রামে তৃতীয় বার সেই একই ব্যাপার কমাল্ করে দেখালেন। ঠাণ্ডীরাম এই তৃতীয় বার আবৃত্তির শেষে থাকতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে "হোয়্ হোয়্" শব্দে আওয়াজ করে উঠল। বাবুজী খাঁ সাহেবকে অল্পক্ষণের জন্য বিরাম নিতে অনুরোধ করে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটি সবুজ রংএর রেশমী দু-পাট্টা বার করে নিয়ে এলেন; খাঁ সাহেবের ডান হাতখানি ধরে তার উপরে সেই দু-পাট্টাখানি রেখে বল্লেন, "এটা আপনার ইনাম নয়, এটা ঐ চার-আঙ্গুলের মেহনতের যৎসামান্য একটা সেলামী মাত্র বলে মনে করবেন, জী হাঁ।" চার আঙ্গুল অর্থাৎ ডান হাতের আর বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমাদের যুগল। খাঁ সাহেব বীণাটি ফরাশের উপর নামিয়ে দু' হাতে বাবুজীকে আর অন্যদের বার বার আদাব জানিয়ে বীরাসনে বসে আবার সারস্বত যন্ত্রটিকে ঘাড়ে তুলে নিলেন। গুণীর আঙ্গুল রক্তমাংসেরই আঙ্গুল। কিন্তু অদ্ভুত সে সব মুহূর্ত, যখন ঐ আঙ্গুলে অলৌকিক সারস্বত বহ্নির দু'একটি লেলিহমান সুরশিখা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আর রাগের অনন্যসাধারণ রূপকে উদ্‌ভাসিত করে মুহূর্তেরই জন্য। শ্যামলালজীর গুরু গণপত রাও ভাইয়া সাহেব বন্দে আলি খাঁ বীণকারের পরম বন্ধু ছিলেন, অধিকন্তু তিনি বন্দে আলি খাঁ সাহেবের কাছে বীণার তালিমও নিয়েছিলেন। অতএব শ্যামলালজী ও মজিদ্ খাঁ সাহেবের সম্বন্ধ ছিল শিষ্য ও গুরুপর্যায়ের সমান। আমরা সকলেই দেখলাম, বাবুজী যেন ঐ সম্বন্ধের খাতিরে প্রণামী নিবেদন করলেন। কিন্তু পরে মজিদ্ খাঁ সাহেবের কৃতিত্বের সমধিক পরিচয় পেয়ে আমার মনে হয়েছিল, ঐ নজ্‌রানা একটা বাহিরের কথা মাত্র। ভিতরের কথাটা ছিল, গুণীর হাতের আঙ্গুল ছুঁয়ে সদ্য সদ্য সেই অগ্নিশিখার কিছু তাপ গ্রহণ করা, যেমন করে আরতির শেষে পঞ্চপ্রদীপ থেকে আমরা তাপ নেই আর সেই তাপটা মুখে

চোখে গায়ে মেখে নেই। সত্য কথা বলতে এখন লজ্জা নেই, সে দিন সে মুহূর্তে আমার মনে ইচ্ছে হয়েছিল, গুণীর সেই তান-তাজা আঙ্গুলগুলি একবার ছুঁয়ে দেখি; কিন্তু লজ্জায় পারিনি সে কথা বলতে। রিক্ত হৃদয় না হলেও আমি যে রিক্তহস্ত! পরে অন্য একদিন,—মজিদ্ খাঁ সাহেব যখন যোগিয়া রাগের আলাপ করেছিলেন, সে দিন লজ্জাকে জয় করে গুণীর আঙ্গুল ছুঁয়ে দেখেছিলাম, তাপও অনুভবে তুলে নিয়েছিলাম। নানা রকমের তাপ নিয়েছি জীবনে। মধুর তাপ-গুলি মনে ধরে নেই। এগুলি এখন দেখা দেয় অনুতাপের রূপে, কারণ, তপস্যা ত আমার হয়নি।

মজিদ্ খাঁ সাহেবের আঙ্গুলে লরজ্দার তান শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছিল, কালে খাঁ সাহেব নিশ্চয় তাঁর বীণাতে গমক ও লরজের পরীক্ষা ও অভ্যাস করেছিলেন, যার ফলে তাঁর কণ্ঠে গমক ও লরজের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য একসঙ্গে দেখা দিয়েছিল। আরও মনে হয়েছে, কালে খাঁ সাহেব যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বীণকার মনে করতেন, তার মূলে সম্ভবত ঐ গমক-লরজ্দার যোড় বিষয়ে সাধনা ও সিদ্ধির আত্মপ্রত্যয় একটা দেখা দিত তীব্রভাবে। এ কথা বলতে পারি, মজিদ্ খাঁ সাহেব ছাড়া অন্য দ্বিতীয় কোনও যন্ত্রীকে লরজ্দার তানের চেষ্টা করতে দেখিনি। তবে সবিনয় নিবেদন করি, আমি ভারতের সমস্ত যন্ত্রী বা বীণ্কারদের বাজনা শুনিনি।

মজিদ্ খাঁ সাহেবের আঙ্গুল থেকে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠে 'পগ্লাগন দে' গানে ফিরে যাই। কিন্তু বিশেষ লাভ আর নেই। স্মৃতির খসড়া-লিপি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে দেখি, সেই লরজ্দার তান গানের অবশেষ সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে রেখেছে, যেমন চন্দ্রিকা নিষ্প্রভ করে দেয় নক্ষত্র-তারকার ঝিকিমিকি। সুরের কিছু ছায়ারূপ অস্ফুট রেখাবর্ণের ছবির মতো আভাস দেয়। অস্পষ্টভাবে মনে রেখেছি, 'পগ্লাগন্ দে' গানটি আরও কিছুক্ষণ চলেছিল; খাঁ সাহেব কিছু কিছু চক্করদার চৌদুনি তানের খেলা দেখিয়েছিলেন। গানের স্মৃতি বলতে যে মহল্লা এতক্ষণ আমাকে চমৎকৃত করে রেখেছিল, তার অন্য সমস্ত ঘর যেন শূন্য আর অন্ধকার।

এর পরেই স্মৃতিতে আঁকা রয়েছে, সঙ্গীতের সাক্ষাৎ অবধূত সেই কালে খাঁ সাহেবকে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করান হ'ল; বিশ্বনাথজী, মহারাজকুমার, ননী ও আমি সেখানে উপস্থিত রয়েছি।

এর পরেই মনে পড়ছে—বিশ্বনাথজী, খাঁ সাহেব আর সঙ্গতীয়া ভদ্রলোকটি কুমারের মোটরে উঠে বিদায়ী নমস্কার জানাচ্ছেন। মোটরখানি যখন নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, তখন আমার মনে হ'ল, যেন সঙ্গীতের আসরের জোড়া কলেজাই ছিটকে বার হয়ে গেল।

পরের পরের দিন খাঁ সাহেবের ডেরায় গিয়ে দেখি—ঘর তালাবন্ধ। করিমের কাছে গেলাম। করিম বল্‌ল, খাঁ সাহেব কাল ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন।

এর পর, খাঁ সাহেবের কোনও পাত্তা পাইনি আমি।

আমার জীবনের আকাশে মাত্র দু'দিনের প্রত্যক্ষে কালে খাঁ সাহেব দেখা দিলেন আর চলে গেলেন, তেজঃপুঞ্জ উল্কার মতো। সেই উড়ন্ত আগুনের ভস্মাবশেষ কিছু কিছু উড়ে এসে পড়ে আমার অভিজ্ঞতায়! এগুলিকে উপেক্ষা করিনে আমি। প্রতিভার পক্ষে যেটা ভস্মাবশেষ, আমার পক্ষে সেটা স্মৃতির বিভূতি মনে করেছি।

শ্যামলালজী ফিরে এলে সমস্ত কথা বল্‌লাম তাঁকে। খাঁ সাহেবের চরিত্রের দু'একটি অসঙ্গতির প্রসঙ্গ হ'লে শ্যামলালজী আমার তর্ক ও সন্দেহকে নিরস্ত করে দিলেন; বল্‌লেন,—গহ্‌রের প্রতি খাঁ সাহেবের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আর কামনারহিত একটা প্রশংসার দৃষ্টি। গহ্‌রের গানের প্রতিভাই খাঁ সাহেবের হৃদয়কে আকুলিত করেছিল। কিন্তু, কিছু বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কারও ছিল খাঁ সাহেবের হৃদয়ে, যে কারণে তিনি গহ্‌রের অনুনয় ও সংস্রব এড়িয়ে গিয়েছেন। গহ্‌র কতো বার তাঁর কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল যে, তিনি কলিকাতায় থাকার কালে গহ্‌রের বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি ও মুর্‌শিদের মতোই থাকুন। খাঁ সাহেব সে কথা কাণে ধরেননি। অথচ তিনি গহ্‌রের প্রস্তাবে সম্মত হ'লে তাঁর বসবাস আহারাদির জন্য দুশ্চিন্তা করতে হ'ত না। এমন একটা বাঞ্ছিত সুযোগকে তিনি উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন; এইটেই ছিল সম্ভবতঃ তাঁর আন্তরিক দুঃখ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের মূলে।

'চৌধুরান্' প্রসঙ্গে আমার মিথ্যা রচনার কথা শুনে তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, মিথ্যাটা সত্যের কান ঘেসে ছুটে গিয়েছে। চৌধুরান্ বিখ্যাত নর্তকী; বিন্দাদীনের শাগির্‌দ্। দুলীচাঁদের বাড়ীতে একবার চৌধুরানের নাচ ও কালে খাঁর গান হয়েছিল এক জলসায়। কিন্তু গহ্‌র ছিলই

না সেখানে। কালে খাঁ সম্ভবতঃ আপনার (লেখকের) মতো চেহারাওয়ালা কাউকে নজর করেছিলেন, তাইতে ঐ প্রশ্নটি তাঁর মনে হয়েছিল। খাঁ সাহেব কল্পনাও করেননি যে, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আপনি গহ্বর আর আমাকে (শ্যামলালজীকে) জড়িয়ে একটা মিথ্যা সংবাদ দেবেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমি (শ্যামলালজী) তাঁর সেদিনকার জলসায় গানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য করেছিলাম কি না।

ফিরোজ্ পাথরের চাকৃতির প্রসঙ্গ করতেই শ্যামলালজী হাসতে হাসতে কপালে হাত ছুঁয়ে পাশের ক্যাশবাক্স খুলে তার ভিতর থেকে একটি সযত্নে রক্ষিত মখমলমোড়া প্যাকেট বার করলেন; তার প্যাকেট থেকে বার হ'ল একটি ফিরোজ পাথরের চাকৃতি। শ্যামলালজী বল্লেন,—তাঁর একটা পুরানা বেমারী, সেকালের ডাক্তার হ্যারিস-লিউকিস্ সাহেবরা যাকে 'প্যারেকসিজ্মাল ট্যাকিকার্ডিয়া' বলতেন, সেই রোগের প্রতিকারকল্পে হাকিম অজ্মল্ খাঁ সাহেব এই ফিরোজ পাথরখানি উপহার দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম,—এই পাথরখানি নিয়ে তিনখানি হ'ল!

শ্যামলালজীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম—মৌজুদ্দীন, বশীর, জঙ্গীর মতো এই গুণীকে আপনার এখানে আশ্রয় দিলেন না কেন, তখন তিনি বল্লেন, কালে খাঁ অত্যন্ত খাম্‌খেয়ালী আজব প্রকৃতির লোক, কখন্ কোথায় যায় আসে, কিছুরই ঠিক নেই; অমন লোককে আশ্রয় দেওয়া সুবিধা নয়। মৌজুদ্দিন বশীর জঙ্গীরা আমার কথা মানে, সম্বন্ধের কারণে; সভ্যভব্য হয়ে মজলিশে বসে। কিন্তু কালে খাঁ ত সে ধরণের লোক নয়। দুলীচাঁদ একবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সুবিধা না হ'য়ে অসুবিধাই ঘটেছিল।

মনে ভাবি এখন, সুরের এই বিদগ্ধ পুরুষ, রাগের এই বিচিত্র অবধূত আরও কতো জনের হৃদয়ে কতো রকমের রেখা লিখে রেখে গিয়েছেন, কে জানে। সমস্ত রেখাগুলি একত্র করে হয় ত পরিপূর্ণ একটা জীবনগতির চিত্র ফলিত হ'তে পারত। প্রতি মানুষের অন্তরের জীবন ত এক একটা গান; প্রত্যেকের গানের স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ভোগ আভোগ আছে নিশ্চয়।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, বিশেষ করে কালে খাঁর মত অবধূতের জীবনের পক্ষে, প্রতিভার পক্ষে। মনে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয় এই ভেবে যে, আমরা হয় ত জীবনসঙ্গীতের যথার্থ সম্মান করতে জানিনে; দিতেও নয়, নিতেও

নয়। এমনই একটা উদাস চিন্তার মুহূর্তে,—প্রতিভাই যেন কবির মুখ দিয়ে সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে দেন—

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

সমাপ্ত